মাসুদ রানা

সুমেরুর ডাক

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনা



মাসুদ রানা

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

সুমেরুর ডাক

মোক্ষম সেই মারণাস্ত্রটি কি সত্যিই আবিষ্কার করা হয়েছে গেছে, যেটার সাহায্যে সাদাদের অত্যাচার, অবিচার আর শোষণ থেকে দুনিয়ার মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব? বরফের রাজ্য গ্রিনল্যান্ড আইসক্যাপে দুর্ঘটনার ছদ্মাবরণে শুরু হয়ে গেছে নৃশংস স্যাবোটাজ, ফলে ছুটে যেতে হলো মাসুদ রানাকে।

ছোট্ট একটা জায়গার ভিতর চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই, এদের মধ্যে কেউ একজন একের পর এক মারাত্মক সব দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে, খুন করছে ঠাণ্ডা মাথায়। অথচ ধরা যাচ্ছে না সে কে। দম বন্ধ করা উত্তেজনা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা - ৩৪৫, ৩৪৬

সুমেরুর ডাক ১,২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ তৌকির কবির তুষার
স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

মাসুদ রানা

সুমেরুর ডাক

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7656-7

পঞ্চান্ন টাকা

কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ২০০৮

রচনা বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স ৮৫০
e-mail sebaprok@citechco net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
SHUMERUR DAAK
Part I & II
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain

সুমেরুর ডাক-১ ৫-১৩৮
সুমেরুর ডাক-২ ১৩৯-২৬৪

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৫৭/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৫৪/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫২/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৩৭/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৩১/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৮/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৮/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৩৫/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৪১/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৫২/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৪৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৮০/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৮/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৭১/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৫১/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-

১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৬৯/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৬২/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫	আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৬-১৮৭	অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০	শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২	দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
২০৩-২০৪	অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৬৯/-
২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪	নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২১৭-২১৮	অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২	কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪	কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮	বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০	স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩	রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪	কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬	নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১	কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫	সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭	অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪	হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১	কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮	শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫	বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১	অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫	প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১	মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২	মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯	ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৪৭/-
২৮৪-৩১২	মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭	শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩	গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৪৬/-
২৯২-২৯৮	রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪	কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭	বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬	শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮	কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২	বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪	জনশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৫-৩০৭	দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২	পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৫৪/-
৩০৯-৩১০	দেশপ্রেম+রক্তলালসা	৪১/-
৩১১-৩১৪	বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬	চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯	মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭	চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১	মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৪৩/-
৩২২-৩৩৬	আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২	অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮	অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৫৮/-
৩২৫-৩৫১	কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭	স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৩২৯-৩৩০	শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩২-৩৩৩	টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩১-৩৪১	হোইট মিশন+আরেক গডফাদার	৪২/-
৩৪০-৩৪৩	আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৫/-
৩৪৫-৩৪৬	সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯	কালো নকশা+কালনাগিনী	৫০/-

সুমেরুর ডাক-১

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

এক

গ্রিনল্যান্ড। থিউল এয়ারপোর্ট।

ঠাণ্ডা এখানে গনগনে আগুনের মত দাপট নিয়ে চলে।

খানিক আগে ল্যান্ড করেছে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের ধূসরবর্ণ, পেটমোটা একটা কার্গো প্লেন। খোলা দরজায় দীর্ঘদেহী একজন মানুষকে দেখা গেল। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ স্পাই, মাসুদ রানা।

সিঁড়ির মাথায় দু'সেকেন্ড থেমে নীচে চোখ বুলাল রানা। উজ্জ্বল আলোর ভিতর বেশ কয়েকটা বুলডোজার রানওয়ে থেকে বরফ সরাচ্ছে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ও, শেষ ধাপে পৌঁছাবার আগেই বার দুয়েক বাড়ি খেল দু'সারি দাঁত। বাতাস যেন কষে চালানো চাবুক, রাশি রাশি তুষারকণা বর্শার মত ছুটে এসে বিঁধছে মুখে।

সিঁড়ির নীচে, বাতাসের দিকে পিছন ফিরে, দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন সার্জেন্ট। হলুদ পারকা হুড পরেছে, ফার দিয়ে মোড়া কিনারা টেনে আঁটো করা, ফলে মাত্র ইঞ্চি চারেক চওড়া একটা ফাঁক দিয়ে রানার দিকে তাকাল সে।

'মিস্টার জয়?'

'ইয়েস।' পরস্পরের খুব কাছে দাঁড়িয়েছে ওরা, মুখ খুলছে শুধু কথা বলার প্রয়োজনে। জবাব দেওয়ার সময় দাঁতের একটা ফিলিং-এ বাতাসের খোঁচা খেয়ে তাড়াতাড়ি মুখ বন্ধ করল রানা।

'আমি সার্জেন্ট নিখিল, মিস্টার জয়,' বলে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে রানাকে নমস্কার করল লোকটা। 'আমাদের বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে আপনাকে নিতে এসেছি।' মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিতে ডানদিকটা দেখাল।

ডানদিকে, বিশ ফুট দূরে, ক্যাটারপিলার লাগানো ছোট একটা কমলা রঙের হাফ-ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে; খকখক আওয়াজ করছে ডিজেল ইঞ্জিন, বাষ্প বেরুচ্ছে এগজস্ট পাইপ থেকে।

ছুটল রানা। টান দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই আবার সেটা এক টানে বন্ধ করে দিল। ওর সঙ্গে ঠাণ্ডাও ঢুকেছে, তবে হিটারটা লড়াই করে জিতছে–কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বেশ গরম হয়ে উঠল ভিতরটা। কোটের বোতাম খুলল ও, তারপর হাত থেকে গ্লাভ জোড়া।

'সার।' রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে হাসল হাফ-ট্রাকের ড্রাইভার। 'সার, হাতের গ্লাভস্ খুলবেন না, প্লিজ।'

গ্রিনল্যান্ডে এই যেন প্রথম এসেছে রানা, তাড়াতাড়ি গ্লাভ দুটো আবার পরে ড্রাইভারের দিকে তাকাল–চোখে প্রশ্ন।

ঠোঁটে এখনও সবিনয় হাসি, লোকটা বলল, 'ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, সার,

নতুন যাঁরা আসেন তাঁদের ভুল হয়ে যায়। ভুলে যদি গ্লাভস্‌ ছাড়া আপনি বাইরে বেরোন, তারপর দরজার হাতলটা ধরেন—তালুর অর্ধেকটা ওই হাতলেই ফেলে রেখে আসতে হবে।'

'এতটা খারাপ?' চোখ বড় করে বলল রানা। বলল না, যে গ্লাভস্‌ না পরে বাইরে বেরুবার কোন ইচ্ছে ওর নেই বা ছিল না।

'না, সার, রেগুলেশন মেনে চললে কোথাও কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।'

দরজা খুলে গেল। প্রায় লাফ দিয়ে ভিতরে ঢুকল এবার সার্জেন্ট নিখিল, কিন্তু ঠাণ্ডার গতি তার চেয়ে বেশি। দরজা খুলতে আর বন্ধ করতে যেটুকু সময় লেগেছে, তাতেই তাপমাত্রা ঝপ্‌ করে ত্রিশ ডিগ্রি নেমে গেছে। শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল রানার। যদিও হিটারটা বিরতিহীন শোঁ-শোঁ করছে।

'আগে বাঢ়ো!' ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল সার্জেন্ট। কর্কশ ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে ছুটল ক্যাটারপিলার লাগানো গাড়ি। কী একটা সমস্যা হয়েছে ওদের, রানাকে সেটা বোঝাবার চেষ্টা করল সে।

বরফের পাতলা আবরণ লেগে থাকায় পিছন আর পাশের জানালার কাঁচ ঝাপসা হয়ে আছে, তবে উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে গাঢ় রঙের বড়সড় হ্যাঙ্গারটা দেখতে পাচ্ছে রানা।

ওটার কাছে চলে এসে তিনবার হর্ন বাজাল ড্রাইভার। সঙ্গে সঙ্গে উপর দিকে উঠে গেল একটা দরজা, গড়িয়ে প্রকাণ্ড গুহা আকৃতির হ্যাঙ্গারের ভিতরে ঢুকে পড়ল ওদের ভেহিক্‌ল্‌।

'ওই যে ওদিকে অফিস, মিস্টার জয়। আমরা আপনার ব্যাগেজ নিয়ে আসছি।'

সার্জেন্ট নিখিলকে ধন্যবাদ জানিয়ে দরজা খুলে নামল রানা, পাকা মেঝের উপর দিয়ে এক কোণের কাঁচ লাগান ক্যাবিনটার দিকে এগোল। ক্যাবিনের মাথায় একটা সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে—সার্ক অফিস।

এরপর কী ঘটবে সেটা অনেকটাই আবহাওয়ার উপর নির্ভর করছে। কানাডা থেকে ডেলিভারি পাওয়া হোভারক্রাফট 'বড়ে মিয়া' এই মুহূর্তে কার্গো প্লেনটার পেটে বসে আছে, ওটাকে একশো মাইল বা আরও বেশি চালিয়ে গ্রিনল্যান্ড আইসক্যাপে নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু যে নিয়ে যাবে, সেই ড্রাইভার অসুস্থ হয়ে বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে পড়ে আছে। ফলে সিদ্ধান্ত হয়েছে আবহাওয়া একেবারে ভয়ঙ্কর না হলে, সার্জেন্ট নিজেই ওটাকে চালাবার চেষ্টা করবে। রানার এখন ইচ্ছে, আনাড়ি একজন লোকের সঙ্গে হোভারক্রাফটে উঠবে কিনা।

ভাল পরিবেশে, আর ভাগ্য যদি বিরোধিতা না করে, এই দূরত্ব পেরুতে তিন ঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়। বড়ে মিয়া টাইপের হোভারক্রাফট অনেক আগে বরফের মধ্যে চালিয়েছে রানা, কাজেই ওর একটা ধারণা আছে।

দরজা খুলে ক্যাবিনে ঢুকল রানা। এক লোক ইজি চেয়ারে বসে মুম্বাইয়ের একটা সিনে ম্যাগাজিন পড়ছে। চোখ তুলল সে, তারপর চেয়ার ছাড়ল। ইউনিফর্মই বলে দিচ্ছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপটেন। দু'হাত এক

করে বুকের মাঝখানে তুলল সে। 'নমস্তে জী। আপ···বিজয় হাসান? বাংলাদেশ থেকে আসছেন, স্পেশাল ব্রাঞ্চকে ডিআইজি?' বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'ক্যাপটেম প্যাটেল। গরম এক কাপ কফি চলবে?'

'চলবে।'

'এখনই আসছে।' বড় একটা ফ্লাস্ক খুলে মগে ধূমায়িত কফি ঢালল প্যাটেল। 'কোঈ কিসিমকা তকলিফ, মিস্টার জয়?'

মগে চুমুক দিল রানা। 'না, এখন পর্যন্ত কোন অসুবিধা হয়নি। তবে জার্নিটা সবে তো শুরু হলো, তাই না?'

'সাচ্চি বাত্। এটাকে আমরা স্টার্টিং পয়েন্ট বলতে পারি।'

'ওদিকের সব খবর কী?' জানতে চাইল রানা।

'দু'হপ্তা হতে চলল এদিকের ঝড়টারই তো থামার লক্ষণ নেই। ক্যাপ-এর অবস্থা আরও খারাপ।'

'ফোরকাস্ট ভাল নয়?'

'কীসের ফোরকাস্ট?' নিঃশব্দে হাসল ক্যাপটেন প্যাটেল। 'আরে সাহাব, ইধারকা ক্লাইমেট সিরিফ পাগলা ঘোড়ে হ্যায়, পাগলা ঘোড়ে!'

'তা হলে?'

'চারদিন হলো রেডিও কমিউনিকেশন বন্ধ। তার আগে বন্ধ ছিল দশদিন। দু'হপ্তায় মাত্র একবার নেতাজি ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, এরমধ্যে কোন প্লেনও আসা-যাওয়া করেনি। হোভারক্রাফট নিয়ে সার্জেন্ট রওনা হবে বলছে বটে, কিন্তু আমার মনে হয় না সেটা সম্ভব। ওটাকে চকানাগা-র সঙ্গে পাঠাতে হবে···'

বাধা দিল রানা। 'চকানাগা?'

'চলতি-কা-নাম-গাড়ি। আমাদের দেয়া নাম। স্নো-ট্রেন। এটার কথা শোনেননি?'

মাথা নাড়ল রানা।

'বড় বড় সব ট্র্যাক্টর, জোড়া লাগানো অনেকগুলো বক্স কার টেনে নিয়ে যায়। বক্স কারগুলোয় চাকার বদলে রানার লাগানো আছে। রাত হোক আর দিন, চলতেই থাকে ওটা, যতক্ষণ না গন্তব্যে পৌঁছায়। স্লেজের ওপর এক ধরনের ট্রেন বলতে পারেন। আমাদের হোভারক্রাফটকে সম্ভবত একটা বক্স কারে তুলে দিতে হবে।'

'চলতি-কা-নাম-গাড়ি কতদিনে পৌঁছাবে?'

'ঠিক নেই, চারদিন লাগতে পারে, আবার চার হপ্তাও লেগে যেতে পারে। তবে চকানাগা পৌঁছাতে কখনও ব্যর্থ হয় না।'

'আর আমি?'

'আপনিও চলতি-কা-নাম-গাড়িতে উঠে পড়বেন।'

'পৌঁছাতে অত দেরি হবে জেনেও?' মাথা নাড়ল রানা। 'বিকল্প আর কী

আছে?'

'আবহাওয়া ভাল হবার অপেক্ষায় থাকুন, তারপর উড়ে চলে যাবেন। কিংবা ড্রাইভার সুস্থ হবার অপেক্ষায় থাকুন, বড়ে মিয়াতেই চড়ে বসবেন।'

'হুম।'

কার্গো প্লেনটাকে টো করে হ্যাঙ্গারের ভিতর আনা হলো। বড়ে মিয়াকে র‍্যাম্পের উপর দিয়ে চালিয়ে নীচে নামিয়ে আনল সার্জেন্ট নিখিল।

হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এসে আবার ক্যাটারপিলার লাগানো ভেহিকেলে উঠে বসল রানা।

আইসক্যাপে সার্ক-এর ওয়েদার অ্যান্ড রিসার্চ ফ্যাসিলিটির মূল ক্যাম্পটার নাম নেতাজি ক্যাম্প। আর সাপ্লাই ক্যাম্পের নাম বঙ্গবন্ধু ক্যাম্প। থিউল এয়ারপোর্ট থেকে বঙ্গবন্ধু ক্যাম্প বিশ মাইল দূরে। প্রথমে ওখানেই যাচ্ছে রানা।

ইতিমধ্যে তুষারপাতের মাত্রা আর ঝড়ের তীব্রতা আগের চেয়ে বেড়েছে। গাড়ির হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় তুষারের কণাগুলোকে তির্যক ভঙ্গিতে নেমে আসতে দেখছে রানা।

সিটের কিনারায় সরে বসে, হুইলের উপর ঝুঁকে, গভীর মনোযোগের সঙ্গে স্নোব্যাঙ্কের উপর দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার।

গাড়ির ভিতর তাপমাত্রা অসহ্য রকম বেশি। একটা ফ্যান চলছে, তাপ যাতে চারদিকে ছড়াতে পারে। ফ্যানের শোঁ-শোঁ আওয়াজে কেউ কারও কথা ভাল করে শুনতে পাচ্ছে না।

ড্রাইভারের মাথার কাছে ঝুলে থাকা রেডিও সেটটা সারাক্ষণ ঘ্যারঘ্যার করছে, তারই মধ্যে মেসেজ আদান-প্রদানের কাজ চলছে।

সিস্টেমটা ওকে আগেই ব্যাখ্যা করে বলেছে ড্রাইভার। ওদের এই ক্যাটারপিলার লাগানো ভেহিকেল বা হাফ-ট্রাক যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য আর নিরাপদ, কিন্তু কোনও কারণে অচল হয়ে পড়লে রেডিওর মাধ্যমে সাহায্য চাইতে হবে তার, আর চাওয়া মাত্র তা চলেও আসবে। ইঞ্জিন কাজ না করলে উত্তাপ সরবরাহ করবার জন্য ছোট একটা স্টোভ আছে।

শুনে মনে হবে সব খুব সহজ আর সাধারণ; সবগুলো দিকই আগে থেকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে–সিস্টেম একটা আছে, সেটা কাজও করে।

কিন্তু তুষার ঝড়ের সগর্জন অন্ধকারে, বিশ মাইল হিম শূন্যতার মাঝখানে বসা অবস্থায়, ঘুরেফিরে একটা ভয়ই শুধু মনে জাগে–এই বুঝি গাড়িটা অচল হয়ে পড়ল। আর, কোন কারণে যদি রেডিও কাজ না করে বা সময়মত সাহায্য না পৌঁছায়, এই গাড়ি অল্পক্ষণেই ডিপ ফ্রিজ হয়ে উঠবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ডিজেল ইঞ্জিনের আওয়াজ নিস্তেজ হয়ে এল, সেই সঙ্গে বদলে গেল সামনের দৃশ্য। তুমুল তুষার ঝড়ের ভিতর কমলা রঙ করা একটা কাঠের তৈরি কুঁড়েঘরের দিকে ঘুরে যাচ্ছে গাড়ি।

ব্রেক কষে ড্রাইভার বলল, 'নক করার দরকার নেই, সার। সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ুন। আমি আপনার ব্যাগ নিয়ে আসছি।'

দরজার হাতল ধরবার আগে নিজের অজান্তেই হাতে পরে থাকা গ্লাভ দুটোর

দিকে একবার তাকাল রানা।

বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে শীতের বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জিত করা হলো রানাকে। দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে একজন স্টোর সার্জেন্টকে। প্রথমে লম্বা উলেন আন্ডারওয়্যার পরতে দেওয়া হলো ওকে, তারপর একে একে খাকি ব্যাটলড্রেস, নেকড়ের ছাল দিয়ে কিনারা মোড়া পারকা, উইন্ড-প্রুফ ট্রাউজার, ইয়ার ফ্ল্যাপ সহ ক্যাপ, উলেন ফেল্ট লাগানো সিল্ক গ্লাভ, সবশেষে সাদা আর পুরু ফেল্টের তৈরি ভারী বুট।

বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পের কমান্ডার, কর্নেল শঙ্কর দয়াল শর্মা বললেন, 'উঁহুঁ, এ যথেষ্ট নয়। ট্রে উপচে পড়া চাই।'

রানা জানাল, ওর তেমন খিদে নেই।

'তবু,' বললেন তিনি। 'আপনার প্রচুর ক্যালরি দরকার।' ভদ্রলোকের নিজের ট্রেতে বড় আকারের দুটো স্টেক, বিশাল একজোড়া আলু, পাঁচ রকম অন্যান্য তরি-তরকারি, কয়েক টুকরো মাখন, প্রচুর খোরমা, প্রায় আধ পাইন্ট আইসক্রিম আর এক গ্লাস দুধ রয়েছে।

এক সারিতে ফেলা টেবিলগুলোর উপর চোখ বুলাল রানা। বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পের মেস হলে ক্যাফেটেরিয়ার পদ্ধতি ধরে পরিবেশন করা হচ্ছে। প্ল্যাস্টিকের প্রতিটি ট্রে থেকে উপচে পড়ছে খাবার। একটা আলু নিল রানা, ছোট দেখে। ওর ট্রেতে এক গ্লাস দুধ রাখলেন কর্নেল শর্মা।

'এখানে আপনারা প্রচুর খাওয়াদাওয়া করেন,' বলল রানা।

'রোজ পাঁচ হাজার ক্যালরি,' বললেন কর্নেল শর্মা। 'এটা আমাদের দরকার, না হলে চলবে না। ব্যাপারটা হলো, শুধু এখানে থাকার কারণে ক্যালরি পুড়ছে। আপনি যেখানে যাচ্ছেন, আইসক্যাপে, ওখানে ওরা নিচ্ছে সাত হাজার ক্যালরি।'

'আর মোটা হচ্ছে?'

'মোটেও না। আসলে সত্যি ওদের প্রচুর খাবার দরকার। তিন হাজার ক্যালরি ওখানে স্লিমিং ডায়েট। ওখানে আপনি একজন ছাড়া মোটা কাউকে পাবেন না।'

'কার কথা বলছেন?'

'কালো ভালুক, আপনি যার অতিথি হয়ে এসেছেন।' কর্নেল শর্মার ভাব দেখে মনে হলো, মুখে খাবার থাকায় বিষম খাওয়ার ভয়ে হাসছেন না।

প্রসঙ্গটা উঠতে প্রশ্ন করার সুযোগ হলো রানার। 'কর্নেল ভীম সিং যাদব। উনি তো বোধহয় এখনও আপনার ক্যাম্পেই আটকা পড়ে আছেন, তাই না? দিল্লিতে মেসেজ পাঠানোর পর আর নিজের ক্যাম্পে আর ফিরে যেতে পারেননি।'

স্টেকে ছুরি চালালেন কর্নেল শর্মা। 'না…হ্যাঁ, আজ আঠারো দিন আটকা পড়ে আছেন। আমাদের রেডিও অপারেটরের ওপর ভরসা রাখতে পারেননি, নিজেই চেষ্টা করে দেখছেন নেতাজি ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কিনা। এসে পড়বেন।'

এই সময় থপ্-থপ্ আওয়াজ শোনা গেল।

কর্নেল শর্মা ভুল কিছু বলেননি, নেতাজি ক্যাম্পের কমান্ডার কর্নেল ভীম সিং যেমন কালো তেমনি মোটা। ওদের টেবিলের সামনে থেমে কর্নেল শর্মার দিকে চোখ গরম করে তাকালেন তিনি, ভারী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ভদ্রলোককে তুমি বলেছ, আমি একটা কালো ভালুক?'

'বলেছি।'

'ও ঠিক বলেছে। থাবা মেলান।' রানার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন কর্নেল যাদব। উঠে দাঁড়িয়ে হাতটা ধরল রানা। করমর্দন শেষে কর্নেল বললেন, 'দাঁড়ান-দাঁড়ান, আপনি স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ডিআইজি, বাংলাদেশ?'

'জয়,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'বিজয় হাসান। স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা থেকে।'

'পরিবেশটা কী রকম একঘেয়ে, তাই না? এখানকার খাবারগুলো পর্যন্ত বিস্বাদ। দুঃখিত, মিস্টার জয়, নেতাজিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত দয়া করে এ-সব মেনে নিন। কী ব্যাপার, শর্মা, তোমরা একজন অতিথিকে ঠিকমত আপ্যায়নও করতে পার না?'

কর্নেল শর্মা বললেন, 'আজ আঠারো দিন কালো ভালুকের খাদ ভরাচ্ছি। আমাদের সিল মাছ শেষ হয়ে গেছে।'

আলোচনার মোড় ঘুরাবার জন্য রানা জানতে চাইল, 'নেতাজি ক্যাম্পে পৌঁছাতে কদিন লাগতে পারে আমাদের?'

'দুঃখিত, কিছুই বলা সম্ভব নয়।' কর্নেল যাদবের চোখে হঠাৎ কী যেন একটা ফুটল, ক্ষোভ বা রাগ বলে সন্দেহ হলো রানার।

মগের কফিটুকু নিঃশব্দে শেষ করলেন তিনি, তারপর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন। 'পাঁচ মিনিট পর, মিস্টার জয়, প্লিজ—কাগজ-পত্র নিয়ে আমার ক্যাবিনে,' কথাগুলো বলে মাথা নিচু করে মেস হল থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

কর্নেল শর্মার দিকে ফিরল রানা। 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

ভদ্রলোক ভুরু কোঁচকালেন। 'আমরা যারা আইসক্যাপে একটানা বেশিদিন আছি, ডাক্তাররা বলছেন তাদের নাকি বুদ্ধিশুদ্ধি অর্ধেকই কমে যায়।' একটু থেমে তাড়াতাড়ি আবার বললেন, 'উনি অবশ্য একটা বিষয়ের সাইকোলজিকাল দিক নিয়ে সত্যি খুব চিন্তাতেই আছেন। ওঁর ভয়, লোকজনের মনোবল না ভেঙে পড়ে।'

'কেন, নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?'

'না, নতুন কিছু নয়।'

'তাহলে? ভদ্রলোকের অনুপস্থিতিতে নেতাজি ক্যাম্প অচল হয়ে পড়বে?'

মাথা নাড়লেন কর্নেল শর্মা। 'তাঁর অনুপস্থিতিতে কিছু আসে যায় না। উনি উদ্বিগ্ন ওখানে যেগুলো রেখে এসেছেন, সেগুলোকে নিয়ে।'

'যেগুলো রেখে এসেছেন মানে? কী সেগুলো?'

'ছ'টা লাশ। না, সাতটা ধরা উচিত।'

দুই

ঠিক ছ'মিনিটের মাথায় কর্নেল যাদবের ক্যাবিনে ঢুকল রানা। ওকে বসতে বলে ওর দেওয়া কাগজ-পত্র পরীক্ষা করলেন ভদ্রলোক।

এই ফাঁকে বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, অর্থাৎ বস্-এর কথা মনে এল রানার। নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠিয়েছেন ব্রিফ করবেন বলে, তার আগে একটা ফোল্ডার পড়তে দিয়েছেন ওকে।

এ এক বাঙালী বিজ্ঞানীর গল্প। ধরা যাক তাঁর নাম ডক্টর ওসমান ফারুক।

ঢাকা ভার্সিটিতে দীর্ঘদিন ধরে ব্যাকটেরিয়লজি পড়াচ্ছেন ডক্টর ফারুক, আবার অবসর সময়ে গবেষণাও করছেন। কী নিয়ে গবেষণা করছেন, তা বলতে গেলে প্রায় কেউই জানে না। এ-ব্যাপারে দিনে দিনে একটা ধোঁয়াটে ভাব, একটা রহস্য সৃষ্টি হয়েছে। সেটাই এক সময় বিপদ হয়ে দেখা দিল।

অজ্ঞাতপরিচয় একদল লোক দেখা করতে এল ডক্টর ফারুক আর তাঁর সহকারী ডক্টর হারুনের সঙ্গে। প্রকাশ্যে ভয় দেখাল তারা, কী নিয়ে গবেষণা করছ দেখাও, তা না হলে মস্ত বিপদ হবে তোমাদের।

ভয় পেলেও, ডক্টর ফারুক সেটা চেপে রাখলেন। হাসিমুখে লোকগুলোকে নিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেন তিনি, বললেন, নিজেরাই দেখুন কী নিয়ে কাজ করছি। আমি কারও জন্যে ক্ষতিকর কিছু করছি না, কাজেই আমার লুকাবারও কিছু নেই।

ঘুরেফিরে দেখল তারা। ডক্টর ফারুক আর ডক্টর হারুনের নোটবুক সহ অন্যান্য কাগজ-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করল। তাদের আচরণে বোঝা গেল, ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাস সম্পর্কে যা কিছু জানবার সবই তারা জানে। দেখা শেষ হতে মাথা নাড়ল তাদের লিডার, বলল—এগুলো নয়। আমরা জানতে পেরেছি, তোমরা এমন কিছু একটা আবিষ্কারের চেষ্টা করছ, যেটা মানবসভ্যতা ধ্বংস করে দেবে। সাদা, অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে। সেটা কোথায়?

বিস্ময়ে যেন আকাশ থেকে পড়লেন ডক্টর ফারুক। বললেন, আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

লোকগুলো চলে গেল বটে, তবে যাওয়ার সময় শাসিয়ে গেল—কাজটা তোমরা নিশ্চয়ই গোপনে কোথাও করছ। আবার আসছি আমরা, তখন তোমাদের সমস্ত গোপন কর্মকাণ্ড দেখতে চাইব, মনে থাকে যেন।

এই ঘটনায় ডক্টর হারুন স্বভাবতই খুব ভয় পেয়ে যায়। সে জানত বটে তার সার টপ সিক্রেট কি একটা সাবজেক্ট নিয়ে নিভৃতে কোথাও রিসার্চ করেন, কিন্তু বিশদ কিছুই তার জানা ছিল না।

যাই হোক, সহকারী ভয় পাচ্ছে দেখে তাকে অভয় দিলেন ডক্টর ফারুক,

তারপর বিসিআই চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বিসিআই চিফ রাহাত খান কালবিলম্ব না করে সেদিনই তাঁদের দু'জনকে গায়েব করে দিলেন।

একা শুধু রাহাত খানই জানতেন কী নিয়ে গবেষণা করছেন ডক্টর ফারুক। ঘটনার বিবরণ শুনে বিপদটার গুরুত্ব অনুধাবন করতে অসুবিধে হয়নি তাঁর।

ঘটনাচক্রে সে-সময় সার্ক-এর সাতটা দেশ উত্তরমেরুতে একটা 'ওয়েদার অ্যান্ড রিসার্চ ফ্যাসিলিটি' চালাবার সমস্ত আয়োজন প্রায় শেষ করে এনেছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আর বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের নামে দুটো ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে সেখানে।

সার্কের সাতটা দেশ যে যার সুবিধে মত নানাভাবে অংশগ্রহণ করছে ওই রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে—পাকিস্তান দিচ্ছে নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর আর ইঞ্জিনিয়ার; নেপাল-মালদ্বীপ-ভুটান দিচ্ছে ইকুইপমেন্ট আর টেকনিশিয়ান; হেভি ভেহিকেল, ড্রাইভার আর কমিউনিকেশন এক্সপার্ট মিলিয়ে শ্রীলঙ্কা এককভাবে সরবরাহ করছে সবচেয়ে বেশি লোকবল; ভারত দেখছে সিকিউরিটি আর টেকনোলজিকাল দিকগুলো; বাংলাদেশ দিচ্ছে ডাক্তার আর বিজ্ঞানী। ঠিক হয়েছে বাংলাদেশী বিজ্ঞানীরা সেখানে অ্যান্টি ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করবেন।

বাংলাদেশ থেকে যাঁরা যাবেন তাঁদের তালিকা আগেই তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল– তিনজন ডাক্তার, তিনজন মেইল নার্স আর দু'জন বিজ্ঞানী। বিসিআই চিফ রাহাত খান সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করায় তালিকা থেকে বিজ্ঞানী দু'জনকে বাদ দেয়া হলো। সিদ্ধান্ত হলো, তাঁদের বদলে ডক্টর ফারুক আর তাঁর সহকারী ডক্টর হারুন হাবিবকে পাঠানো হবে গ্রিনল্যান্ড আইসক্যাপে।

শুধু তাই নয়, রাহাত খানের পরামর্শে এরপর প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানানো হলো, আইসক্যাপে পৌঁছে ডক্টর ফারুক নির্ধারিত কাজ তো করবেনই, সেটা ছাড়াও অন্য একটি টপ সিক্রেট বিষয়ে গবেষণা চালাবেন। আভাসে বলা হলো, ডক্টর ফারুক তাঁর এই ব্যক্তিগত গবেষণায় সফল হলে সারা দুনিয়া জুড়ে অন্যান্য বর্ণের মানুষের উপর শ্বেতাঙ্গরা যে আধিপত্য বজায় রেখেছে তার অবসান ঘটবে। বলাই বাহুল্য যে ভারতও তাতে উপকৃত হবে।

বিষয়টা টপ সিক্রেট, তাই ডক্টর ফারুকের জন্য কড়া নিরাপত্তা দরকার। আইসক্যাপ সার্ক ফ্যাসিলিটিতে তাঁর জন্য গোপন একটা ল্যাব থাকতে হবে। নির্ধারিত কাজে তরুণ গবেষক তাঁকে সহায়তা করবে, তবে তাঁর গোপন গবেষণায় নয়—এই কাজটা তিনি একাই করবেন।

সংশ্লিষ্ট ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিলেন, ডক্টর ফারুকের জন্য সম্ভাব্য সব রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে।

সেটা আজ প্রায় পাঁচ বছর আগের কথা। এই পাঁচ বছর ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোনও রেডিও মেসেজ বা চিঠি, কিছুই পাননি বিসিআই চিফ। কাজেই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব নয় ডক্টর ফারুক আদৌ গবেষণায় সফল হয়েছিলেন কি না। তারপর হঠাৎ একদিন গ্রিনল্যান্ড আইসক্যাপের নেতাজি ক্যাম্প থেকে দিল্লি হয়ে ঢাকায় পৌঁছাল সাংকেতিক ভাষায় লেখা একটা মেসেজ। সেটা তরজমা করলে

এরকম দাঁড়ায়–

'ডক্টর ওসমান ফারুকের মৃত্যু স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, আমি নিশ্চিত নই। তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু আবিষ্কার করেছিলেন, অন্তত তাঁর কাছ থেকে সেরকম আভাসই আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই আবিষ্কার বা আবিষ্কার সংক্রান্ত কাগজ-পত্র অনেক তল্লাশি চালিয়েও নেতাজি ক্যাম্পের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কর্নেল যাদব।'

এই মেসেজ পেয়েই বিসিআই চিফ রাহাত খান রানাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

'সব ঠিকই আছে,' কাগজ-পত্র থেকে মুখ তুলে রানাকে বললেন কর্নেল যাদব। 'আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে, দিল্লির কাছ থেকে এরকম একটা নির্দেশ আমিও পেয়েছি। তবে তাতে একটা বিষয় নেই। এখানে বলা হয়েছে, প্রয়োজনে আপনি আমাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে পারবেন। এটা কী?'

'প্রয়োজনে, মানে, আমি যদি সহযোগিতা না পাই।'

'কিন্তু আপনি রিপোর্ট করবেন কোথায়?'

'স্বভাবতই ঢাকায়, আমার অফিসে,' বলল রানা। 'তারপর নিশ্চয় আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করবে।'

'হুম। ব্যাপারটা ভালো লাগল না আমার। তা সে যাকগে...' কাগজগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার আগে মুখে একটু হাসি টেনে একবার মাথা ঝাঁকালেন, তারপর ধূমায়িত কফিতে কয়েক ফোঁটা ব্র্যান্ডি মিশিয়ে মগটা ধরিয়ে দিলেন রানার হাতে।

মগে চুমুক দিয়ে মুখ খুলতে যাবে রানা, একটা হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন কর্নেল, বললেন, 'প্রথমে আমি শুরু করি, তারপর আপনি প্রশ্ন করবেন, ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

শান্ত, ম্লান সুরে প্রায় তিন মিনিট বলে গেলেন কর্নেল যাদব। মাঝে মধ্যে তাঁকে থামিয়ে দু'একটা প্রশ্ন করল রানা।

তিন হপ্তা আগেও, ছড়ে যাওয়া বা আঁচড় কাটা বাদে, নেতাজি ক্যাম্পের সেফটি রেকর্ডে কোন খুঁত ছিল না। পাঁচ বছর বয়সী ক্যাম্পে মারাত্মক কোন ফ্রস্টবাইটেও আক্রান্ত হয়নি কেউ। তারপর হঠাৎ অল্প সময়ের ব্যবধানে আলাদা দুটো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল।

প্রথমে একটা হেলিকপ্টার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন ডক্টর ওসমান ফারুক। কেউ বলতে পারছে না অ্যাক্সিডেন্টটা কীভাবে হলো। ঘটনার পরপরই একজন মেজরের নেতৃত্বে একটা তদন্ত টিম গঠন করা হয়। কিন্তু সেই টিমও বলতে পারেনি ব্যাপারটা দুর্ঘটনা ছিল, নাকি স্যাবটাজ। তবে তাদের তৈরি রিপোর্টে ঘটনাটার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সে সময় আবহাওয়াজনিত কারণে নেতাজি ক্যাম্পের রেডিও ঠিকমত কাজ করছিল না। বঙ্গবন্ধু ক্যাম্প থেকে কিছু সাপ্লাই আনবার জন্য একটা হেলিকপ্টার রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এ-কথা শুনে ডক্টর ওসমান ফারুক কর্নেল যাদবকে অনুরোধ করলেন কপ্টারে তাঁর জন্য যেন একটা সিট রাখা হয়।

কারণ হিসাবে বললেন, জরুরি একটা মেসেজ আছে, চেষ্টা করে দেখতে চান বঙ্গবন্ধু ক্যাম্প থেকে সেটা ঢাকায় পাঠানো যায় কিনা। কর্নেল যাদব জানতেন এই কোড করা মেসেজটা ঢাকায় পাঠাবার জন্য কদিন ধরেই খুব অস্থির ছিলেন ডক্টর ফারুক, তাই তিনি কোন আপত্তি করেননি।

এর প্রায় এক ঘণ্টা পর পাঁচজন লোককে নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাম্প থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে একটা ভেহিকেল। ডক্টর ফারুক ছাড়াও তাতে ছিল দু'জন সিংহলী টেকনিশিয়ান, হেলিকপ্টারের কো পাইলট, আর একজন ভারতীয় সিপাই। পাইলট আগে থেকেই কপ্টারে ছিল।

আরোহীরা কপ্টারে উঠবার পর ভেহিকেল নিয়ে টানেল এন্ট্রান্স-এর কাছে ফিরে এল ড্রাইভার। ওখানে থেমে কপ্টার আকাশে উঠল কিনা দেখবার পর টানেলে নামল সে।

পরদিন সকালে সারা রাতে জমে ওঠা এন্ট্রান্সের তুষার পরিষ্কার করতে বেরিয়েছে একটা বুলডোজার, বিধ্বস্ত কপ্টার আর লাশগুলো দেখতে পেল ড্রাইভার। ডক্টর ফারুক, পাইলট, কো-পাইলট, দুই শ্রীলংকান আর সিপাই–সবাই মারা গেছে।

ব্যাপারটা আরও বেশি মর্মান্তিক এই জন্য যে কপ্টারটা ক্র্যাশ করবার পরও দু'জন আরোহী বেঁচে যায়। আঘাত নিশ্চয় খুব গুরুতরই ছিল, তবু দু'জনই ক্রল করে ক্যাম্পে ফিরে আসবার চেষ্টা করেছিল। তারা মারা গেছে নিরেট বরফে পরিণত হয়ে।

ডক্টর ফারুক কপ্টারে উঠবার আগে আর পরে কে কোথায় ছিল সে-সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করল রানা।

উত্তরে কর্নেল যাদব বললেন, তাঁর ক্যাম্পে একশো বাহান্নজন লোক রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে বলা সম্ভব নয় কে কোথায় কী করছিল, তবে যাদের সঙ্গে ডক্টর ফারুকের মেলামেশা আর ঘনিষ্ঠতা ছিল তাদের সবার কথাই তিনি বলতে পারবেন। যেমন–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শওকত জামিল, ডাক্তার আরিফ হাসান আর ডক্টর ফারুকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডক্টর হারুন হাবিব। এরা তিনজনই তাঁর সঙ্গে তাস খেলছিলেন।

'খবরটা শুনে কার কী প্রতিক্রিয়া হলো?'

অসহায়, ম্লান হাসি ফুটল কর্নেল যাদবের ঠোঁটে। 'আপনার এ প্রশ্নের জবাব দেয়া খুব কঠিন, আবার খুব সহজ। প্রতিক্রিয়া দেখে ওঁদের সবাইকে আমার সন্দেহ হয়েছে, আবার পরে মনে হয়েছে এঁরা কেউই দায়ী নন। কেউ এত বেশি বিস্মিত হন, ভেবেছি অভিনয় করছেন। কাউকে পরদিন সকালে হাসতে দেখে মনে সন্দেহ জেগেছে। আসলে যে-কোন প্রতিক্রিয়ার একাধিক অর্থ করা যেতে পারে।'

আরেক প্রসঙ্গ তুলল রানা। 'এবার ডক্টর ফারুকের আবিষ্কার সম্পর্কে বলুন। আপনাকে ঠিক কী বলেছিলেন তিনি?'

'উনি অবসর সময়ে বা রাত জেগে নিজের ল্যাবে বসে কী করতেন না করতেন তার কিছুই আমরা জানতাম না,' বললেন নেতাজি ক্যাম্পের কমান্ডার।

'তাঁর সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়া বা তাঁকে কোন প্রশ্ন করা যাবে না, এই শর্তেই আমরা তাঁকে পাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনও তাঁকে এ-প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞেস করিনি, আমার জানামতে অন্য কেউও কোন রকম কৌতূহল প্রকাশ করেননি।'

'ডক্টর হারুন হাবিব, ডক্টর ফারুকের সহকারী?' প্রশ্ন করল রানা, ব্যাখ্যা করছে না ঠিক কী জানতে চাইছে ও।

ম্লান একটু হেসে মাথা নাড়লেন কর্নেল। 'উনিও আমাদের মত সেই একই অন্ধকারে ছিলেন।'

'এ নিয়ে তাঁর মধ্যে কোন ক্ষোভ দেখেছেন?'

'মিস্টার হাবিবের মধ্যে? না! তাঁর দৃষ্টিতে ডক্টর ফারুক ছিলেন দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন। গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি আর শ্রদ্ধা ছিল আন্তরিক ও নির্ভেজাল, এটুকু জোর দিয়েই বলতে পারি।'

মূল প্রশ্নে ফিরে এল রানা। 'ডক্টক ফারুকের আবিষ্কার।'

'বিশ-বাইশ দিন আগে উনি হঠাৎ আমাকে তাঁর ল্যাবে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছেন ভদ্রলোক। আমাকে বসতে বলার কথাও তাঁর মনে পড়েনি। কাঁপা-কাঁপা গলায় শুধু জানালেন, তাঁর সারাজীবনের সাধনা সফল হতে চলেছে–একটা যুগান্তকারী আবিষ্কারের সমস্ত উপকরণ তিনি উদ্ভাবন করেছেন, এখন শুধু চূড়ান্ত পরীক্ষাটা বাকি।

'তারপর আমাকে তিনি অনুরোধ করলেন, "আবহাওয়া খারাপ কি রেডিও কাজ করছে না, এ-সব আমি শুনতে চাই না–যেভাবে পারেন বাংলাদেশে একটা খবর পাঠান, প্লিজ; ওঁরা আমাকে ঢাকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন, চূড়ান্ত পরীক্ষাটা আমি ঘরে বসে করতে চাই।"'

মনে মনে রানা একটু বোধহয় আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল। একজন দেশপ্রেমিক পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়ে এল মাথাটা।

'তারপর?'

'উনি আমাকে কিছু দেখাননি, তবে জানালেন যে তিন ইঞ্চি লম্বা পাঁচটা টেস্টটিউবে তাঁর উদ্ভাবিত উপকরণ আর সাংকেতিক ভাষায় লেখা ফর্মুলা ল্যাবেই লুকানো আছে। বললেন, তাঁর যদি ভাল-মন্দ কিছু ঘটে, আমি যেন ওগুলো অবশ্যই বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিই,' একটু দম নিয়ে আবার বললেন কর্নেল যাদব, 'এর দু'দিন পরই তো হেলিকপ্টারটা ক্র্যাশ করল।'

'কিন্তু ডক্টর ফারুক মারা যাবার পর সে-সব আপনি খুঁজে পাননি?'

'না।'

'ওগুলোর কথা আর কে জানত?'

মাথা নাড়লেন কর্নেল যাদব। 'ডক্টর ফারুক শুধু আমাকে বলেছিলেন। আমি কাউকে বলিনি।'

'আপনার কী ধারণা–ওগুলো চুরি হয়েছে, না কি হেলিকপ্টারে ওঠার সময় ডক্টর ফারুকের সঙ্গে ছিল সব?'

রানার দিকে একদৃষ্টে দু'সেকেন্ড তাকিয়ে থাকবার পর কর্নেল যাদব বললেন, 'বোধহয় সঙ্গেই ছিল।'

'কেন বলছেন এ-কথা?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'কারণ তা না হলে আমি চোর হয়ে যাই,' বললেন কর্নেল। 'ডক্টর ফারুক আমাকে ছাড়া আর কাউকে কিছু জানাননি।'

'আর হেলিকপ্টার ক্র্যাশ সম্পর্কে আপনার ধারণা? ওটা কি অ্যাক্সিডেন্ট ছিল, নাকি ডক্টর ফারুককে খুন করার জন্যে ক্র্যাশ করানো হয়?'

'পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবে আমার মন বলে, এটা অ্যাক্সিডেন্টই। এখানে কে তাঁকে মারতে যাবে, বলুন?'

রানা ভাবল—কেন, আপনারা? শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার চুরি করবার লোভে? শুধু আপনি কেন, নেতাজি ক্যাম্পের একশো বাহান্নজন লোকের মধ্যে লোভী আর নিষ্ঠুর লোক আরও অনেক পাওয়া যাবে—বিশেষ করে তারা সাতটা বিভিন্ন দেশের লোক হওয়ায়।

ও জানতে চাইল, 'ডক্টর ফারুকের ল্যাবে, তাঁর অনুপস্থিতিতে, আর কার ঢোকার অনুমতি ছিল—আপনার আর মিস্টার হাবিবের ছাড়া?'

হেসে ফেললেন কর্নেল। 'কারুরই অনুমতি ছিল না, মিস্টার জয়—আমার আর মিস্টার হাবিবেরও না।'

'ল্যাবের অতিরিক্ত চাবি? সেটা কার কাছে ছিল?'

চেহারা গম্ভীর করে কর্নেল যাদব জবাব দিলেন, 'আমার কাছে।'

'হুম। এবার বলুন, আপনার ক্যাবিনে কাদের অবাধ আসা-যাওয়া ছিল?'

কর্নেলের চেহারা আরও গাঢ় হয়ে উঠল। 'আমার ক্যাবিন প্রায় সময় খোলাই থাকে, বলা যায় সবারই অবাধ আসা-যাওয়া।'

'সেক্ষেত্রে আপনার ক্যাবিন থেকে অতিরিক্ত চাবিটা চুরি হয়ে থাকতে পারে।'

'খুঁজতে গিয়ে দেখি আছে,' বললেন কর্নেল। 'তবে কাজ সেরে চাবির গোছাটা ওখানে আবার রেখে আসতে পারে চোর।'

'তারমানে জিনিসগুলো ল্যাব থেকে চুরি হয়নি, এ-কথা জোর করে বলার উপায় নেই। নেতাজি ক্যাম্পের প্রতিটি ক্যাবিন পরীক্ষা করা উচিত ছিল।'

'আমার খুব একটা সায় ছিল না, তবে মিস্টার হাবিব সব কথা শোনার পর জিদ ধরায় জিনিসগুলোর খোঁজে প্রতিটি ক্যাবিনই সার্চ করা হয়েছে। শুধু শুধু।'

'লাশগুলোর তো পোস্ট মর্টেম হওয়া দরকার, তাই না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। তা ছাড়া, এমনিতেও, ওগুলো ওখান থেকে সরিয়ে আনা দরকার। স্নো টানেলে ছ'টা লাশ পড়ে আছে, এই চিন্তাটাই আমার লোকজনের মনোবলের বারোটা বাজিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। এটা সাংঘাতিক একঘেয়ে হিম রাজ্য, মিস্টার জয়। এখানে মগজের মাত্র পঞ্চাশ ভাগ কাজ করে, ফলে সবারই মন খুব দুর্বল থাকে।'

'সাত নম্বর লাশ?' মনে করিয়ে দিল রানা।

প্লেন ক্র্যাশের পরদিন ওটা আরেকটা অ্যাক্সিডেন্ট। তুষার ঝড়ের মধ্যে পড়ে তরুণ রেডিও অপারেটর রত্নে গোপালচন্দ্র গায়েব হয়ে গেছে।

খবর নিতে গিয়ে জানা গেল, মাত্র তিনশো গজ দূরের একটা সারফেস হাট থেকে ক্যাম্পে ফিরছিল সে, এই সময় হঠাৎ প্রবল তুষার ঝড় শুরু হয়ে যায়।

'ইক ভাগওয়ানকোই মালুম হোগা কিঁউ!' দুঃখে আর রাগে মাতৃভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সুভাষ ক্যাম্পের কমান্ডার। 'যাতে পথ না হারায়, সেজন্যে তার সঙ্গে একটা গাইডলাইন ছিল। নিয়মটা সবারই জানা–আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেলে নিরাপদে ফেরার জন্যে আপনার বেল্টটা গাইডলাইনে আটকে নিতে হবে। শুধু নিয়ম নয়, এটা অবশ্য পালনীয় একটা আইন। এরকম আমি করেছি…সবাই করে। কিন্তু…'

প্রকৃতি এখানে শীতল, নির্দয় প্রতিপক্ষ–সমস্ত শক্তি আর অস্ত্র নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় আছে। আর আছে একজন বেঈমান। নাকি একাধিক?

প্রচুর কৌতুক আর হাস্যরসের দেখা পাওয়া যাবে, তবে তা শুধু সারফেসে; নীচে নামবার পর কেউ ভোলে না যে টেকনোলজি আর দৃঢ়প্রত্যয়, সেই সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে লালিত সাবধানতা অবলম্বনের যে-সব কঠোর নিয়ম-পদ্ধতি আছে সেগুলোর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যই শুধু এখানে বেঁচে থাকা সম্ভব করে তুলবে।

পরদিন সকালে তুষার ঝড়ের মধ্যেই থিউল এয়ারপোর্ট থেকে বড়ে মিয়াকে বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে নিয়ে এল সার্জেন্ট নিখিল। হোভারক্রাফটে চড়ে আসা একজন আগন্তুকের সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দিলেন কর্নেল শর্মা।

ভদ্রলোক পাকিস্তানি, নাম জাভেদ হাশমি, রিয়্যাক্টর ইঞ্জিনিয়ার। মোটা, বেঢপ আকৃতি; ম্লান, কাতর চেহারা। পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বছর বয়স হবে। হাতটা বাড়িয়ে দিতে উঠে দাঁড়িয়ে ধরল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'এই প্রথম নেতাজি ক্যাম্পে যাচ্ছেন?'

'আরে না! বলতে পারেন প্রথম থেকেই আমি ওখানে। জানেন তো, ওটা পাকিস্তানি রিয়্যাক্টর? ওটা ওখানে বসাবার সময় ছিলাম আমি, তারপর গত পাঁচ বছরে অন্তত সাত-আটবার যেতে হয়েছে। কোন একটা সমস্যা হোক, ডিপ ফ্রিজে ডাক পড়বে আমার।'

মেস হলে রয়েছে ওরা, সবার সামনে মগ ভর্তি ধূমায়িত কফি। 'জায়গাটা কেমন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হেসে ফেললেন হাশমি। 'আমার বিবিসাহেবার ধারণা–মদ, এস্কিমো মেয়েছেলে আর আইসক্রিমের রাজ্য ওটা। আসলে এক কথায় নেতাজি ক্যাম্প সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে পারবেন না।'

'কিন্তু...'

'কেন কিছু বলা সম্ভব নয়, জানেন? বরফ স্থির নয়, সারাক্ষণ নড়ছে, আকৃতি বদলাচ্ছে, তাই। কয়েক বছর পর একটা জায়গার অস্তিত্ব থাকে না। আমাদের নেতাজি ক্যাম্পের কথাই ধরুন, হঠাৎ একদিন শুনবেন, সরিয়ে নিতে হবে, কারণ নীচটা নড়ছে।

'ওখানে আপনি সাত হাজার ফুট বরফের মাথায় রয়েছেন, ঠিক আছে? সার্ভে বলবে, জায়গাটা নিরেট। জমাট বাঁধার ধরন, লক্ষণ আর স্থিতির মাত্রা পরিমাপ করুন, গ্রাফ তৈরি করুন, মাপ নিন–কিন্তু কেউ কি জানে নীচে কী ঘটছে?

'নেতাজি ক্যাম্প গত বছর দু'ফুট সরে গেছে একপাশে। খুব বেশি না, না? কিন্তু আপনি জোর দিয়ে বলতে পারেন, নীচে কোথাও কিছু একটা খুলে যায়নি বা

ফাঁক হতে শুরু করেনি?' কাঁধ ঝাঁকালেন ইঞ্জিনিয়ার হাশমি। 'আপনি উদ্বিগ্ন, মিস্টার জয়?'

'ইন্টারেস্টেড।'

'কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন,' বললেন হাশমি, গাম্ভীর্য আর বিষণ্নতার পরদা সরে গেল, চোখের মণিতে দেখা গেল কৌতুকের ঝিলিক। 'আমি উদ্বিগ্ন আমার পকেট নিয়ে। নেতাজিতে তুমুল তাস খেলা হয়। সবার একটাই উদ্দেশ্য, আপনার পকেট খালি করা। সঙ্গে টাকা আছে?'

'সামান্য।'

'বঙ্গবন্ধুতে রেখে যান। তা না হলে ওরা আপনাকে ফতুর বানিয়ে ছেড়ে দেবে। বিশেষ করে শ্রীলঙ্কানদের সঙ্গে একদমই খেলবেন না!'

হেসে উঠে চেয়ার ছাড়ল রানা, কর্নেল শর্মার ইঙ্গিতে তাঁর পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল মেস হল থেকে। হেডকোয়ার্টার হাট-এ ঢুকল ওরা।

সার্জেন্ট ক্লার্ক জানাল। 'ভাল খবর, সার। নেতাজির সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ হয়েছে। ঝড় থেমে আসছে ওখানে। তুষারপাতও। উড়ে যাবার মত একটা ফাঁক বোধহয় তৈরি হচ্ছে।'

সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল শর্মা।

'কখন?' জানতে চাইল রানা।

'তাড়াতাড়ি,' বললেন কর্নেল শর্মা। 'কয়েক ঘণ্টা, কিংবা হয়তো কয়েক মিনিট।'

থপ্-থপ্ আওয়াজ তুলে ভিতরে ঢুকলেন কর্নেল ভীম সিং যাদব। দেখা গেল খবরটা আগেই তিনি পেয়েছেন। রানাকে বললেন, 'রওনা হবার জন্যে তৈরি হন, মিস্টার জয়।'

'বড়ে মিয়া আসার পর থেকে আমি তৈরি হয়ে আছি,' বলল রানা। 'আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমিই ওটাকে চালিয়ে নিয়ে যাব।'

'আপনি হোভারক্রাফট চালাতে পারেন?'

'কাজ চালাবার মত পারি আর কী।'

মাথা নাড়লেন কর্নেল যাদব। 'আমরা শুধু একটা স্লট…একটা ফাঁক পেয়েছি, বড় কোন ওয়েদার ব্রেক পাইনি। আপনি আমার সঙ্গে প্লেনে যাবেন। ড্রাইভার এখনও অসুস্থ, কাজেই বড়ে মিয়াকে চলতি-কা-নাম-গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেয়া হবে। তুমি কী বলো, হে, শর্মা?'

কাঁধ ঝাঁকালেন শঙ্কর দয়াল শর্মা। 'কার ঘাড়ে কটা মাথা যে কালো ভালুকের সঙ্গে তর্ক করবে?'

দুই কর্নেলের রসিকতা শুরু হতে যাচ্ছে দেখে রানা তাড়াতাড়ি বলল, 'এখানে এয়ারপোর্ট বা প্লেন কোথায়? আমি তো দেখিনি?'

কর্নেল যাদব বললেন, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিন, মিস্টার জয়। আমরা থিউল থেকে প্লেনে উঠব।'

'নেতাজি ক্যাম্পে তাড়াতাড়ি পৌঁছানটা যখন এতই দরকার, প্লেনে ওঠার জন্যে আমরা থিউলে যাচ্ছি কেন?' জানতে চাইল রানা। 'একটা হেলিকপ্টার

আনিয়ে নিলে হত না?'

কর্নেল যাদবের কালো মুখ আরও গাঢ় হয়ে উঠল। 'আমাদের ফিক্সড উইং দরকার। কারণ···হেলি ক্র্যাশের ব্যাপারটা তো আপনি জানেনই।'

তাকিয়ে আছে রানা, যেন আরও কিছু শুনতে চায়।

'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইনভেস্টিগেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত নেতাজিতে কোন হেলিকপ্টার যাবে না।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে সেই ক্যাটারপিলার লাগানো ভেহিকেলটায় আবার চড়ে বসল রানা। থিউল এয়ারপোর্টে যাচ্ছে ওরা, রিয়্যাক্টর ইঞ্জিনিয়ার জামিল হার্শমিকে নিয়ে তিনজন আরোহী। কর্নেল যাদব রানাকে জানালেন, প্লেনটা কানাডিয়ান কোম্পানি দ হ্যাভিল্যান্ড-এর তৈরি ক্যারিবু।

কোন ঘটনা ছাড়াই বিশ মাইল বরফ পেরিয়ে থিউল এয়ারপোর্টে পৌঁছাল গাড়ি। রেডিও মেসেজ পেয়ে ক্যারিবু নিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল পাইলট। জোড়া ইঞ্জিন বসান প্লেনটার ডানা আর লেজ কমলা, বাকি অংশ রুপালি। র‍্যাম্পটা লেজের দিকে। ওদের গাড়ি সরাসরি প্লেনটার পাশে এসে থামল। সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা আগেই সেরে রাখা হয়েছে, গাড়ি থেকে নেমে সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাম্প বেয়ে প্লেনে চড়ল ওরা। তারপর কিছু কার্গো তোলা হলো।

খালি ক্যাবিন-যেন নরকের মত ঠাণ্ডা। ভিতরে শুধু একজন ক্রু দাঁড়িয়ে আছে।

'ফাঁকটা কি এখনও আছে?' জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার।

'জী, কর্নেল, হ্যায়–আভি তক্।'

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলালেন কর্নেল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দিন পাওয়া যাচ্ছে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা, তাও প্রতিদিন খানিকটা করে কমছে। 'কিন্তু দিনের আলো থাকতে ওখানে আমরা পৌঁছাতে পারব না।'

'না, সার। তবে এর আগেও রাতে আমরা গেছি, সার।'

'জানি, জানি। ঠিক আছে, পাইলটকে বলো আমরা রেডি।'

প্লেনে ফিউজিলাজের কিনারা ঘেঁষে সিট ফেলা হয়েছে, ফলে মাঝখানে চওড়া একটা জায়গা খালি পড়ে আছে কার্গোর জন্য। কার্গো বলতে কাঠের দুটো বাক্স দেখা গেল শুধু।

পাইলট আনাড়ি, নাকি অতিরিক্ত ব্যস্ত বোঝা গেল না–র‍্যাম্প সরিয়ে দরজা ভাল করে বন্ধ করবার আগেই প্লেন ছেড়ে দিল সে। ক্যারিবু হাই-উইং মনোপ্লেন. অল্প একটু ছুটেই আকাশে উঠে পড়ল।

মুহূর্তের জন্য রানার কাঁধে ভারী একটা হাত রাখলেন কর্নেল। 'সিট-বেল্ট সাইনের জন্যে অপেক্ষা করবেন না, ওটা নেই,' বলবার পর ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে একটু বোধহয় লজ্জাই পেলেন, দেখলেন এরইমধ্যে নিজের সিট-বেল্ট বেঁধে ফেলেছে রানা। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি, বিড়বিড় করে উঠলেন, 'ওয়াও! কিয়া খুবসুরাত সানসেট!'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। ওদের নীচে, উপকূল রেখা থেকে, দ্রুত উপরে উঠে আসছে আইসক্যাপ। প্লেনের চারপাশে অসংখ্য নিচু পাহাড়–শে

বেলার আলোয় লাল, সোনালি আর কালো দেখাচ্ছে।

কর্নেল বললেন, 'কিন্তু এ টেকে না।'

'আমাদের ক্যাম্প কমান্ডার সত্যিকার অর্থে কবি, মানে, একজন রোমান্টিক মানুষ,' মন্তব্য করলেন জাভেদ হাশমি।

'এই ছবিটা আমি একবার এঁকেছিলাম,' হাসিমুখে বললেন কর্নেল যাদব।

'নিশ্চয়ই আর্মি গ্রিন, নয়তো আইস-অরেঞ্জ কালারে,' বললেন হাশমি, রানার দিকে ফিরে একটা চোখ মটকালেন। 'যদি অয়েলপেইন্টিং করে থাকেন, নির্ঘাত ডিজেল ব্যবহার করেছিলেন। এই ভদ্রলোকের কাছে ক্যানভাস বাতাস ঠেকানোর আর চারকোল আগুন ধরানোর সামগ্রী মাত্র।'

টেক-অফ করবার বিশ মিনিট পর দিনের আলো ফুরিয়ে গেল, চারদিকের দৃশ্য হয়ে উঠল কালো আর রুপালির নিষ্প্রভ মিশ্রণ।

ককপিট থেকে একবার ঘুরে এসে কর্নেল যাদব বললেন, 'আবহাওয়া মোটামুটি।'

'মোটামুটি, কর্নেল?' ঘাড় ফিরালেন হাশমি।

'তুষারকণা উড়ছে, এলোমেলো দমকা বাতাস।' হাতঘড়ি দেখলেন কমান্ডার। 'আর মাত্র আঠারো মিনিট। এখন শুধু আপনি এই আবহাওয়াটা ধরে রাখুন, প্লিজ।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি আমাকে বলছেন?'

চট করে একবার উপর দিকে তাকালেন কর্নেল। 'ওপরে বসে যিনি কলকাঠি নাড়ছেন। এটা যদি তিনি তৈরি করে থাকতে পারেন, ধরেও রাখতে পারবেন।'

'এত দ্রুত বদলে যাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কমান্ডার যাদবের কণ্ঠস্বর কর্কশ লাগল কানে। 'এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে।' তাঁর মুখের প্রতিটি ভাঁজ আর রেখায় উদ্বেগ আর উত্তেজনা ফুটে উঠল। 'এটা ফ্যান্টম হলে দেড় মিনিটে পৌঁছে যেতাম, কিন্তু ক্যারাবুর সে সাধ্য নেই।'

'ঠিক,' বলে একটা সিগারেট ধরালেন হাশমি। রানাকে সাধলেন তিনি, ও মাথা নাড়ছে দেখেও বেনসনের প্যাকেটটা গুঁজে দিলেন ওর পকেটে। 'প্রেজেন্ট করলাম, নন-স্মোকার হলেও গা গরম করার জন্যে মাঝে মধ্যে টান দেবেন।'

দু'মিনিট পর আবার সিট ছেড়ে ককপিটে গিয়ে ঢুকলেন কমান্ডার। এবার ফিরতে দেরি করছেন। কে জানে কী ঘটছে সামনে। রানা খেয়াল করল, বারবার হাতঘড়ি দেখছেন হাশমি।

পনেরো মিনিট পর ফিরলেন কর্নেল, চোখ-মুখ থমথম করছে। বললেন, 'তুষার আগের চেয়ে অনেক ঘন হয়ে পড়ছে, দশ থেকে বাতাসের গতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে বিশ নটে।' ধপাস করে সিটে বসে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধলেন নিজেকে।

রানা জানতে চাইল, 'নেতাজি ক্যাম্পের ল্যান্ডিং স্ট্রিপটা কী রকম?'

'ঠিক ল্যান্ডিং স্ট্রিপ বলতে যা বোঝায়, সে রকম কিছু নেই ওখানে। বরফ, মিস্টার জয়। ছয়শো গজ।'

অপেক্ষায় থাকল ওরা। প্লেনের নাক নীচের দিকে তাক করে ধীর ভঙ্গিতে বাঁক নিচ্ছে পাইলট। কেউ কথা বলছে না। সোজা হলো ক্যারিবু, সাবলীল ভাবে

নীচে নামছে।

পাশের জানালা দিয়ে তাকিয়ে ফ্ল্যাপগুলোকে নড়তে দেখল রানা। এলোমেলো বাতাসের চাপে একটা ডানা উঁচু হলো, আবার সেটাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে নিশ্চয়ই হিমশিম খেয়ে গেল পাইলট। তারপর ইঞ্জিনের পাওয়ার কমাল সে, ল্যান্ড করবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কর্নেল যাদবের দিকে তাকাল রানা। চোখ বুজে আছেন ভদ্রলোক; সমস্ত আকুলতা নিয়ে কল্পনায় দেখতে চেষ্টা করছেন প্লেনটা নিরাপদে ল্যান্ড করেছে।

আর যখন মাত্র কয়েক সেকেন্ড বাকি, অকস্মাৎ ম্যাক্সিমাম পাওয়ার অ্যাপ্লাই করল পাইলট, নাক উঁচু করে রকেটের মত উপরে উঠে যাচ্ছে ক্যারিবু।

ঝট করে চোখ খুলে ককপিটের দিকে তাকালেন কর্নেল। দরজা খুলে সেই ক্রু লোকটা ক্যাবিনে ঢুকল। 'সার,' কমান্ডারকে বলল সে। 'রানওয়ের আলো নিভে গেল!' মুখে তার রক্ত নেই।

'আলো নিভে গেল মানে?' গর্জে উঠলেন কর্নেল, চেয়ার ছেড়ে উঠে থপ্-থপ্ করে ককপিটের দিকে এগোলেন।

রানার পেটের ভিতর যেন গিঁট পড়ছে। প্লেন নিশ্চয়ই বরফের একশো ফুটের মধ্যে চলে এসেছিল, থ্রটল পিছানো ছিল অনেকটা, প্রতি মুহূর্তে ওরা নামছিল আরও, এই সময় নিভে যায় আলো।

ভাগ্য, কিংবা দক্ষতা, অথবা দুটো মিলে মর্মান্তিক একটা দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ওদেরকে। তবে মার্জিনটা নিশ্চয়ই অতি সামান্য ছিল।

ঠাণ্ডা ঘামে চকচক করছে হাশমির ত্বক, চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছেন। 'এখন কী হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

চোখ তুলে ওর দিকে তাকালেন হাশমি। 'থিউল,' বললেন তিনি। 'প্রার্থনা করুন, মিস্টার জয়, আমরা যেন থিউলে ফিরে নিরাপদে ল্যান্ড করতে পারি।'

ইতিমধ্যে লেভেলে এসেছে প্লেন, চক্কর দিচ্ছে, প্যাটার্নটা ধরে রাখবার জন্য স্টারবোর্ড উইংটিপ মাঝে মধ্যে উঁচু করছে পাইলট।

অ্যাক্সিডেন্ট থেকে কোন রকমে রক্ষা পাওয়ার পর ছ'মিনিট পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ এখনও চক্কর দিচ্ছে ক্যারিবু।

সিট-বেল্ট খুলে ফেলল রানা, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। প্রথমে মনে হলো বিরতিহীন বরফ ছাড়া আর কিছু নেই নীচে। তারপর একটা আলো চোখে পড়ল। না, দুটো আলো। আশ্চর্য, ওগুলোকে হেডলাইটের মত লাগছে! পিছনে আরও দুটো। চোখ মিটমিট করল রানা। সত্যি হেডলাইটই তো!

ইঞ্জিনিয়ার হাশমি ভয়ে কুঁকড়ে গেছেন। 'ট্র্যাক্টরের আলোয় ল্যান্ড করতে যাচ্ছে পাইলট!' নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। 'হায় খোদা! কে জানত এই লোকের হাতেই মৃত্যু ছিল আমার!'

সিট ছেড়ে ককপিটের দিকে এগোল রানা। তারপর দরজা খুলতেই অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেল।

জরুরি অবতরণের জন্য সাহস যোগাচ্ছেন কর্নেল যাদব, কিন্তু ঘন ঘন মাথা নেড়ে পাইলট তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছে এরকম মারাত্মক ঝুঁকি নেওয়াটা

মোটেও উচিত হবে না।

উইন্ডশিল্ড দিয়ে নীচে তাকাল রানা। ট্র্যাক্টরের আলো যথেষ্ট নয়, এখনও বেশিরভাগ জায়গা অন্ধকার। ওগুলো দাঁড়িয়েওছে এলোমেলো ভাবে, ফলে ল্যান্ড করবার সময় হিসাবে একচুল ভুল হয়ে গেলে নির্ঘাত ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে প্লেন। পাইলটকে দোষ দিতে পারল না ও।

'ইউ বাস্টার্ড!' অকস্মাৎ হুংকার ছাড়লেন কমান্ডার যাদব, সিট থেকে তুলবার জন্য পাইলটকে ধরে রীতিমত টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করেছেন। স্ট্র্যাপ, হেডসেট ইত্যাদি খুলে কোন রকমে তাঁকে জায়গা ছেড়ে দিল বেচারি।

প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে পাইলটের সিটে বসেই সামনের দিকে ঝুঁকলেন কর্নেল। তাঁর হাত দুটো চঞ্চল প্রজাপতির মত কন্ট্রোল প্যানেলের উপর ঘুরে বেড়াল। চক্কর দেওয়া বন্ধ করল প্লেন। কর্নেল ল্যান্ড করবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

হঠাৎ কর্নেল স্থির হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রানার চোখে ধরা পড়ল ব্যাপারটা। তাঁর শুধু হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে।

অবশ্য ঢিলটা আগেই ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন আর কারও কিছু করবার নেই। গোত্তা খেয়ে তীরবেগে নীচে নামছে প্লেন। এখন ওটাকে ল্যান্ড না করিয়ে উপরে তুলতে চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত ঘটে যাওয়ার সমূহ আশংকা।

একেবারে শেষ মুহূর্তে নার্ভ হারিয়ে ফেলে ঠিক তাই করে বসলেন নেতাজি ক্যাম্পের কমান্ডার। পাইলট গুঙিয়ে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকল। ভয়ে কুঁকড়ে গেল রানা।

একটা ট্র্যাক্টরের ছাদের সঙ্গে বাম দিকের ডানা মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্য ঘষা খেল না। ভীত-সন্ত্রস্ত লোকজনকে বরফের উপর ছুটোছুটি করতে দেখল রানা। তবে মারাত্মক কিছু ঘটল না, প্লেনটাকে বিপজ্জনক নীচে থেকে নিরাপদ উপরে তুলে আনলেন কমান্ডার।

'এ আমার পক্ষেও সম্ভব নয়,' বলে নার্ভাস ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন কর্নেল যাদব। 'কী আর করা, চলুন থিউলে ফিরে যাই।'

'আমার ফ্লাইং লাইসেন্স আছে,' পিছন থেকে বলল রানা। 'আমি একবার চেষ্টা করে দেখব?'

'ফ্লাইং লাইসেন্স তো আমাদের লছমন শেঠিরও আছে, দেখলেন না তারপরও বিপদের সময় কেমন ডিগবাজি খেল! না, মিস্টার জয়, আমি কোন ঝুঁকি নিতে পারব না। থিউলে ফিরছি আমি, ওখান থেকে চলতি-কা-নাম-গাড়িতে চড়ে নেতাজিতে যাওয়া যাবে।'

'কিন্তু তা সম্ভব নয়,' শান্তকণ্ঠে জানাল রানা। 'কারণ ফুয়েল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, থিউলে ফেরার উপায় নেই।'

ফুয়েল গজের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলেন কর্নেল, 'অ্যায় ভাগওয়ান, বাচা লে তু!'

'বললাম না, আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই,' আবার বলল রানা।

'কিন্তু...' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকালেন কর্নেল, তারপর হেডসেট আর স্ট্র্যাপ খুলে পাইলটের সিট ছেড়ে সরে গেলেন, রক্ত নেমে যাওয়ায় কালো চেহারা

পাঁশুটে দেখাচ্ছে।

কন্ট্রোল প্যানেলের কোথায় কী আছে আগেই দেখে নিয়েছে রানা। একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে ট্র্যাক্টরের আলোয় আবছাভাবে আলোকিত ছয়শো গজ লম্বা বরফের বিস্তৃতিটাকে প্লেনের সামনে নিয়ে এল। গতি আগে থেকেই কমাতে শুরু করেছে ও, আরও কমাচ্ছে, পারলে যেন ক্যারিবুকে শূন্যে দাঁড় করিয়ে ফেলে। এই অবস্থাটা আদর্শ, স্কিগুলোকে এখন বরফে নামিয়ে দিলেই হয়।

কিন্তু না, বহুমুখী দমকা বাতাস প্লেনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাইছে। এই বিপদ সামাল দেওয়ার জন্য ইঞ্জিনের পাওয়ার বাড়াতে হলো রানাকে। খানিকটা শান্ত হলো ক্যারিবু, তারপরও ওটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ও।

দু'সারি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসেছে, স্কিগুলো বরফের উপর নামিয়ে আনল রানা। প্রথমবারের সংঘর্ষে ফুটবলের মত ড্রপ খেল প্লেন; দ্বিতীয়বার শুধু একটা স্কি বরফে নামল, স্টারবোর্ড ডানার ডগা উঁচু হচ্ছে।

আরেকটা ছোট ড্রপ, তারপরই বরফ কামড়ে ধরে ছুটল ক্যারিবু। আচমকা হেডলাইটের আলো ধাঁধিয়ে দিল রানার চোখ, পাতা বন্ধ করে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে দু'সেকেন্ড রগড়াতে হলো। একটু পর দাঁড়িয়ে পড়ল প্লেন।

'থ্যাঙ্কিউ, মিস্টার জয়, থ্যাঙ্কিউ!' মস্ত থাবা দিয়ে রানার কাঁধ চাপড়ে দিলেন ভীম সিং যাদব। 'নাউ, লেটস্ গো!'

সিট ছেড়ে পাইলটের দিকে একবার তাকাল রানা। 'সাপ্লাই ক্যাম্প থেকে রওনা হবার সময় ট্যাংকে এত কম ফুয়েল থাকবে কেন?'

কর্নেল ককপিট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, চট করে একবার সেদিকটা দেখে নিয়ে পাইলট লছমন শেঠি জবাব দিল, 'এ-সব দেখার দায়িত্ব গ্রাউন্ড ক্রুদের, মিস্টার জয়, তারাই ভাল বলতে পারবে।'

ঘুরে কর্নেলের পিছু নিল রানা।

পিছনের র‍্যাম্প এরইমধ্যে নামানো শুরু হয়েছে। দরজার কাছে পৌঁছানোর আগেই দাপিয়ে বেড়ানো বাইরের বাতাস ভিতরে ঢুকে ধাক্কা দিল রানাকে। র‍্যাম্প বেয়ে নেমে এসে অপেক্ষারত পোলক্যাটে উঠে বসল ও।

পিছু নিয়ে হাশমি উঠলেন, দড়াম করে বন্ধ করলেন দরজাটা। বেশ কয়েক মুহূর্ত নিষ্প্রাণ একটা স্তূপের মত পড়ে থাকলেন তিনি, তারপর জোর করা একটু নিঃশব্দ হাসির সঙ্গে বললেন, 'আমি ভাই মরুভূমির মানুষ, আল্লাহই মালুম কোন বুদ্ধিতে এখানে আসতে চেয়েছিলাম!'

দু'মিনিট পর ওদের সঙ্গে মিলিত হলেন কর্নেল যাদব। চেহারা রাগে ফুলে আছে দেখে কারণটা জানতে চাইলেন হাশমি।

'শালী জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। অপেক্ষা করতে পারবে না। ও.কে., চলুন যাওয়া যাক।'

পোলক্যাট রওনা হওয়ার পর উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে প্লেনটাকে দেখতে পেল রানা, এরইমধ্যে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। 'এত তাড়াতাড়ি জমে যাবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

ব্যাখ্যা করলেন কর্নেল, 'এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকুক, তারপর আর নড়ানো যাবে না। তিন মিনিট, স্কি আটকে যাবে।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। 'সময় পাওয়া যায় না।'

'তারমানে ওটা খালি?' জানতে চাইল হাশমি।

'নয়তো কী।'

ব্যাপারটা বুঝতে পারছে রানা। লাশগুলো না নিয়েই থিউলে ফিরে যাচ্ছে ক্যারিবু। আরেকটা ওয়েদার স্লট তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ক্যাম্প নেতাজিতে বিষণ্নতা আর অস্বস্তি ছড়াবে ওগুলো।

ছোট পোলক্যাটটা বরফের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। হঠাৎ শুরু হওয়া একটা ঢাল বেয়ে নেমে এল ওরা, এক কি দু'সেকেন্ড পর ঢুকল লম্বা একটা টানেলে। ভিতরে উজ্জ্বল আলো, দেয়ালগুলো ঢাকা পড়ে আছে পাইপ আর কেবল্-এ।

ড্রাইভারের কাঁধে টোকা মারলেন কমান্ডার। 'আমার ট্রেঞ্চে।'

পোলক্যাট থামতে লাফ দিয়ে নীচে নামলেন তিনি, তাঁর পিছু নিয়ে খিলান আকৃতির ফাঁক গলে আরেকটা ছোট টানেলে ঢুকল ওরা।

একটু সামনে এগোতেই কাঠের বড়সড় একটা হাট বা কুঁড়ে পাওয়া গেল, দরজায় কমলা রঙে স্টেনসিল করা–'সার্ক ওয়েদার অ্যান্ড রিসার্চ ফ্যাসিলিটি'। তার নীচে লেখা: 'কমান্ডার'।

দরজা খোলাই রয়েছে, কবাট ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন কর্নেল। একহারা গড়নের একজন মাস্টার সার্জেন্ট মুখ তুলে তাকাল, তারপর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে স্যালুট করল। 'সব ভাল, সার?'

মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। 'শিওর। এদিকে?'

'কোন সমস্যা নেই, সার।'

'তুমি ঠিক জানো?'

'ইয়েস, সার।'

'গুড।'

'সার,' মাস্টার সার্জেন্ট বলল। 'ডক্টর হাবিব বলে রেখেছেন, বাংলাদেশ থেকে কোনও ভদ্রলোক এলে তাঁকে যেন আমি খবর দিই।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, এখনই খবর দাও তাঁকে।'

দরজা খুলে টানেলে বেরিয়ে গেল মাস্টার সার্জেন্ট, আবার বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল সেটা।

'ফলো মি, জেন্টেলমেন,' বলে আরেক দরজা দিয়ে ছোট একটা ঘরে ঢুকলেন কর্নেল।

এখানে একটা বার রয়েছে। বোতল থেকে তিনটে সরু, লম্বা গ্লাসে এক আউন্স করে ব্র্যান্ডি ঢাললেন তিনি। রানা আর হাশমির হাতে একটা করে গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ রাতে আমাদের অতিথি, বাংলাদেশ স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি মিস্টার বিজয় হাসানের আগমন উপলক্ষে, বিশেষ ডিনারের আয়োজন করা যেতে পারে। কী খেতে পছন্দ করবেন বলে ফেলুন। কুকের হাতে পুরো দু'ঘণ্টা সময় আছে।'

'খেতে বসবার আগে আমি একবার ডক্টর ফারুকের ল্যাবটা দেখতে চাই, মিস্টার যাদব।' রাগ হলেও, সেটা চেপে রাখল রানা।

ঠিক সময় মত, প্লেনটা যখন ল্যান্ড করতে যাচ্ছে, নিভে যায় আলোটা—অথচ এ-ব্যাপারে কারও কোন মাথাব্যথা থাকবে না? একা শুধু কমান্ডার নন, তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়েছেন পাকিস্তানি ইঞ্জিনিয়ার জাভেদ হাশমিও।

খানাপিনার কী আয়োজন করা হবে তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কমান্ডার, আর ইহুদি সমাজে প্রচলিত জোক শোনাচ্ছেন হাশমি।

রানা কথা বলছে না বা হাসছে না বলেই কিনা, একটু পরই 'আসছি' বলে হাট ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন কমান্ডার। যাওয়ার আগে আরও দু'আউন্স সাবাড় করলেন। দু'মিনিট পর হাশমিও চলে গেলেন।

ওরা চলে যাওয়ার পরপরই নিহত ডক্টর ওসমান ফারুকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডক্টর হারুন হাবিবকে নিয়ে ফিরে এল মাস্টার সার্জেন্ট। রানার মনে পড়ে গেল বসের কাছ থেকে পাওয়া ফোল্ডারটায় আর কি আছে।

তরুণ মেধা ডক্টর হারুন হাবিব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যাকটেরিয়লজি নিয়ে পিএইচডি করেছে। যেহেতু দ্বিতীয় প্রজন্মের মার্কিন নাগরিক সে, এম.এস. পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করায় তার উপর চোখ ছিল কর্তৃপক্ষের, পিএইচ.ডি-তে ব্রিলিয়ান্ট একটা পেপার সাবমিট করায় 'না।সা'-য় রিসার্চ করবার লোভনীয় একটা সুযোগ দেওয়া হয় তাকে।

কিন্তু সেখানে মাত্র এক বছর কাজ করবার পর হঠাৎ চাকরিটা ছেড়ে দেয় ডক্টর হারুন, তারপর স্ত্রী আর ছ'মাস বয়েসী একমাত্র পুত্রসন্তানকে রেখে সোজা উড়ে চলে আসে মা-বাবার ফেলে যাওয়া বাংলাদেশে। পাসপোর্ট-ভিসা পেতে তার কোন অসুবিধে হয়নি।

ঢাকার কোন এক দৈনিক পত্রিকায় তার সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল, সেখানে নিজের সিদ্ধান্ত আর উপলব্ধি সম্পর্কে হৃদয়স্পর্শী একটা ব্যাখ্যা দেয় ডক্টর হারুন: 'এ দেশে আমার জন্ম হয়নি বটে, কিন্তু নাড়ির টান অস্বীকার করব কীভাবে? আমি অতি নগণ্য একজন মানুষ, এই হত-দরিদ্র মাতৃভূমি যদি আমার দ্বারা সামান্য একটুও উপকৃত হয়, তাহলে মনে করব আমার জন্ম সার্থক হয়েছে।'

সে সময় সাক্ষাৎকারটি পাঠকমহলে খুব সাড়া ফেলেছিল। অভিশপ্ত ব্রেন-ড্রেন যখন দেশের সমস্ত প্রতিভাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিদেশে, তখন কেউ যদি আরাম-আয়েশ আর বিলাসিতার জীবন ত্যাগ করে মাতৃভূমির সেবা করতে এগিয়ে আসে, মানুষকে তা স্পর্শ না করে পারে না।

ডক্টর ওসমান ফারুক এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন, হারুন হাবিব তখন তাঁর ছাত্র ছিল। দেশে চলে এসে ঢাকা ভার্সিটিতেই যোগ দিল সে, এবং ডক্টর ফারুককে বলল—সার, আমি আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাই।

ব্রিলিয়্যান্ট ছাত্র ছিল ডক্টর হারুন, ফারুক সার তাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে পেয়ে খুশিই হলেন।

*

ডক্টর হারুন হাবিব নিজের পরিচয় দেওয়ার সময় খুঁটিয়ে তাকে দেখল রানা। বয়সে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও, চঞ্চলতাকে দমিয়ে রাখতে পারায় চেহারায় প্রশান্ত একটা ভাব চলে এসেছে, আর চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত হওয়ায় ধীসম্পন্ন মনে হয়।

হ্যান্ডশেক আর পরিচয় বিনিময়ের পর সৌজন্য বা ভব্যতা দেখিয়ে ডক্টর হাবিব জানতে চাইল, এত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে আসতে মিস্টার বিজয় হাসানের কোন অসুবিধে হয়েছে কিনা। তার দ্বিতীয় প্রশ্ন, দেশের সব খবর ভাল তো?

রানা তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি মনে হয়, ওটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল?'

অপলক দৃষ্টিতে এক সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকবার পর ডক্টর হাবিব জবাব দিল, 'কাকতালীয় মনে হয় না? পাঁচ বছরের মধ্যে সারের গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগল না, অথচ যেই কিনা জিনিসটা তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন বলে জানালেন অমনি মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে?' মাথা নাড়ল সে। 'মেনে নিতে মন চায় না।'

'আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?'

'না, তা হয় না, তবে আমি কাউকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে বলেও মনে করি না। সাত জাতের দেড়শোর ওপর মানুষ এখানে, কে কোন্ স্বার্থে কাজ করছে বলা মুশকিল।'

'ডক্টর ফারুক আপনাকে কখনও বলেছিলেন তিনি কী নিয়ে কাজ করছিলেন?' জানতে চাইল রানা।

এক চিলতে হাসি ফুটল হাবিবের ঠোঁটে, চোখ দেখে মনে হলো কোন একটা মধুর স্মৃতি রোমন্থন করছে। 'জানার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। জানা আর না জানার ভাল-মন্দ দুটো দিকই ব্যাখ্যা করার পর সার আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিলেন। তিনি আমাকে বিশ্বাস করে সব বলতে চান, তাঁর এই ভালবাসা আর স্নেহটুকুই দরকার ছিল আমার। সে কথাই সারকে আমি জানাই। বলেছিলাম সবাই যখন জানবে আমিও তখন জানব।'

দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন কমান্ডার। বললেন, 'আপনার হাট এখনও ওরা তৈরি করছে। তাই ব্যাগগুলো এখানেই আনতে বলে দিলাম। চলুন, শাওয়ারটা একসঙ্গেই সেরে নিই।'

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের কাজে ফিরে গেল ডক্টর হারুণ হাবিব।

শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে প্রসঙ্গটা তুলল রানা।

কমান্ডার বললেন, 'আর্কটিক ফক্স।'

রানা ভাবল, মদ খেয়ে একটু বোধহয় নেশা হয়েছে কমান্ডারের, তাই তিনি কৌতুক করছেন। সবিনয় একটা ভাব ধরে রেখে হাসল ও।

'না, হাসির ব্যাপার নয়,' বললেন তিনি।

'আচ্ছা?'

কমান্ডার বললেন, 'বলছি কীভাবে ঘটে। সারাটা পথ চলতি-কা-নাম-গাড়ির পিছু নিয়ে আসে ওই মেরু শেয়ালের পাল, বেঁচে থাকে আমাদের স্নো ট্রেন থেকে

ফেলা উচ্ছিষ্ট খেয়ে। স্নো ট্রেনের লোকজন ও-সব পুঁতে রাখে, কিন্তু শেয়ালরা সব খুঁড়ে বের করে ফেলে খেয়ে নেয়।

'কিন্তু এখানে আমরা আবর্জনা খুব গভীরে পুঁতি, আর তাই এদিকের বুড়ো শেয়ালগুলো ভীষণ ক্ষুধার্ত থাকে।'

'এতটাই যে ইলেকট্রিক তার খেয়ে ফেলে?'

'না, তার নয়। চিবিয়ে ছিঁড়ে আনে ইনসুলেটিং মেটিরিয়াল। আমরা যেটাকে রানওয়ে বলি তার দু'পাশেই আলোর ব্যবস্থা আছে, কিন্তু জায়গা মত একটা কামড় পড়লে আপনার কপালে জুটবে মরা একটা শেয়াল আর প্রচুর অন্ধকার।'

'ওগুলোকে আপনারা ভাগাতে পারেন না?'

কমান্ডার বললেন, 'কী করে?' মাথা নাড়লেন তিনি। 'তবে হ্যাঁ, বিষ মাখানো টোপ ফেলে মেরে ফেলতে পারা যায়। কিন্তু আর্কটিক ফক্স আপনি দেখেছেন, মিস্টার জয়? ভাগওয়ান কী কাসাম! ইতনা সুন্দার, ইতনা সুন্দার–ইয়ে কুদরাত কী কোঈ জওয়াব নেহি! গুলি করে মারতে বলেন–হ্যাঁ, তা পারা যায়। কিন্তু বিষ···জি-নেহি, জনাব!'

'যতই বিপজ্জনক হোক?'

'মিস্টার জয়,' কমান্ডারের ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গাত্মক হাসি। 'আপনাকে আমার একজন লজিশিয়ান বলে মনে হচ্ছে।' হাসিটা তিনি দ্রুত মুছে ফেললেন। 'চাহে যিতনা ভি খতরনাক হো, যহর কভি নেহি।'

ঠিক এই সময় আলোটা নিভে গেল আবার।

তিন

কমান্ডার বললেন, 'নড়বেন না।'

'বেশ।'

ছপ্-ছপ্ আওয়াজ হলো। অন্ধকারে হাঁটাহাঁটি করছেন কর্নেল। এক এক করে দুটো শাওয়ারই বন্ধ করলেন।

'আপনি বরং আমার হাত ধরুন, তা না হলে কিছুর সঙ্গে হোঁচট খেয়ে হাড়গোড় ভাঙবেন।' কাঠের মেঝের উপর দিয়ে নির্বিঘ্নে রানাকে বড়সড় হাটটার আরেক প্রান্তে নিয়ে এলেন ভদ্রলোক। তারপর একটা পার্টিশন পার হয়ে তোয়ালে আর কাপড়চোপড়ের কাছে চলে এল ওরা।

'অন্ধকারে দেখতে পাওয়া নিশ্চয় খুব মজার,' বলল রানা। 'এটার কী কারণ? আরেকটা শেয়াল?'

'না। জেনারেটর।'

'ব্যাপারটা সিরিয়াস?' তোয়ালে দিয়ে গা মুছছে রানা।

কর্নেল বললেন, 'ওটা তিনটের মধ্যে একটা। ব্যাকআপের কোন কমতি নেই। তবে স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর সচল হতে ব্যর্থ হলে, বলা যাবে আমরা একটু

বিপদেই পড়েছি। আপনি একটু হাত চালান, প্লিজ।'

কাপড় পরবার সময় রানা জানতে চাইল, 'কখন বোঝা যাবে ব্যাপারটা সিরিয়াস কি না?'

'চার মিনিট পর। খুব বেশি হলে পাঁচ, তার বেশি নয়। এরপর ওয়াটার পাইপ জমে যেতে শুরু করে। প্রথমে ওগুলো ফ্রিজ হয়, তারপর ফেটে ফাঁক হয়ে যায়। সে এক বিরাট ঝামেলা, গোটা কাঠামোটা আবার নতুন করে তৈরি করতে হয় তখন।'

আলো ফিরে এল। কাপড় পরা শেষ, বুটের ফিতে বাঁধছেন কমান্ডার। 'এখান থেকে বেরিয়ে ক্লাবটা খুঁজে নিতে পারবেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আমি যাই দেখি জেনারেটর অচল হয়ে পড়ার কী ব্যাখ্যা দেয় ওরা।'

কাপড়চোপড় আর মোজার উপর স্নো-বুট আর পারকা পরে শাওয়ার হাট থেকে বেরিয়ে এল রানা। দরজা বন্ধ করে পা রাখল ঠাণ্ডা টানেলে।

স্নো ওয়াল, অর্থাৎ বরফ দেয়ালের গায়ে ঝুলে থাকা পাইপগুলোর দিকে তাকাল ও সমস্যা বা ঝামেলা যাই বলা হোক, সেটা পরিষ্কার। সমস্ত পাইপ ইনসুলেটিঙ মেটিরিয়াল দিয়ে মোড়া, কিন্তু যে তুষারের এক ইঞ্চি দূরে ওগুলো ঝুলছে সেই তুষার জমাট বেঁধে প্রায় বরফ হয়ে গেছে। পাইপ বরাবর, খানিক পর পর, হিটার বসান হয়েছে।

সিস্টেমটা কাজ করলে ভাল, ট্যাপ ঘুরালে গরম পানি বেরিয়ে আসবে। কিন্তু যদি চার মিনিট পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ থাকে, নেতাজি ক্যাম্পের লোকজনকে খাবার পানি যোগাড় করবার জন্য বালতিতে তুষার গলাতে হবে।

লম্বা পা ফেলে ক্লাব ট্রেঞ্চের দিকে এগোচ্ছে রানা। ওদিকে যেতে হলে প্রথমে ওকে সেন্ট্রাল টানেলে পৌঁছাতে হবে–সবাই যেটাকে মেইন স্ট্রিট বলে।

যে টানেলেই ঢুকল ও, ইমার্জেন্সি লাইটের আভায় সবগুলোর দেয়ালে গাদাগাদা পাইপ ঝুলতে দেখল। ক্যাম্প নেতাজি প্রচুর পাওয়ার খরচ করে।

কমান্ডার জেনারেটরের খবর নিতে গেছেন, হাশমি এরইমধ্যে তাঁর রিয়্যাক্টর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, ক্লাবে পরিচিত কাউকে পেল না রানা। দোরগোড়ায় এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল ও, পোলার স্টাইলে সময় কাটানোর নমুনা চাক্ষুষ করছে।

এক কোণে একটা টেবিলে বসে তাস খেলছে চারজন। খেলার দিকে তিনজনের খুব সতর্ক দৃষ্টি। অপর লোকটা চেয়ারে হেলান দিয়ে আছে, হাত দুটো পকেটে, তাকিয়ে আছে নিজের পার্টনারের দিকে।

শান্ত, চুপচাপ পরিবেশ। চার-পাঁচজন বার-এ বসে আছে, প্রায় সবাই তারা কার্ড প্লেয়ারদের দিকে তাকিয়ে। তাদের একজনই দোরগোড়ায় রানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে টুল ছেড়ে উঠে এল। প্রশ্ন করল চোস্ত উর্দুতে।

'আপনি মিস্টার জয়, বাংলাদেশ থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি আসায় আমরা সবাই খুশি। এতগুলো মানুষ মারা গেল, অবশ্যই

ভালমত তদন্ত হওয়া দরকার। ডক্টর ফারুককে সবাই আমরা শ্রদ্ধা করতাম...'

'আপনি?' ভদ্রলোককে ব্যতিক্রমই বলতে হবে, ভাবল রানা। এই প্রথম নিজে থেকে কেউ ডক্টর ফারুকের প্রসঙ্গটা তুলল।

'শওকত জামিল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার।' হাসিখুশি মানুষ, চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, শক্ত-সমর্থ কাঠামো।

হ্যান্ডশেক করল ওরা। দেখা গেল বার থেকে শুধু মদ নয়, অর্ডার দিলে চা বা কফিও পরিবেশিত হয়। রানাকে খাতির করে বসিয়ে কফির অর্ডার দিলেন জামিল। ওয়েটারকে ডেকে এক গ্লাস পানি চাইল রানা।

ওয়েটার পানি দিয়ে গেল। গ্লাসটা টেবিল থেকে তুলে রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন জামিল। 'আচ্ছা, দেখা যাক। ষোলো শতাব্দীর শুরু থেকে মাঝামাঝি সময়ে পাক-ভারত উপমহাদেশে বড় ঘটনা কী ঘটছিল? চিন্তা করার দরকার নেই কেন জানতে চাইছি। শুধু জবাব দিন।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'শাহজাহান তাজমহল তৈরি করছিলেন।'

মাথা ঝাঁকালেন জামিল। 'আপনি যে পানি খাচ্ছেন ওটা প্রায় ওই সময় তুষার হয়ে এখানে পড়ে ছিল। পানির কুয়া চারশো ফুটেরও বেশি গভীর। আমরা তুষার গলিয়ে পানি যোগাড় করি।' চারদিকে একবার চোখ বুলালেন। 'আসুন, কয়েকজনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

বাংলাদেশ থেকে তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা এসেছেন শুনে তাসের আড্ডাটা ভেঙেই গেল, টেবিল ছেড়ে উঠে এসে রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন সবাই।

তাঁদের সঙ্গে কথা বলে রানা বুঝল, ব্যাপারটা স্যাবোটাজ ছিল, অথবা ডক্টর ফারুককে খুন করবার প্রচেষ্টা, নাকি নেহাতই অ্যাক্সিডেন্ট, এ-ব্যাপারে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলতে না চাইলেও তদন্ত হবে শুনে তাঁরা খুশি। অর্থাৎ ব্যাপারটা নিয়ে সবার মনেই কমবেশি সংশয় আছে।

তবে দ্বিতীয় ঘটনাটা নিয়ে কারও মনে কোন খুঁতখুঁতে ভাব নেই। সবাই তাঁরা ওটাকে নিখোঁজ তরুণের দুর্ভাগ্য বা দক্ষতার অভাব বলে মনে করেন।

এক ভুটানি ভদ্রলোক, নাম চাঙমা ভিকু, অক্সফোর্ড থেকে পাস করা আবহাওয়াবিদ, বললেন, 'একটু একটু মনে পড়ছে, আপনি যে জগৎ থেকে এসেছেন সেখানে মেয়ে নামে কী যেন একটা পাওয়া যেত। সত্যি নাকি?'

হেসে ফেলল রানা। 'সত্যি। এখনও তারা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

পাঁচ রকম মানুষ এক জায়গায় অনেকদিন ধরে থাকায় পরস্পরকে মেনে নেওয়ার একটা মানসিকতা তৈরি হয়, এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তা সত্ত্বেও রানা ঠিক ধরতে পারছে না পরিবেশটায় কি যেন একটা আছে।

চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে ও, সেটা লক্ষ করে ডাক্তার বললেন, 'এখানে আপনি মানসিক অর্থে একজনকেও সুস্থ পাবেন না। আর পাবেন না কোন জানালা।' ইনি বাংলাদেশী, নাম আরিফ হাসান। ভদ্রলোক তালগাছের মত লম্বা, বয়স হবে পঞ্চাশ কি বাহান্ন। ঢাকার মানুষ।

'আপনিও নন?'

'আমি তো সবার চেয়ে কম সুস্থ।'

'কীসে ভুগছেন আপনি?'

'নিঃসঙ্গতায়।'

'তারমানে শরীর-স্বাস্থ্য সবারই বেশ ভাল,' মন্তব্য করল রানা। 'আপনি রোগী পান না।'

'সেটা একটা কারণ, আরেকটা কারণ এখানে কেউ দাবা খেলে না। আপনি খেলেন?'

'দুঃখিত। আমি এখানে একটা কাজে এসেছি।'

ডাক্তার আরিফ হাসানের চোখে কীসের যেন ছায়া পড়ল। 'ও, হ্যাঁ, মর্মান্তিক ওই অ্যাক্সিডেন্টটা।'

'আপনার তাই ধারণা, ওটা অ্যাক্সিডেন্টই ছিল?'

'অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া অন্য কিছু ভাবার কোন অবকাশ আছে, বলুন? কাউকে খুন করা হলে তার পেছনে তো একটা কারণ থাকতে হবে, নাকি? ডক্টর ফারুকের কাছে কী এমন সাত রাজার ধন ছিল যে তাঁকে খুন করা হবে?

'প্লিজ, আমাকে আবার ভুল বুঝবেন না। আমি এ-কথা বলছি না যে আমরা সবাই সাধু, আমাদের মধ্যে কোন খুনি বাস করে না।'

ইতিমধ্যে রানা উপলব্ধি করেছে, এটা প্রায় সবার কাছেই একটা ধাঁধা—ডক্টর ফারুক খুন হবেন কেন? এই ধাঁধার কারণ হলো, ভদ্রলোক যে গোপন একটা কিছু নিয়ে গবেষণা করছিলেন, প্রায় কেউই তা জানেন না। এমনকী তিনি মারা যাওয়ার পরও ব্যাপারটা অনেকের কাছে পরিষ্কার হয়নি।

'আপনি তা হলে বলছেন আমাদের মধ্যে খুনি আছে?' শান্ত ভঙ্গিতে, নরম সুরে প্রশ্নটা করল রানা; খেয়াল করল, ক্লাব ঘরে কেমন একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এসেছে।

'আমি বলতে চেয়েছি,' গলায় জোর এনে ডাক্তার হাসান বললেন, 'আমরা যে-কেউ সম্ভাব্য খুনি হতে পারি।'

রানা ঠিক বুঝতে পারল না ডাক্তার হাসান তাঁর বক্তব্য থেকে সরে এলেন কি না।

সহকারী ইঞ্জিনিয়ার শওকত জামিল খুক করে কেশে বললেন, 'এখানকার পরিবেশটাই এমন যে কিছু না ঘটলেও মনের ওপর একটা চাপ থাকে। ডাক্তার, আপনার কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত এই ভেবে যে তিন মাস পর আপনি দেশে ফিরছেন। আমরা অনেকেই তিন বছরের আগে ফিরতে পারব না।' তারপর পরিবেশটা হালকা করতে চাইলেন। 'আজ যেন কী সিনেমা দেখাবে?'

মালদ্বীপের কেমিস্ট ভদ্রলোক, সাইফুল ইসলাম বললেন, 'কে জানে! দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে বা ওই ধরনের কিছু একটা হবে।'

শিউরে উঠলেন বা শিউরে উঠবার ভান করলেন ডাক্তার হাসান। 'ওদের আমি হাতে-পায়ে ধরেছি—পাপের শাস্তি অনেক হয়েছে, এবার ক্ষমা করে দেন একেকটা ছবি অন্তত বিশবার করে দেখাচ্ছে। উফ!' রানার দিকে ফিরলেন। 'মিউজিক পছন্দ করেন, মিস্টার জয়?'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কাল একবার আমার ওখানে চলে আসুন। অপারেটিং রুম আছে, স্টেট অভ দি আর্ট সাউন্ড সিস্টেম। ভাল কফি আছে, আর আছে লাস্যময়ী সুন্দরীরা।'

'যদিও সুন্দরীদের পাবেন শুধু দেয়ালে,' মুচকি হেসে মন্তব্য করলেন জামিল।

খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। দরজার পাশে পারকাটা ঝুলিয়ে রাখছেন ভীম সিং যাদব। ক্লাব ঘরে নীরবতা নেমে এল। প্রথমে রানা ধারণা করল, পদমর্যাদার প্রভাব। ভুলটা অবশ্য একটু পরেই ভেঙে গেল।

ডাক্তার হাসান জানতে চাইলেন, 'সুইচটা কে অফ করেছিল, মিস্টার যাদব?'

জবাবে কথা না বলে কর্নেল যাদব শুধু অস্বস্তি নিয়ে তাঁর দিকে একবার তাকালেন। নীরবতা গর্ভবতী হয়ে উঠছে, ধীরে ধীরে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। সবাই প্রায় ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছেন কর্নেল কী বলেন শুনবার জন্য। এই খবরের সঙ্গে তাঁদের সবার বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িত।

অবশেষে মুখ খুললেন কর্নেল, 'ওদের ধারণা...ফুয়েল। ফিটাররা সব খুলে ফেলছে।'

রানার পিছন থেকে কেউ একজন জানতে চাইল, 'কতক্ষণ?'

কাঁধ ঝাঁকালেন কমান্ডার যাদব। 'হয়তো সারারাতই। ফিড পাইপ জ্যাম হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। বলা মুশকিল। ওহে, ডাক্তার, ফিটারদের এমন কিছু দিন যাতে ওরা জেগে থাকতে পারে—কেমন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বললেন আরিফ হাসান। তারপর রানার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালেন। 'জানেন তো, এ-ধরনের অন-দ্য-স্পট কন্ডিশনে নতুন মেডিসিন পরীক্ষা করা হয়? ফিটাররা জেগে থাকবে ঠিকই, কিন্তু কেউ কোনদিন জানবে না ওদেরকে আমি কী দিয়েছিলাম।' ক্লিনিক থেকে ওষুধ আনতে চলে গেলেন তিনি।

একটু পরেই স্বাভাবিক আলো ফিরে এল। দেখা গেল সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন কর্নেল যাদব, হাসিমুখে লোকজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। ঠাণ্ডা নরক এই নেতাজি ক্যাম্পের কমান্ডার তিনি, সবার মনোবল দৃঢ় রাখাটাও তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

ডিনারের সময় হয়ে আসছে, তাই দ্বিতীয়বার কর্নেলকে স্মরণ করিয়ে দিল রানা, 'মিস্টার যাদব, আজ রাতেই আমি একবার ডক্টর ফারুকের ল্যাবটা দেখতে চেয়েছিলাম।'

'ওহ্, ইয়েস।' ওকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাব থেকে টানেলে বেরিয়ে এলেন কর্নেল যাদব।

আর্কটিকের সাব জিরো টেমপারেচারে অ্যান্টি ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করছিলেন ডক্টর ওসমান ফারুক, তাই তাঁর জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্যাসিলিটির একেবারে শেষ মাথার একটা টানেলে তৈরি করা হয় ল্যাবটা। এই একটা ল্যাব ছাড়া টানেলটায় আর কিছু নেই। সবাই জানে এটা রেড জোন, অর্থাৎ বিপজ্জনক এলাকা।

শুধু এই টানেলটায় ঢুকবার মুখে ইস্পাতের তৈরি এয়ারটাইট দরজা দেখতে পেল রানা। কোন কারণে জীবাণু বা ভাইরাসের একটা টেস্ট টিউব বা ফাইল যদি

ভেঙেও যায়, দরজাটা সিল করে দিলে টানেলের বাইরে কোনভাবেই তা ছড়াতে পারবে না।

টানেল ধরে খানিক দূর এগোবার পর ইস্পাতের প্রথম ঘরটা দেখতে পেল রানা। এটার ভিতর ঢুকে নিজেদের শরীরে অ্যান্টি-ভাইরাস কী একটা লিকুইড স্প্রে করল ওরা, তারপর ইস্পাতের আলমারি থেকে বের করে দু'জন দু'সেট প্রোটেকটিভ সুট পরে নিল। এবার ল্যাবে ঢোকা যেতে পারে।

ইস্পাতের দেয়াল ঘেরা ছ'টা কামরা নিয়ে ল্যাবটা। তবে ফ্যাসিলিটির বেশিরভাগ লোক জানে এখানে কামরার সংখ্যা চারটে। চারটে ঘরের একটা ডক্টর ফারুকের খাস চেম্বার। ওই চেম্বার থেকে একটা ট্র্যাপডোরের ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর দু'কামরার গোপন ল্যাবে যেতে পারতেন। এই গোপন ল্যাবেই বিশেষ একটা ভাইরাস আর সেই ভাইরাসের অ্যান্টিডোট তৈরির জন্য কাজ করছিলেন ভদ্রলোক।

চার কামরার প্রথমটায় ঢুকে ডক্টর ফারুকের স্নেহভাজন ডক্টর হারুন হাবিবকে পাওয়া গেল। তার প্রোটেকটিভ সুটের মাস্ক আর হুডটা খোলা। গালে হাত দিয়ে একা টেবিলে বসে আছে সে, অপর হাতে ডক্টর ফারুকের একটা বাঁধানো ফটো, দু-চোখে পানি টলমল করছে।

ওদেরকে হঠাৎ দেখে বিব্রত হয়ে পড়ল হাবিব, ঝট্ করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়বার পর ঠিক করতে পারছে না প্রথমে চোখ মুছবে, নাকি ওদেরকে বসতে বলবে।

তাকে সামলে নেওয়ার সুযোগ দিয়ে কর্নেল যাদবকে পথ দেখাতে বলল রানা, পাশের কামরায় চলে এসে ডিপ ফ্রিজে রাখা ভাইরাস ভর্তি টিউব আর ভায়ালগুলো দেখল।

প্রতিটি টিউব আর ভায়ালে লেবেল আঁটা। আঁতকে উঠবার মত বিপজ্জনক একটা জায়গা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ডিপ ফ্রিজটায় পোলিও থেকে শুরু করে গুটি বসন্ত পর্যন্ত সব ধরনের মারাত্মক জীবাণু সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে।

'দুঃখিত।' পাশের কামরা থেকে ভিতরে ঢুকল হাবিব, ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে সে। 'আমি বুঝতে পারিনি আজ রাতেই ল্যাব দেখতে আসবেন আপনি।'

তার পিঠে একটা হাত রাখল রানা। 'এখন বুঝতে পারছি আপনাকে জানিয়ে আসা উচিত ছিল।'

'না, ঠিক আছে...'

কর্নেলের দিকে তাকাল রানা। 'ডক্টর ফারুকের ব্যক্তিগত ল্যাবে আমি একা ঢুকতে চাই...'

'এই যে ট্র্যাপ ডোর,' হাত লম্বা করে এক কোণের ইস্পাতের র‍্যাকটা দেখাল হাবিব। একটা প্রান্ত ধরে চাপ দিতেই ঘুরে গেল সেটা, ইস্পাতের দেয়াল একপাশে সরে গিয়ে পাশের ল্যাবে ঢুকবার পথ তৈরি হলো। 'আলোর সুইচ বাম পাশের দেয়ালে।'

'ধন্যবাদ,' বলে ছোট্ট ট্র্যাপ ডোরের ভিতর মাথা গলিয়ে দিল রানা।

ভিতরটা অন্ধকার। ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা। বামদিকের দেয়াল হাতড়ে সুইচবোর্ড খুঁজে নিয়ে চাপ দিল একটা বোতামে। কোমল আলোয় ভরে উঠল জায়গাটা।

এদিকেও একটা র‍্যাক রয়েছে, প্রথমে সেটাকে ঘুরিয়ে ট্র্যাপ ডোর বন্ধ করল রানা। তারপর চোখ বুলাল চারদিকে।

এটা ছোট একটা ল্যাব। ডিপ ফ্রিজ ছাড়াও দুটো শেলফ, ইস্পাতের টেবিলের উপর একজোড়া মাইক্রোস্কোপ, একটা কমপিউটার ইত্যাদি রয়েছে।

শেলফ দুটোর একটায় প্রচুর কাঁচের টিউব সাজানো। আরেকটায় রয়েছে নানা ধরনের সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট। কাঠের বড় একটা টেবিলের উপর বকযন্ত্র, পাতনযন্ত্র ইত্যাদি নানান রকম যন্ত্র দেখা যাচ্ছে।

প্রথমে রানা গোটা ল্যাবটা ভাল করে সার্চ করল। কোথাও কোন গোপন কুঠরি নেই, নিশ্চিত হওয়ার পর একে একে সবগুলো দেরাজ পরীক্ষা করল।

হতাশই হতে হলো ওকে। ভেবেছিল নোটবুক, ডায়েরি বা নিদেনপক্ষে এক-আধটা খাতা পাবে–হয়তো সাংকেতিক ভাষায় কোথাও কিছু লিখে রেখে গেছেন ডক্টর ফারুক। নাহ্।

শেষ আরেকবার ল্যাবটা ঘুরে-ফিরে দেখবার সময় রানা ভাবল, কেউ যদি ডক্টর ফারুকের উদ্ভাবিত উপকরণ আর ফর্মুলাটা চুরি করে থাকে, সে তাঁর ডায়েরি বা নোটবুক কেন ফেলে রেখে যাবে?

ট্র্যাপ ডোর খুলে পাশের কামরায় ফিরে এল রানা। 'ডক্টর ফারুকের ডায়েরি আর নোটবুক, এ দুটো কার কাছে?' বিশেষ কাউকে লক্ষ্য করে নয়, প্রশ্নটা ঘরের দেয়ালকে যেন করল ও।

হেসে ফেলল হাবিব, তারপর মাথা নাড়ল। 'ভুল করে নিজেই নিজের গোপনীয়তা ফাঁস করে ফেলবেন, এই ভয়ে সার, ডায়েরি বা নোটবুক ব্যবহারই করতেন না।'

'ও, হ্যাঁ–ঠিক, ব্যাপারটা আমিও জানি,' বললেন কমান্ডার।

গ্রিনল্যান্ড আইসক্যাপে এসেও ডক্টর ওসমান ফারুক টপ সিক্রেট কী বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন, কী তার তাৎপর্য বা গুরুত্ব, সব মনে পড়ে যাচ্ছে রানার। মনটা ফিরে গেল ঢাকায়।

বিসিআই হেডকোয়ার্টার। মেজর জেনারেল(অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের চেম্বার। ফোল্ডারটা পড়া শেষ করে মুখ তুলে বসের দিকে তাকাল রানা।

ধীরেসুস্থে পাইপে সুগন্ধী তামাক ভরছেন রাহাত খান। 'ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের একটা কার্গো প্লেন কাল রাতে কিছু সাপ্লাই নিয়ে দিল্লি থেকে কানাডা হয়ে থিউল যাচ্ছে,' রানাকে একবার দেখে নিয়ে বললেন তিনি। 'কানাডার মন্ট্রিয়লে একবার নামবে একটা হোভারক্রাফট ডেলিভারি নেয়ার জন্যে। ওই কার্গো প্লেনে একমাত্র আরোহী থাকবে জয় নামে একজন বিসিআই এজেন্ট।'

'পুরো নাম, সার?'

'বিজয় হাসান।'

'কে সে, সার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তুমি।'

'সার?' সারা শরীরে রোমাঞ্চের একটা শিহরণ অনুভব করল রানা।

'হ্যাঁ।' পাইপটা ধরিয়ে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিলেন রাহাত খান, তাঁর মুখের সামনে নীলচে ধোঁয়ার একটা মেঘ তৈরি হলো। 'এবার তোমাকে সুমেরুতে যেতে হবে, গ্রিনল্যান্ড আইসক্যাপে।'

'সার, ওখানে আমার কাজটা কী হবে?' সাবধানে জানতে চাইল রানা।

'আবিষ্কারটা উদ্ধার করা, আদৌ যদি কিছু আবিষ্কৃত হয়ে থাকে,' ভারী গলা বললেন বিসিআই চিফ। 'তবে যে-কোনও মূল্যে উদ্ধার করবে ফর্মুলাটা—আই রিপিট, যে-কোনও মূল্যে।'

'কী ওটা, সার?' বস্ কি বলবেন চিন্তা করে রানার সবগুলো ইন্দ্রিয় যেন সজাগ হয়ে উঠল। 'ডক্টর ওসমান ফারুক কী নিয়ে গবেষণা করছিলেন?'

চোখ কুঁচকে এক সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন রাহাত খান। তারপর গম্ভীর সুরে বললেন, 'এটা অত্যন্ত গোপনীয় একটা বিষয়। তোমাকে জানাচ্ছি, তবে সাবধান—আর কেউ যেন না জানে।'

'জী, সার।'

'ওটা নতুন এক ধরনের ভাইরাস,' জবাব দিলেন রাহাত খান। 'মারাত্মক, তবে সাদা চামড়ার লোক ছাড়া অন্য কারও জন্যে হুমকি নয়।'

রানা হকচকিয়ে গেল। 'ঠিক বুঝলাম না, সার।'

এরপর রাহাত খান যা বললেন, তার সঙ্গে বেশ খানিকটা কল্পনা যোগ করলে এরকম দাঁড়ায়:

এ-কথা সবাই জানে যে সারা দুনিয়া জুড়ে অন্য যে-কোন বর্ণের মানুষের ওপর নানান কৌশলে প্রভুত্ব ফলাচ্ছে সাদারা। কয়েকশো বছর ধরে চলছে শ্বেতাঙ্গদের এই শোষণ আর অত্যাচার। আগে দেশ দখল করে উপনিবেশ তৈরি করত তারা, এখন সম্পদ লুঠ করবার জন্য হাজার রকম চাপ সৃষ্টি করছে, যে কোনও ছুতায় আগ্রাসন চালাচ্ছে। এর পিছনে আর সব শ্বেতাঙ্গরা দিচ্ছে পূর্ণ সমর্থন।

অশ্বেতাঙ্গ প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু সমস্যাটি এত বড় আর এমন কঠিন যে, এর কোন সমাধান সম্ভব বলে বিশ্বাস হয় না। তবে দুনিয়ার বুকে কিছু অসাধারণ মানুষ সব সময় থাকেন, তাঁরা কোনকিছুকেই অসম্ভব বলে মনে করেন না। ডক্টর ওসমান ফারুক ছিলেন তাঁদেরই একজন।

ডক্টর ফারুক সমস্যাটাকে দুইয়ে-দুইয়ে চার, এরকম সহজ অঙ্ক হিসেবে বিবেচনা করলেন। শ্বেতাঙ্গদের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব করতে হবে? বিশ্ব-রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন চাই? তা হলে এমন একটা কিছু তৈরি করো, সমস্ত নরডিক আর কোকেইশান জাতিগোষ্ঠির নেতারা যেটাকে যমের মত ভয় পাবে।

এমন কোন কথা নেই যে নতুন এই অস্ত্র সাদাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে হবে। সম্ভবত ভয় দেখাতে পারলেই যথেষ্ট, তাতেই তারা সাবধান হয়ে যাবে।

মারাত্মক কোন ভাইরাস হতে পারে সেই অস্ত্র, এরকম একটা আইডিয়া নিয়ে ডক্টর ফারুক ঢাকায় গবেষণা শুরু করলেন। কয়েক বছর পর বিসিআই চিফকে তিনি জানালেন, তিনি যে ভাইরাসটি আবিষ্কার করতে যাচ্ছেন তার নাম হবে ভি-টোয়েনটিনাইন। আরও জানালেন, তাঁর মূল কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বাকি আছে শুধু কিছু ত্রুটি দূর করা। ভি-টোয়েনটিনাইন একজন মানুষের শরীরকে দু'ঘণ্টার মধ্যে পচিয়ে দেবে। মাংস একেবারে খসে খসে পড়বে। এটা বাতাসের মাধ্যমে ছড়াবে। বলাই বাহুল্য যে আক্রান্ত হবে শুধু শ্বেতাঙ্গরা।

থামলেন রাহাত খান।

ভাইরাসটা কী ভয়ঙ্কর, ভাবতে গিয়ে ঠাণ্ডায় যেন চেয়ারে জমে গেছে রানা। কামরায় নীরবতা নেমে আসায় হঠাৎ ঘোরটা কাটল ওর। 'সার,' বলল ও, 'ডক্টর ফারুক যদি সফল হয়ে থাকেন...'

ওকে থামিয়ে দিয়ে রাহাত খান বললেন, 'তাহলে আমরা আশা করতে পারি সারা দুনিয়ায় শক্তির একটা ভারসাম্য তৈরি হবে। এখন যেমন অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে অনুন্নত অন্য বর্ণের জাতিগোষ্ঠীকে ব্ল্যাকমেইল করছে গোরারা, আমাদের হাতে ভি-টোয়েনটিনাইন চলে এলে তখন আর সেটি সম্ভব হবে না।'

'অবিশ্বাস্য একটা অ্যাচিভমেন্ট, সার,' বলল রানা, মনে মনে ভাবছে দুনিয়ার কয়েকশো কোটি মানুষের রক্ষাকবচ উদ্ধার করে আনতে হবে ওকে—আদৌ যদি ওটার অস্তিত্ব থেকে থাকে আর কী। যদি সত্যিই এরকম কিছু থাকে নতুন করে লেখা হবে ইতিহাস।

'ইয়েস, অভকোর্স।'

এরকম একটা অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়ার পর রানার গর্ব বোধ করা উচিত, কিন্তু দায়িত্বের বোঝাটা কাঁধে অসম্ভব ভারী লাগায় ও-সব বোধ হালে পানি পেল না। কাজের প্রসঙ্গ তুলল ও। 'ভাবছি, সার, ওখানকার পরিবেশ আর লোকজন সম্পর্কে যদি কিছু জানতে পারতাম...'

'একশো বাহান্নজনের একটা তালিকা এসে পৌঁছেছে আমাদের হাতে,' বললেন রাহাত খান। 'ইলোরার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ো। তাতে তুমি সার্কের সাতটা দেশের লোকজনকেই পাবে। তাদের সম্পর্কে কিছু তথ্য হয়তো ওই তালিকায় আছে, কিন্তু লোক হিসেবে কে কেমন সেটা তোমাকে ওখানে গিয়েই জানতে হবে।'

'জী, সার।'

'তুমি যে যাচ্ছ, সে খবর খারাপ আবহাওয়ার কারণে আর্কটিকের নেতাজি ক্যাম্পে পাঠানো সম্ভব হয়নি, শুধু বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পকে জানানো হয়েছে। ওটা আমাদের সাপ্লাই ক্যাম্প। আরেকটা কথা, রানা।'

'ইয়েস, সার।'

'ওদেরকে মোটামুটি ধারণা দেয়া হয়েছে—তোমার কাভারের প্রয়োজনেই—প্রায় একজন নবিশ লোক তুমি। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি, ছা পোষা বাঙালী, এই প্রথম মেরুতে যাচ্ছ।'

'জী, সার।'

পাইপটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে কি যেন চিন্তা করলেন রাহাত খান, তারপর বললেন, 'একটা ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে তোমাকে।'

'ইয়েস, সার?' অকস্মাৎ রানা আরও মনোযোগী।

সময় নিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন বিসিআই চিফ। পাঁচ বছর আগে ডক্টর ফারুকের পিছনে লোক লেগে গিয়েছিল, এ তো রানা জানেই। এ-কথা মনে করবার কারণ নেই যে এতদিন চুপ করে বসে আছে তারা।

প্রাসঙ্গিক আরেকটা দিক হলো, সার্ক ওয়েদার অ্যান্ড রিসার্চ ফ্যাসিলিটির পাঁচ-সাতশো মাইলের মধ্যে আমেরিকা-রাশিয়া-ব্রিটেন-ফ্রান্স সহ শ্বেতাঙ্গপ্রধান অন্তত দশটা দেশের রিসার্চ স্টেশন আছে। তাদের কমিউনিকেশন সিস্টেম অত্যাধুনিক, কাজেই ধরে নিতে হবে আইসক্যাপ থেকে যে মেসেজটা দিল্লি হয়ে ঢাকায় এসেছে সেটা মনিটর করেছে তারা। ভাষাটা সাংকেতিক হলেও, যথেষ্ট সময় পেলে কোড ভাঙা কোন সমস্যাই নয়। 'কাজেই,' সবশেষে বস্ বললেন, 'সাবধান থাকতে হবে তোমাকে—হুট করে চলে আসতে পারে তারা।'

'জী, সার, বুঝেছি।' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'দ্যাটস অল, আই থিঙ্ক। তবে তোমার কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারো।'

'জী, সার—একটা। ডক্টর ওসমান ফারুকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ভদ্রলোক সম্পর্কে। তাঁর সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স...'

রাহাত খানের মুখে ক্ষীণ হাসি, এক কি দু'সেকেন্ডের জন্য দেখা গেল। 'ডক্টর হারুন হাবিব? ডক্টর ফারুককে সে পরম গুরুর মত শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। ভদ্রলোকও ভারি স্নেহ করতেন হাবিবকে। আমরা পাঁচজনের একটা তালিকা দিয়ে যে-কোন একজনকে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে বেছে নিতে বলেছিলাম। সবাইকে বাদ দিয়ে হাবিবকে পছন্দ করেন তিনি। মাতৃভূমি সম্পর্কে হাবিবের কী রকম আবেগ, আমরা জানতাম, তাই খুশিই হই।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

ডেস্কের একটা ফাইল টেনে নিজের সামনে নিয়ে এলেন বিসিআই চিফ।

'আসি, সার,' বলে চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা।

ডিনারে বসে রানা জানতে পারল, অন্যান্য দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের নাম অনুসারে আরও ক্যাম্প ছিল, কিন্তু প্রকৃতি বিরূপ হয়ে ওঠায় সেগুলো পরিত্যাগ করতে হয়েছে।

একবার ওদের ক্যাম্পকে নিয়ে বরফের বিশ বর্গমাইল মাঠটা একদিকে ভেসে যাচ্ছিল। আরেকবার ওদের ক্যাম্প থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে একটা ফাটল তৈরি হয়, প্রতিদিন একগজ করে চওড়া হচ্ছিল সেটা।

ডিনার টেবিলে রানার পাশে রত্নে উপলচন্দ্র নামে এক তরুণ কমিউনিকেশন এক্সপার্ট বসেছে। সুদর্শন, সুবেশী, কিন্তু চোখে পড়বার মত শোকাচ্ছন্ন মনে হলো তাকে।

পরে রানা জানতে পারল, ম্রিয়মান হয়ে থাকবার যথেষ্ট কারণ আছে তার—তিন হপ্তা আগে সারফেসে হারিয়ে যাওয়া তরুণ রেডিও অপারেটরের

চাচাতো ভাই সে।

ভদ্রতা বজায় রেখে যতটা পারা যায় চেষ্টা করে দেখল, কিন্তু উপলচন্দ্রের মুখ খোলানো গেল না। তা ছাড়া, ইতিমধ্যে নিজেও বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রানা।

সাগরের পিঠ থেকে সাত হাজার ফুট উঁচু আইসক্যাপে ক্লান্তি খুব সহজেই সবাইকে কাবু করে ফেলে। বোধহয় সেটা মনে রেখেই ক্লাবঘরে তিরিশ পদের হুইস্কি রাখা হয়েছে।

কমান্ডারের নির্দেশে একজন লেফটেন্যান্ট রানাকে ওর নিজের বেডরুমে পৌঁছে দিয়ে গেল। বেডরুমে আসবাব বলতে গদি মোড়া দুটো চেয়ার, একটা ডিভান, একটা কট।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল রানা। অন্ধকারে চোখ মেলে ভাবছে, ঘটনাচক্র ওকে না-জানি কী পরিবেশ আর কে-জানে-কেমন লোকজনের মাঝখানে এনে ফেলেছে!

ক্যাম্প নেতাজিকে নিয়ে সবাই তারা গর্বিত, অথচ এটা তাদের উপর ভারী সীসার মত চেপে বসে আছে। সহনীয় একটা পরিবেশ তৈরির জন্য এমন এক জায়গায় অমানুষিক পরিশ্রম করছে সবাই, প্রকৃতির যেখানে রয়েছে জীবনকে সহ্য না করবার প্রচণ্ড জিদ।

মেরে-ধরে প্রকৃতিকে পিছু হটতে বাধ্য করা হয়েছে ঠিকই, তবে খুব বেশি দূরে নয়।

বাইরেই অপেক্ষা করছে জুলুমবাজটা–ডানে, বামে, সামনে, পিছনে, উপরে, নীচে–দাঁতে দাঁত পিষছে, আবার কখনও শিস দিচ্ছে, অপেক্ষায় আছে সুযোগের।

রানার উপর সিলিং, তার উপরে টানেলের ছাদ, তার উপরে চল্লিশ নট বেগে ঝড় আর শূন্যাঙ্কের নীচে চল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা, এবং চারপাশে দশ লাখ বা আরও বেশি বর্গমাইল জুড়ে শুধু তুষার আর তুষার।

তবে এই গুহার ভিতরেও হিংস্র শত্রু আছে। সে-ও প্রকৃতিরই সন্তান। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনের সঙ্গেই তো পরিচয় হয়েছে ওর, হয়তো মূল চরিত্র এই কজনই।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এদের মধ্যে কে? আবার এমনও হতে পারে, এখনও হয়তো তার সঙ্গে ওর পরিচয়ই হয়নি।

পরদিন সকালে দম বন্ধ করা ভ্যাপসা লাগল কামরাটাকে, শ্বাস নিলেই ঘামের গন্ধ ঢুকছে নাকে। খুব বেশি গরম, বাতাসের খুব বেশি অভাব; শূন্য চারটে দেয়ালে দৃষ্টিকে বৈচিত্র্য দেয় শুধু দরজার ফ্রেমটা।

কাপড় পরল রানা, শাওয়ার হাট পর্যন্ত হেঁটে এসে খুলে ফেলল সব। গোসল করে দাড়ি কামাল, বস্তার মত ভারী বোঝাগুলো পরতে হলো আবার।

কোথাও না থেমে সোজা মেস হলে চলে এল, খুলে রাখল দুই প্রস্থ গরম পোশাক।

ইঞ্জিনিয়ার জাভেদ হাশমিকে দেখল রানা। জেদি একটা ভাব নিয়ে স্টেক আর ডিম ভর্তি প্লেটে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

প্ল্যাস্টিকের একটা ট্রে হাতে নিয়ে লম্বা টেবিলটার সামনে দিয়ে হাঁটছে রানা,

খাবারের ডিশ থেকে নিজের পছন্দমত আইটেম বেছে নিচ্ছে—যবের তৈরি রুটি, দুধ, চিকেন, ডিম, টম্যাটো, সুজির হালুয়া, ফ্রুট জুস আর কফি।

ফিরে এসে পাকিস্তানি হাশমির সামনের চেয়ারটায় বসল রানা। সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলেন ভদ্রলোক, 'দেখেই বোঝা যায়, টম্যাটোগুলোর বয়স হয়েছে

'হাজার মাইল দূর থেকে আনা,' বলল রানা। 'প্লেটে পাচ্ছি, এই তো বেশি।'

'দেখুন, ব্রাদার, আজ আমার মেজাজ এত খারাপ যে জানলেও স্বীকার করব না যে, আধুনিক টেকনোলজি স্রেফ জাদু দেখাচ্ছে

'বুঝেছি—রিয়্যাক্টর সমস্যা করছে?'

'ওটাকে আপনি তাই বলেন? কী জানি, আমাকে হয়তো বোকা বানানো হচ্ছে। আমার তো ওটাকে বাতিল লোহা-লক্কড়ের স্তূপ ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না।'

অপেক্ষা করছে রানা।

ওর দিকে একবার কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন হাশমি। 'আপনার হয়তো ধারণা, পরিচ্ছন্ন একটা পরিবেশে কোন লোক তার বুক পকেটে পয়সা-কড়ি রাখবে না। তা হলে শুনুন কী ঘটেছে।'

'কী।'

'ইউরেনিয়াম রড রিনিউ করলাম আমরা; পরিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন পানি ভরলাম। একটু ছলকায়নি, কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খায়নি, কোথাও কোন সমস্যা নেই। স্টার্ট দেয়ার জন্যে তৈরি আমরা। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে "গো ক্রিটিকাল" পর্যায়, অর্থাৎ নিউক্লিয়ার চেইন রিয়্যাকশন শুরু হতে যাচ্ছে. ঠিক আছে? সুইচ অন করার আগে সব ঠিক আছে কিনা শেষবারের মত দেখে নিচ্ছি। বলতে পারবেন কি দেখলাম?'

মাথা নাড়ল রানা।

'বিশ্বাস করুন, তিনটে কয়েন—একটা পাকিস্তানি সিকি, একটা ভারতীয় আধুলি আর একটা বাংলাদেশী টাকা। কেটলিতে পড়ে রয়েছে। উদ্দেশ্যটা কী? লোকজন চায় খুচরো পয়সার লোভে পানিতে ডাইভ দেব আমরা?'

'এখন তা হলে কী হবে?'

ফর্কটা মুখে পুরলেন হাশমি, তাতে আধখানা সেদ্ধ ডিম। বার তিনেক ওটা চিবিয়ে মগ থেকে দু'ঢোক কফি খেলেন। 'হবে আবার কী, ঘুমাব। তারপর আবার ওই শালার জিনিসটাকে খুলে ফেলব। সারারাত কাজ করতে হবে, হয়তো কালও সারাটা দিন। যদি কোন গর্দভ তার ছুরি বা ফর্ক ফেলে না দেয়, আবার ক্রিটিকাল পর্যায়ে যাবার কথা ভাবব।'

'দুর্ভাগ্য।'

ফর্কটা নামিয়ে রাখলেন হাশমি। 'না,' বললেন তিনি। 'দুর্ভাগ্য আমি মেনে নিতে রাজি আছি। ভাই রে, ওদের সাইকোলজিকাল সমস্যা সম্পর্কে সবই আমি জানি। অবশ্যই ক্লান্ত ওরা। মনোযোগ একেবারেই কমে গেছে। কিন্তু এ তো অবহেলা—বিপজ্জনক দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। রিয়্যাক্টর ক্রিটিকাল পর্যায়ে থাকার সময় মেটালিক কনটামিনেশন ঘটলে সত্যিকার সমস্যার সৃষ্টি হবে

এই সময় ডাক্তার আরিফ হাসান ওদের সঙ্গে যোগ দিলেন, হাতের মগে ধূমায়িত কফি।

হাশমি তাঁকে বললেন, 'আপনি ডাক্তার দিনে দিনে রোগা আর ফ্যাকাসে হবেন, তারপর পটল তুলবেন। কোথায় গেল আপনার দুহাজার ক্যালরি?'

ডাক্তার হাসান বললেন, 'আমি আপনার মত নই। সারাদিন শুয়ে থেকে মোটা হওয়াই আমার কাজ। মাঝে মাঝে ইচ্ছেও হয়-আইসক্রিম আর পান্তাভাত সরাসরি কোমরের চারপাশে অ্যাপ্লাই করি। ভাল কথা, স্টিম ইঞ্জিনের খবর কী?'

হাশমি কর্কশ একটা আওয়াজ করলেন।

'ও, বুঝেছি। আর এক নম্বর ডিজেল?'

'কে জানে!' মেস হলের চারদিকে চোখ বুলালেন হাশমি, তারপর ফর্ক তাক করে দেখালেন। 'ওদিকে তাকান। কাপড়ে তেল লেগে রয়েছে, ওরা ডিজেল ফিটার। বোধহয় এইমাত্র কাজটা শেষ করেছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকাল রানা। একটা টেবিলে বসে আছে লোকগুলো, প্রায় চুপচাপই বলা যায়, চোখে-মুখে নিরানন্দ ভাব। 'মনে হয় না কাজ শেষ হয়েছে,' বলল ও।

'সিস্টেমের অর্ধেকটাই গায়েব,' ভারী গলায় বললেন ডাক্তার হাসান।

'অর্ধেক?' জিজ্ঞেস করল রানা।

জবাবটা হাশমি দিচ্ছেন। 'কী আছে আমাদের? একটা রিয়্যাক্টর, তিনটে জেনারেটর। ধরুন-বেল্ট আর প্যান্ট ধরে রাখার জন্যে একজোড়া হাত, ঠিক আছে? তো এখন বেল্ট ছিঁড়ে গেছে। বাকি আছে শুধু দুটো ডিজেল জেনারেটর, ফলে দু'হাত দিয়ে ধরে এখনও আমরা আমাদের প্যান্ট উঁচু রেখেছি।'

'কাজেই যান, স্টেক খেয়ে কাজে লেগে পড়ুন,' বললেন ডাক্তার।

একটু পর তাঁরা দু'জনেই চলে গেলেন। বাকি সবাইকে আর কী দোষ দেবে, এখানে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে রানাও নিজের মনের উপর আশ্চর্য একটা চাপ অনুভব করছে। পকেট থেকে হাশমির দেওয়া প্যাকেটটা বের করে সিগারেট ধরাল ও।

'তো বাঙ্গালী বাবু, অ্যায়সা কিয়া হুয়া কে আপকা মুড অফ?' মেস হলে ঢুকে রানাকে দেখে জানতে চাইলেন কমান্ডার যাদব। একটা ট্রেতে খাবারের স্তূপ বানিয়ে রানার সামনে এসে বসলেন।

'আপনিই বলুন কী হয়নি? তিন হপ্তা আগে শুরু হয়েছে, এখনও চলছে-বলা যায় অ্যাক্সিডেন্টের একটা সিরিজ।'

'আপনার কথা মিথ্যে নয়। তবে এ-সব নতুন ঘটছে, তা নয়। ডিমে আজ বড় স্বাদ।'

প্রসঙ্গ পাল্টে রানা জানতে চাইল, 'হোভারক্রাফটের খবর কী?' পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা রাখতে চাইছে ও। ভাল না লাগায় দু'একটা টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা গুঁজে রাখল।

'চলতি-কা-নাম-গাড়ি ওটাকে নিয়ে আজই রওনা হচ্ছে। আশা করছি দিন দুয়েকের মধ্যে পৌঁছে যাবে।'

'আর ডিজেলের খবর?'

'ধন্যবাদ,' নীরস গলায় বললেন কমান্ডার। 'আমার কাজে কারও তদারকির দরকার নেই, মিস্টার জয়। আপনি পিং-পং খেলেন?'

'মাঝে-মধ্যে।'

'গুড, আমরা তাহলে আপনার জন্যে স্বাস্থ্যসম্মত দৌড়-ঝাঁপের ব্যবস্থা করতে পারব। ব্রেকফাস্টের পরপরই, ঠিক আছে?'

'না, ঠিক নেই,' বলল রানা। 'মিস্টার যাদব, আপনি খুব ভাল করেই জানেন এখানে আমি কেন এসেছি। কাজ শুরু করার আগে আমাকে জানতে হবে এখানকার পরিস্থিতিটা এই মুহূর্তে ঠিক কেমন। আমার এই আইডিয়ার সঙ্গে আপনি দ্বিমত পোষণ করেন?'

অপমান বোধ করলেন, নাকি শুধু বিব্রত, বলা কঠিন—তবে, কর্নেল ভীম সিং যাদবের চোখ-মুখ আরও কালো হয়ে উঠল। দীর্ঘ এক মুহূর্ত ইতস্তত করবার পর তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে আমি একমত।'

'দেখা যাক আর কী কী বিষয়ে আমরা একমত হতে পারি,' বলল রানা। 'প্রতিটি হাটের একটা করে চাবি চাই আমার, যাতে বিনা নোটিশে আর গোপনে যখন খুশি যে-কোন ভদ্রলোকের হাটে তল্লাশি চালাতে পারি।'

'হুঁ। আর?'

'আপনার কাছে নিশ্চয়ই প্রত্যেকের নামে একটা করে ফাইল আছে, ফ্যামিলি হিস্ট্রি সহ? ওগুলোয় আমি একবার চোখ বুলাতে চাই।'

'আর কী?'

'দেখবেন, সঙ্গে যেন অবশ্যই আপনার ফাইলটাও থাকে।'

'হুঁ।'

'আপাতত এগুলোই।'

'বহুত খুব।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার যাদব।'

'ইউ আর ওয়েলকাম, সার!' হেসে উঠে পরিবেশটা হালকা করে নিলেন কর্নেল। 'আশা করি আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না, মিস্টার জয়। আমি নিজে কাজ পছন্দ করি, তাই কাজের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা রাখি—শুধু চাই না ক্যাম্পে কোন রকম আতঙ্ক ছড়াক।'

'তারমানে ডিজেলের খবর ভাল নয়, তাই না?'

'ফুয়েল'স্ কনটামিনেটেড। ফিড লাইন আর কমবাশ্চন চেম্বারে কিছু একটা আটকেছে বা জমেছে।'

রানা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কী ধরনের দূষণ, এই সময় টেবিলের পাশে একজন সৈনিক এসে দাঁড়াল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে সে, ছুটে আসায় লালচে হয়ে আছে মুখ। ঠকাস করে স্যালুট করল। 'কর্নেল, সার!'

চার

'কী ব্যাপার?' কমান্ডার যাদব শান্তকণ্ঠে জানতে চাইলেন।

'সার, ওই যে, যে বুলডোজারটা দোরগোড়া পরিষ্কার রাখে, ওইটা!'

'হ্যাঁ?' কোন মেসেজ না পেয়ে রাগ হলেও, অনেক কষ্টে সেটা চেপে রাখলেন কমান্ডার।

'ছাপ, সার…ওরা খুঁজে পেয়েছে, সার! রাতে জমা তুষারের ওপর। বড় বড় ছাপ, সার! দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো বোধহয়…' ইতস্তত করল সে, তারপর সাহস সঞ্চয় করে আবার বলল, 'এমন হতে পারে, সার, ক্যাম্পে হয়তো একটা পোলার বিয়ার ঢুকে পড়েছে!' নার্ভাস চোখে কমান্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

'পোলার বিয়ার?' নিজের প্লেটের উপর চোখ রেখে নরম সুরে জানতে চাইলেন কর্নেল যাদব। 'ঠিক জানো?'

'পায়ের ছাপগুলো, সার। আকারে খুব বড়!'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকালেন কমান্ডার। বললেন, এ-ব্যাপারে তুমি বাজি ধরতে রাজি?'

সিপাই দ্রুত একটা ঢোক গিলল। 'না, সার।'

'কারণ এর সঙ্গে যদি টাকার ব্যাপার থাকে,' বললেন কমান্ডার, 'দেখা যাবে নিতম্ব না খসে পড়া পর্যন্ত কোদাল দিয়ে তুষার সরাচ্ছ তুমি।'

'জী, সার। তবে কথাটা সত্যি, কর্নেল। ওই ছাপগুলো সোজা টানেল এন্ট্রান্স দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন কমান্ডার, আঙুল দিয়ে ঠেলে ট্রে-টা সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'বললেই হলো পোলার বিয়ার!' চেয়ার ছেড়ে থপ্-থপ্ করে সোজা হেঁটে দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, শেলফ থেকে তুলে নিলেন একটা মাইক্রোফোন। এক মুহূর্ত পর তাঁর গমগমে কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল লাউডস্পিকার থেকে। 'ঠিক আছে, সবাই শুনুন। আমি কমান্ডার বলছি। এইমাত্র আমাকে রিপোর্ট করা হয়েছে, আমাদের গুহায় একটা পোলার বিয়ার ঢুকে পড়েছে।'

কয়েকটা টেবিল থেকে চাপা হাসির শব্দ ভেসে এল। দৃষ্টিতে মারমুখো ভাব, চারদিকে চোখ বুলালেন কর্নেল। 'এটা সত্যিকারের একটা ভালুক, গায়ে সাদা ফার কোট। কাজেই হাটে যারা আছেন তারা ভুলেও বাইরে বেরুবেন না। আর যারা বাইরে আছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাটে ফিরে যান।

'কারণ, ভালুকটা সত্যি যদি এখানে ঢুকে থাকে, সে অবশ্যই ক্ষুধার্ত। তা না হলে কমকরেও একশো মাইল পাড়ি দিয়ে এখানে কেন আসবে সে? মনে রাখবেন, খাবার হিসেবে আপনারা তার কাছে খুবই সুস্বাদু।

'ভেহিকেল বে থেকে আমি একটা পোলক্যাট চাই. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেস হলের বাইরে দেখতে চাই ওটাকে। পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করুন।'

মাইক রেখে দিয়ে টেবিলে ফিরে এলেন কমান্ডার, গায়ে পারকা চড়াচ্ছেন।
রানা জিজ্ঞেস করল, 'আসলে কী করবেন এখন আপনি?'
'দেখতে চাইলে আমার সঙ্গে আসতে হবে আপনাকে।'
মেস হলের দরজায় অপেক্ষা করছে ওরা, বাইরে থেকে ভেসে এল পোলক্যাট ইঞ্জিনের গর্জন। দরজা খুলে যেতে দ্রুত পায়ে চৌকাঠ পার হয়ে ধাতব কবাটের ভিতর নিরাপদ আশ্রয়ে চলে এল ওরা। কর্নেল বললেন, 'ভালুক এখানে আসতেই পারে না, কারণ এলে প্রথমেই মেস হলে ঢুকত।'
'এর আগে এরকম কিছু ঘটেছে?'
মাথা নাড়লেন কমান্ডার। 'একবার ওরা পায়ের ছাপ দেখেছিল, কর্নেল ভেঙ্কটরামের আমলে–আমার আগের কমান্ডার। তবে কেউ কখনও কোন ভালুক আসলে দেখেনি। বলে রাখি, আমাদের কিন্তু পোলার বিয়ার সামলানোর জন্যে প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট নেই।' ড্রাইভারের দিকে ফিরে কমান্ড হাটে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। 'মানে ভালুকটা যদি সত্যি এখানে থাকে, বিপদের কথাই। আমার অফিসের সামনে থাকলে ভেতরে ঢোকার আর কোন পথ নেই।'
'কী বলেন পথ নেই!' রীতিমত বিরক্তই রানা। 'আপনারা আর্মি না? গুলি করে ফেলে দেবেন।'
মাথা নাড়লেন কর্নেল। 'আমরা ফাইটিং আর্মি নই। এখানে আমরা ডেনিশ এলাকায় রয়েছি; তাদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি আছে, বেশ কিছু বিধি-নিষেধ কঠোর ভাবে মেনে চলতে হয়। আগুন উদ্গীরণ করে, এরকম একটাই লাঠি আছে আমাদের, এবং সেটা রয়েছে আমার অফিসের দেয়ালে।'
'অবাক করলেন দেখছি,' মন্তব্য করল রানা। 'দেড়শোর ওপর মানুষ, অথচ বলতে চাইছেন আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই?'
'প্রয়োজন না হলে কেন থাকবে? আইসক্যাপে প্রকৃতি ছাড়া আর তো কোন শত্রু নেই আমাদের। তা ছাড়া, চুক্তিতে বলা আছে তেমন পরিস্থিতি যদি দেখা দেয়ই, খবর দিলেই ডেনিশ পুলিশ বা সেনাবাহিনী সাহায্য করতে ছুটে আসবে।'
ড্রাইভার ঘাড় ফেরাল। 'ট্রেঞ্চে ঢোকার মুখটা ক্যাটের জন্যে খুব সরু হয়ে যায়, সার।'
'কায়দা মত দাঁড় করাও,' নির্দেশ দিলেন কর্নেল, 'আলোটা যাতে ট্রেঞ্চ বরাবর পড়ে। মেইন বিম, ঠিক হ্যায়? আগার রহে তো সালেকো আন্ধা কর দো।'
'ইয়েস, সার!' ট্রাক লিভার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল ড্রাইভার, মেইন স্ট্রিটের উপর ছোট ভেহিকেলটাকে সুবিধে মত একটা জায়গায় দাঁড় করাচ্ছে। 'কিছুই তো দেখছি না, সার।'
'রাইট।' দরজার হাতলে হাত রাখলেন কর্নেল। 'এখানে থাকলে, অন্তত তার বেরুবার পথ বন্ধ করে দিয়েছি আমরা।'
ড্রাইভার বলল, 'সার, আপনি চান আমি যাই?'
'যাতে আমার টেবিলের লেখাগুলো পড়তে পার?' জিজ্ঞেস করলেন যাদব 'হাজার বছরেও নয়।'
হঠাৎ করেই ক্যাব থেকে নেমে গেলেন তিনি, পনেরো ফুট দূরত্ব পার হলে

এক ছুটে, কমান্ড হাটের সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত চাবি বাছাই করতে গলদঘর্ম হলেন, তারপর ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিলেন দরজা।

একটু পরেই আবার দেখা গেল প্রকাণ্ডদেহী ভদ্রলোককে, এক ছুটে ফিরে এলেন পোলক্যাটের কাছে। সিটে বসে রাইফেলটার গায়ে এমন ভঙ্গিতে হাত বুলালেন, যেন একটা বিড়ালছানাকে আদর করছেন। মান্ধাতা আমলের অস্ত্র ওটা, স্টকটা কাঠের–একটা থ্রি-নট-থ্রি। 'ব্যস, ডেনিশ সরকার শুধু এটা রাখার অনুমতি দিয়েছে। এবার চলো, হে, দোরগোড়াটা দেখে আসি।'

টানেলের প্রবেশপথে বড় আকৃতির একটা বুলডোজার, ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ট্র্যাক, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ করছে আর থরথর করে কাঁপছে। ওদেরকে বেরুতে দেখে অল্পবয়সী একজন শ্রীলঙ্কান ড্রাইভার ক্যাব থেকে নেমে হাত তুলে দেখাল।

ছ'টা গভীর ছাপ, এরইমধ্যে আংশিক ভরাট হয়ে গেছে। ছাপগুলো পড়েছে ছাদের সরাসরি নীচে কাল রাতে বাতাসের উড়িয়ে আনা তুষারের উপর। ঝুলে থাকা ছাদের সামনে, তুষার যেখানে আরও বেশি, কোন ছাপ দেখা যাচ্ছে না। টানেলের মেঝেতে, তুষার যেখানে অনেক আগেই দলিতমথিত হয়ে বরফের টুকরোয় পরিণত হয়েছে, সেখানেও কোন ছাপ নেই।

'এটা কী ভালুক বলে মনে হচ্ছে, সার?' কর্নেলকে জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

'আমি ছাই কী করে জানব? আমি কি এস্কিমো ট্র্যাকার? তবে ওই ছাপ যারই হোক, তার পা সাংঘাতিক বড়। অর্থাৎ ভালুক মহাশয় আমাদের মধ্যে আছেন ধরে নিয়ে যা করার করতে হবে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে ফেলে আসা মেইন স্ট্রিটের দিকে তাকালেন কমান্ডার।

'এমন হতে পারে,' বলল রানা, 'এদিক দিয়ে ঢুকেছে ভালুকটা, তারপর সবটুকু টানেল পার হয়ে শেষ মাথা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।'

বুলডোজার ড্রাইভারের দিকে ফিরলেন কর্নেল। 'তুমি কি ইতিমধ্যে ওদিকের ধাপ পরিষ্কার করেছ?'

'না, সার।'

'ভেরি গুড। এখন আমরা শেষ মাথায় যাব। যদি দেখি পায়ের দাগ ওদিক থেকে বেরিয়ে গেছে...তো কিয়া বাত! কিন্তু তা যদি না দেখি, এখানে ফিরে আসব আমরা, আসার পথে ট্রেঞ্চগুলো চেক করব।'

'সার, আমাকে আপনি কী করতে বলেন?'

'বুলডোজারে উঠে পড়ো,' বললেন কর্নেল, 'আর এই জায়গা ছেড়ে নড়ো না। ওটাকে আমরা যদি ধাওয়া করে এদিকে আনতে পারি, বুলডোজারের সাহায্যে ভয় দেখাতে পারবে তুমি। তবে আবার ভয় দেখিয়ে একেবারে মেরে ফেলার চেষ্টা কোরো না, পোলার বিয়ার বিরল প্রজাতিতে পরিণত হতে যাচ্ছে।'

পোলক্যাটে উঠে পড়ল ওরা, মেইন স্ট্রিট ধরে সগর্জনে চলে এল আরেক র‍্যাম্প পরীক্ষা করতে। নতুন তুষারে ঢাকা সাবলীল সাদা ঢালে কোন ছাপ নেই। কর্নেল আর রানা দৃষ্টি বিনিময় করল। পায়ের ছাপ ক্যাম্প নেতাজিতে ঢুকেছে, অথচ কোন ছাপ বেরিয়ে যায়নি; ওগুলো যদি কোন শ্বেতভালুকের হয়ে থাকে, এখনও ওদের সঙ্গেই আছে সেটা।

শুরু হলো তল্লাশি।

সব মিলিয়ে সতেরোটা ট্রেঞ্চ পরীক্ষা করতে হবে, বেশিরভাগ একই ধাঁচে তৈরি করা।

ওগুলো আসলে প্রথমে পিটারস্ স্নো-প্লাউ দিয়ে কাটা হয়েছে–ওটা সুইস মেশিন, এক ধরনের চিমনির ভিতর দিয়ে তুষার বের করে একপাশে স্তূপ করে রাখে। একই জায়গায় বারবার আসা-যাওয়া করবার সময় আরও গভীর করে কাটে প্লাউটা, সেই অনুপাতে উঁচু হতে থাকে তুষারের স্তূপ।

ত্রিশ ফুট গভীর হলে ট্রেঞ্চগুলোর মাথায় করোগেটেড স্টিল দিয়ে ছাদ বানানো হয়েছে, সেই ছাদের উপর স্বভাবতই আবার তুষার জমেছে।

মেইন স্ট্রিটের যে জায়গায় প্রতিটি ট্রেঞ্চ সংযুক্ত, সেখানে প্রবেশপথ সরু করবার জন্য বরফের একটা পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে। কিছু কিছু দেয়ালের গায়ে দরজা আছে, বাকিগুলো স্রেফ খিলান আকৃতির ফাঁক–কোন্ ট্রেঞ্চ কী কাজে ব্যবহার করা হবে তার উপর নির্ভর করে।

স্টোরেজ টানেলের কমবেশি প্রায় সবগুলোতেই তালা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যে-সব টানেলে লিভিং কোয়ার্টার, ওয়েদার রিসার্চ ল্যাব, রিক্রিয়েশন ফ্যাসিলিটি আছে সেগুলো খোলাই থাকে।

বেশিরভাগ ট্রেঞ্চের শেষ প্রান্তে একটা করে ইস্কেপ রুট আছে, অগ্নিকাণ্ড বা অন্য কোন ধরনের বিপর্যয় ঘটলে পালানোর জন্য–ধাপ বেয়ে উপরে উঠে এসে হ্যাচ গলে আইসক্যাপে বেরুতে হবে। আদৌ সেটাকে যদি কেউ পালিয়ে বাঁচা বলতে চায় আর কী।

ট্রেঞ্চের যে-সব দরজায় তালা দেওয়া রয়েছে সেগুলো খুলবার ঝামেলায় গেলেন না কর্নেল। প্রবেশপথ খোলা পেলে কমান্ড টানেলে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করলেম–প্রথমে পোলক্যাটের আলোয় যতদূর দেখা যায় দেখে নিয়ে, বরফ পাঁচিলের বাঁক পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে, সাবধানে উঁকি দিলেন। তারপর ভিতরে ঢুকলেন।

এক কী দু'মিনিট পর ফিরে এসে মাথা নাড়লেন কমান্ডার, হাত ইশারায় ড্রাইভারকে এগুতে বললেন পরবর্তী ট্রেঞ্চের দিকে।

ট্রেঞ্চগুলোয় ভদ্রলোক যতটা সময় কাটাচ্ছেন, এমনকী পোলক্যাটের ভিতর সুরক্ষিত, উষ্ণ আর নিরাপদ অবস্থান থেকেও রানার তা খুব দীর্ঘ মনে হলো।

কর্নেলের নিজের কেমন লাগছে, এত দূর থেকে তার আভাস পাওয়া সম্ভব নয়। তবে এটা যে একটা অসমসাহসিক কাজ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, তাঁর কাছে অস্ত্র একটা আছে বটে, কিন্তু পোলার বিয়ার সাদা, আর টানেলের দেয়ালগুলোও তাই–তার উপর ছায়া আছে ওখানে, আছে চোখ-ধাঁধান প্রতিফলন আর নানা ধরনের স্তূপের আড়ালে লুকানোর জায়গা। শ্বেতভালুকের রিফ্লেক্সও তাঁর তুলনায় দ্রুতগতি হবে।

মেইন স্ট্রিটের পুরোটা দৈর্ঘ্য ধরে এভাবে তল্লাশি চালিয়েও কিছু দেখতে পেলেন না কর্নেল। প্রতিবার ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি মাথা নাড়লেই রানা শুনতে পেল ড্রাইভার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে।

রানা লক্ষ করল, একটা টানেলের দিকে কর্নেল যাদব গেলেনই না। সেটায় তালা দেয়া, ভিতরে রয়েছে ছ'টা লাশ।

অবশেষে যেখান থেকে শুরু করেছিল, সেই বুলডোজারের পাশে আবার ফিরে এল ওরা। আর মাত্র একটা টানেল তল্লাশি করা বাকি।

র‍্যাম্পের তলা থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে সেটা, কাঠের দরজায় স্টেনসিল পেইন্টে লেখা–'রিজার্ভ ফুয়েল স্টোর'। কর্নেলকে সেদিকে একবার তাকাতে দেখল রানা, এক মুহূর্ত পর আরেকবার; অবশেষে ভারী শরীরটা নিয়ে থপ্-থপ্ করে এগিয়ে এসে দরজাটা ঠেলে খুলে ফেললেন।

খোলা দরজায় উঁকি দিয়ে ভিতরে তাকালেন কর্নেল, তারপর পিছু হটে ঘুরলেন, হাতছানি দিয়ে ডাকছেন রানাকে। পোলক্যাট থেকে নেমে তাঁর পাশে চলে এল রানা।

কর্নেল যাদব বললেন, 'দেখে বলুন, এর মানে কী?'

দেখল রানা, তারপর ডিজেলের তীব্র গন্ধ ঠেলে চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল। এটা ছোট ট্রেঞ্চগুলোর একটা, লম্বায় ত্রিশ গজের বেশি নয়, তৈরি করা হয়েছে দুই স্তরে।

বড় আকৃতির একজোড়া নিউপ্রিন-প্ল্যাস্টিক ফুয়েল ট্যাংককে জায়গা দেওয়ার জন্য টানেলটার দ্বিতীয় স্তরের, অর্থাৎ শেষ প্রান্তের মেঝে দুফুট বেশি গভীর করে কাটা হয়েছে। ট্যাংকগুলো দেখতে রাবারের তৈরি প্রকাণ্ড ডিঙ্গি নৌকার মত। তবে এখন আর সেরকম দেখতে নেই।

তরল ডিজেল ওগুলো থেকেই বেরিয়েছে, ফলে দুটোই প্রায় সবটুকু ডুবে গেছে। মেঝের দুই ফুট গভীরতার অর্ধেকটা ভরে গেছে তেলে। সেই তেলের উপর ভেসে থাকা ফ্লেক্সিবল্ ট্যাংকের চুপসে যাওয়া নিউপ্রিন-প্ল্যাস্টিক কয়েক জায়গায় ছেঁড়া দেখল রানা। হাত তুলে সেদিকটা দেখাতে কর্নেল বললেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'একটা ভালুক কি এই কাজ করবে?'

'পশু বিশেষজ্ঞ হলে বলতে পারতাম। তবে আমি নিশ্চিত, আর কেউও করবে না।' এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন তিনি, তারপর বললেন, 'ওখানে কতটা তেল নষ্ট হয়েছে জানেন? চল্লিশ হাজার গ্যালন।'

ছেঁড়া নিউপ্রিনের দিকে তাকিয়ে ভালুকটার আকার, থাবার শক্তি আর হিংস্র স্বভাবের কথা ভাবছিল রানা, কর্নেল যাদবের কথা শুনে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল। 'এই তেল কি আর ব্যবহার করা যাবে না?'

মাথা নাড়লেন যাদব। 'না।'

'তারমানে আপনি তেলের অভাবে পড়ে গেলেন?'

'ব্যাপারটাকে এভাবে বর্ণনা করলে বুঝতে বোধহয় সুবিধে হবে,' বললেন কর্নেল, 'এখনকার পরিস্থিতিতে, আর যে-টুকু তেল আমাদের আছে, তার দাম চুনি পাথরের চেয়ে কিছু বেশিই হবে।'

পাঁচ

নেতাজি ক্যাম্পের কমান্ডার ভীম সিং যাদবের ঘাড়ে এখন জরুরি কিছু কাজ চেপেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ফুয়েল সাপ্লাইয়ের হিসাবটা চোখের সামনে রেখে খরচের মাত্রা নতুন করে নির্ধারণ করা।

পোলক্যাটকে বিদায় করে দিলেন কর্নেল, বুলডোজার ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন দোরগোড়া পরিষ্কার করবার কাজ যেমন চলছিল তেমনি চলুক। তারপর বেশ আগ্রহ নিয়েই বললেন, ইচ্ছে হলে তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে রানা।

রানা তাঁকে চাবির কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলল, ওগুলো পেলে আজ সকাল থেকেই কাজ শুরু করতে পারে ও।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে কর্নেল বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম হাটগুলোয় তল্লাশি চালাবার সময় আমাকে আপনি সঙ্গে রাখতে চাইবেন।'

'আমি তার কোন প্রয়োজন দেখি না,' শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল রানা। 'তাতে বরং আমার কাজের অসুবিধা হবে।'

বিরাট কাঁধ ঝাঁকিয়ে কর্নেল বললেন, 'ঠিক হ্যায়, মিস্টার জয়, আপ য্যায়সা বেহতর সামাঝতে হেঁ।'

'ধন্যবাদ।'

রানাকে নিয়ে নিজের হাটে চলে এলেন তিনি, একটা তালা দেওয়া দেরাজে যে-কটা অতিরিক্ত চাবি পেলেন রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপাতত এগুলো দিয়ে শুরু করুন, বাকিগুলো কোথায় আছে খুঁজে দেখতে হবে।'

চাবিগুলো পকেটে ভরে ওখান থেকে বেরিয়ে এল রানা। বাংলাদেশীদের কার হাট কোন্‌দিকে জেনে নিয়ে কাজ শুরু করল ও। প্রথমেই মেইল নার্স রফিক শিকদার। কী খুঁজছে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই, তবে দেখলে চিনতে পারবে জিনিসটা সন্দেহজনক কিনা।

এরপর ডাক্তার আরিফ হাসান আর ডক্টর ওসমান ফারুকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডক্টর হারুন হাবিবের হাট।

সন্দেহ করবার মত কোথাও কিছু না পেয়ে খুব যে হতাশ হলো রানা, তা নয়। হেলিকপ্টার অ্যাক্সিডেন্টের পর বিশ-একুশদিন পার হতে চলেছে, সমস্ত প্রমাণ সরিয়ে ফেলবার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছে অপরাধী

তিনটে হাটে তল্লাশি চালাবার পর বিশ্রাম নেওয়ার কথা ভাবছে রানা, এই সময় মনে পড়ল ডাক্তার আরিফ হাসান ওকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

হসপিটাল ট্রেঞ্চের দিকে রওনা হলো ও।

ভিতরে মাত্র ঢুকেছে, এই সময় লাউডস্পিকার থেকে কমান্ডার যাদবের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল: 'আপনারা সবাই এখন যে-যার ডিউটিতে যোগ দিতে পারেন, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতেও কোন অসুবিধে নেই। ভালুকটা বেশ কিছু

ক্ষতি করে গেলেও, নেতাজি ক্যাম্পে নেই সে। তা সত্ত্বেও, সাবধান থাকতে হবে সবাইকে; আর কোথাও যদি নতুন করে কিছু ক্ষতি হয়, সঙ্গে সঙ্গে তা রিপোর্ট করতে হবে।'

ডাক্তার হাসান ভুরু উঁচু করলেন। 'শুনলেন, মিস্টার জয়, সাদা ভালুক সম্পর্কে কালা ভালুক কী বললেন?'

'হ্যাঁ। একজোড়া ফুয়েল ট্যাংক ছিঁড়ে ফেলেছে ওটা।'

দৃষ্টি স্থির হলো, চিন্তিত দেখাল ডাক্তারকে। 'তা হলে তো সমস্যাই। যদিও আমার বা আপনার কোন ব্যাপার নয়। অন্তত এখনই নয়। কফি?'

'ধন্যবাদ।'

'দুধ আর চিনি? রবিশঙ্কর, না আলী আকবর খান, নাকি আবদুল করিম খান?'

রানা বলল, 'দুধ-চিনি একদম নয়। আর কী শোনাবেন সেটা আপনার ওপরই ছেড়ে দিলাম। আমি সমঝদার নই।'

'আসুন, প্রশান্তি অনুভব করি,' বললেন ডাক্তার হাসান। 'দেখা যাক এটা আপনি শুনেছেন কিনা।'

হ্যাঁ, শুনেছে রানা। অনেক দিন আগের কথা, ওর এক বান্ধবী এর জন্য পাগল ছিল। বলল, 'বাহ্! হরিপদ চৌরাসিয়া! এঁর বাঁশির তুলনা হয় না।'

'আর পান্নালাল ঘোষ?' ভুরু জোড়া উঁচু করলেন ডাক্তার।

'আমার কাছে এঁর তুলনায় অনেক হালকা লাগে।'

ডাক্তার হাসান প্রশংসা সূচক মাথা নাড়ছেন দেখে চেয়ারে হেলান দিল রানা, চোখ বুজল, কিন্তু মন দিতে পারল না চেষ্টা করেও। এখানকার ঘটনাগুলো অস্থির করে তুলেছে ওর মনটাকে।

সকাল হতে না হতে শোনা গেল ক্যাম্পে ভালুক ঢুকেছে। তারপর দেখা গেল ফুয়েল ট্যাংক ছেঁড়া।

কাল রিয়্যাক্টরে পাওয়া গেছে কয়েন। তারপর বলা হলো ফুয়েলে দূষণ দেখা দেওয়ায় একটা জেনারেটার অচল হয়ে পড়েছে। তারও আগে, কালই–ওদের প্লেন ঠিক যখন ল্যান্ড করতে যাচ্ছে, নিভে গেল ল্যান্ডিং-স্ট্রিপের আলো। বেশ লম্বা একটা তালিকা। প্রশ্ন হলো, এ-সব কি দুর্ঘটনা? নাকি সঙ্ঘটিত?

কফির মগে চুমুক দিচ্ছে রানা, ডাক্তার হাসানের ওপর দৃষ্টি। ভদ্রলোক চোখ বুজে বসে আছেন, সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন। তবে তিনিও নিশ্চয় এই একই বিষয়ে চিন্তা করছিলেন, কারণ, বাঁশি থামতেই বললেন, 'আপনি যেহেতু এক্সপার্ট, তদন্ত করে আপনাকেই বের করতে হবে কেন এ-সব ঘটছে।'

রানা ভাবল, এটা কি ওর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হলো? 'হ্যাঁ, তা ঠিক; তবে আপনাদের সহযোগিতা পেলে আমার জন্যে কাজটা অনেক সহজ হয়। তা না হলে আরও ক্ষতি হবে, আপনাদের সবার প্রাণের ওপর ঝুঁকির মাত্রাও অনেক বাড়বে।'

'সহযোগিতা অবশ্যই করা হবে…'

'তার আগে আপনাকে তো বিশ্বাস করতে হবে যে এ-সব দুর্ঘটনা নয়? কিন্তু

অনেকেই তা বিশ্বাস করতে রাজি নন।'

'হুঁ। মজার ব্যাপার কী জানেন, সবাই বলাবলি করত প্রথম থেকেই এটা একটা লাকি অপারেশন। একজনকেও না হারিয়ে ক্যাম্পটা তৈরি করে ওরা। এমনকী গুরুতর কোন জখমের ঘটনাও ঘটেনি। তারপর টানা কয়েক বছরের প্রায় নিখুঁত সেফটি রেকর্ড। খারাপ যা কিছু ঘটেছে...গত তিন হপ্তায়।'

'আপনার কী ধারণা? এ-সব কেউ ইচ্ছে করে ঘটাচ্ছে?' জানতে চাইল রানা।

'মানে স্যাবটাজ কিনা?'

'হ্যাঁ?'

'এককথায় আপনার এই প্রশ্নের জবাব দেয়া খুব কঠিন, মিস্টার জয়। সত্যি কথা বলতে কী, আমি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি। বাকি সবার অবস্থাও বোধহয় আমারই মত। স্যাবটাজ বলে বিশ্বাস করি না, কারণ এখানে আপনি যাই স্যাবটাজ করুন না কেন, সেটা আপনার নিজের বিরুদ্ধে চলে যাবে।

'ধরুন খারাপ আবহাওয়ার একটা লম্বা পালা শুরু হয়েছে, আর ঠিক তখনই অচল হয়ে পড়ল মেশিনগুলো–স্রেফ মরে ভূত হয়ে যাবে সবাই...সবাই মানে সব্বাই!' মাথা নাড়লেন ডাক্তার হাসান। 'ওই লোককে অবশ্যই বদ্ধ উন্মাদ হতে হবে।'

রানা ভোলেনি। 'কাল রাতে আপনি বলেছেন, এখানে সবাই এক-আধটু পাগল।'

'এক-আধটু, হয়তো। কিন্তু অত পাগল কেউ নেই এখানে। শুধু একজন ছা...ইয়ে, মিস্টার জয়, চলুন–ডাক্তার আপনাকে একটু হাঁটিয়ে আনবেন।'

'কথাটা আগে শেষ করুন,' নরম সুরে বলল রানা, 'প্লিজ।'

'কী কথা?' ডাক্তার যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'আপনি কী যেন বলতে গিয়েও বললেন না।'

'কই! না!'

এত দ্রুত আর জোরে প্রতিবাদ করলেন ডাক্তার, রানার সন্দেহ আরও বরং বাড়ল। তবে সেই সঙ্গে এ-ও বুঝল যে ভদ্রলোককে মুখ খুলতে বাধ্য করা যাবে না। 'তা, আপনি আমাকে কোথায় হাঁটাতে নিয়ে যাবেন?'

'সাদা ভালুকটা কতটুকু কী ক্ষতি করল দেখতে চাই।'

গায়ে একগাদা কাপড় চড়িয়ে মেইন স্ট্রিটে চলে এল ওরা, ওখান থেকে ফুয়েল ট্রেঞ্চে। ছেঁড়া নিউপ্রিন দেখে আরিফ হাসান মন্তব্য করলেন, 'যাই বলুন, পেশিতে শক্তি আছে ব্যাটার!'

মাথা ঝাঁকাল রানা। চিন্তা করছে ও। ক্ষুধার্ত ভালুক অনেক আশ্চর্য কাণ্ড করে থাকে, সে-কথা মনে রেখেও বলতে হয় এটার আচরণ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

নেতাজি ক্যাম্পে খাবারের কোনও অভাব নেই। ক্ষুধার্ত ভালুকটার দৃষ্টিতে তাকানো যাক–দু'পেয়ে ভোজ্য বস্তু চারপাশে প্রচুর হেঁটে বেড়াচ্ছে, ফুড স্টোরের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল।

প্রশ্ন হলো, এত সব উপাদেয় খাবার ছেড়ে কী কারণে ট্যাংক ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো তার?

'হ্যাঁ,' বলল ও। 'কার ওপর যেন খুব রেগে আছে। খিদে পেয়েছিল, তাও বলা যায় না। তবে ডিজেল খেতে পছন্দ করলে কারও কিছু বলার নেই।'

'হ্যাঁ।' রানার দিকে অপলক দু'সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন ডাক্তার হাসান। 'ভাবছি...' ঘুরলেন তিনি, হেঁটে দরজার কাছে ফিরলেন, তারপর বন্ধ করে দিলেন কবাটটা। 'এদিকটা দেখুন। খাবার সে ঠিকই খেয়েছে।'

দরজার পিছনের মেঝেতে একগাদা ছেঁড়া প্ল্যাস্টিক আর টিন-ফয়েল পড়ে রয়েছে। রানা জানতে চাইল, কী ওগুলো?

'ইমার্জেন্সি রেশন,' জবাব দিলেন ডাক্তার হাসান। 'দরজা আছে এমন প্রতিটি ট্রেঞ্চে একটা করে প্যাক থাকে–বলা তো যায় না কে কখন অসাবধানতা বা দুর্ঘটনাবশত ভেতরে আটকা পড়ে। দরজার পেছনে ঝুলিয়ে রাখা হয়।'

'তা হলে বলতে হবে ভালুকটা খুব চালাক,' বলল রানা। 'খাবারগুলো নিঃশ্চয়ই প্ল্যাস্টিকে মোড়া ছিল?'

'প্ল্যাস্টিকের প্যাকেজ খুলতে আমরা নিজেদের নখ ভেঙে ফেলি, কিন্তু ওটার যে থাবা, তাতে অবশ্যই কোন সমস্যা হবার কথা নয়।'

'না। তবে খাবারগুলো তাকে খুঁজে বের করতে নিশ্চয়ই খুব বেগ পেতে হয়েছে–যদি না গন্ধটা পেয়ে থাকে।'

ডাক্তার বললেন, 'এখানে আসলে "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে"র ঘটনা ঘটছে। তাতে আমি অবশ্যই দোষের কিছু দেখি না। আপনার খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে কোন অপরাধী যদি ধরা পড়ে, আমরা সবাই ভয়ানক সব বিপদের হাত থেকে বেঁচে যাব–আদৌ তেমন কেউ যদি থাকে আর কী। তবে, মিস্টার জয়, সামান্য হলেও প্যাকের গায়ে খাবারের গন্ধ লেগে থাকে; আর ভালুকের নাকও খুব বড়।'

'ভালুকটা খায়ও খুব কম। একশো মাইল হেঁটে এসে কী খেল? না, একটু ফ্রুটকেক আর চকলেটের দুটো বার। যতটুকু খেল তারচেয়ে বেশি ছড়াল। তারপর চলে গেল। হয়?'

দু'আঙুলে ধরে গোঁফের ডগা মোচড়ালেন ডাক্তার। 'তা হলে শুনুন আমি কী করব। এই আবর্জনা কিছুটা নিয়ে যাচ্ছি, মাইক্রোস্কোপের নীচে ফেলে দেখি কিছু পাই কিনা। ভালুকটা যদি এখানে ডিনার খেয়ে থাকে, আবর্জনায় লালা থাকবে। আর লালা মানেই ব্যাকটেরিয়া। বলা যায় না, বিষয়টা নিয়ে আমি হয়তো আস্ত একটা থিসিসই লিখে ফেলব। নাম দেব: স্যালাইভা অ্যানালাইসিস অভ...দূর ছাই, ল্যাটিন নামটা যেন কী?'

'জানি না। উরসুস সামথিং।'

'হ্যাঁ, তো–স্যালাইভা অ্যানালাইসিস অভ উরসুস সামথিং বাই আরিফ হাসান, এমডি...বাজি ধরে বলতে পারি, এ বিষয়ে কেউ কোনও থিসিস করেনি।'

দু'হাত ভর্তি ইমার্জেন্সি ফুড প্যাকের ছেঁড়া টুকরো নিয়ে দ্রুত চলে গেলেন ডাক্তার হাসান।

বাকি হাটগুলোয় তল্লাশির কাজটা সেরে ফেললে হয়, এরকম একটা চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুরতে যাবে রানা, এই সময় মার্জিত বিনয়ের সুরে কে যেন ডাকল,

'মিস্টার জয়?'

ঘাড় ফেরাতেই ডক্টর ওসমান ফারুকের তরুণ ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ডক্টর হারুন হাবিবকে হেঁটে আসতে দেখল রানা। 'হ্যালো?' হাসিমুখে জানতে চাইল ও, 'কী খবর?'

'আমাদের কমান্ডার বললেন, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আমি যেন আপনাকে চারদিকটা একবার ঘুরে দেখাই। এ-ও বললেন যে আপনার একজন বাঙালী গাইড হলেই বোধহয় ভাল হয়।'

'আচ্ছা, তাই বললেন বুঝি?' হাতঘড়ির উপর চোখ রেখে হাসল রানা। 'তা আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চান?'

'আমাদের ক্যাম্পের ভেতর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জায়গা হলো ওয়াটার ওয়েল, মিস্টার জয়–কুয়া। চলুন না হয় ওখান থেকেই শুরু করি। ওটা সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতাও আছে।'

'বেশ, চলুন।'

কুয়াটা যে ট্রেঞ্চে, ক্যাম্পের প্রায় মাঝখানে সেটা; কমান্ড হাট থেকে অনেকটা দূরে, তবে মেস হল-এর একেবারে পাশে, ডাক্তার হাসানের হসপিটাল ট্রেঞ্চ থেকেও বেশি দূরে নয়।

প্রথম দর্শনে কুয়াটা মনে কোন ছাপ ফেলে না। করোগেটেড স্টিলের তৈরি চারফুট উঁচু একটা বৃত্ত মাত্র–মাথার উপর ধাতব একটা ফ্রেমওঅর্ক আছে, আর ওটা থেকে একজোড়া পাইপ দেয়ালের দিকে উঠে গেছে।

ব্যারিয়ারের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে গাঢ় অন্ধকার একটা গর্ত ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না রানা। এতক্ষণে হাবিব একটা সুইচ অন করল, অমনি ঝলমলে উজ্জ্বল সাদা হয়ে গেল কালো গর্তটা, সেই সঙ্গে ওর নীচে উন্মোচিত হলো আশ্চর্য সুন্দর একটা দৃশ্য।

ডায়ামিটারে মাত্র চার ফুটের মত, কিন্তু অসম্ভব গভীর কুয়া; বোঝা যায় সরু মুখটার নীচে বেশ খানিকটা চওড়া করা হয়েছে।

'ক্যাম্প নেতাজিতে আমরা পানি আর উত্তাপের অঢেল সাপ্লাই পাচ্ছি,' বলল হাবিব। 'এখানে আমাদের আরামে থাকতে পারার সেটাই কারণ। উত্তাপ আসে, আপনি তো জানেনই, রিয়্যাক্টর থেকে। আর তাপের সরবরাহ প্রচুর হওয়ায় আমাদের পানিরও কোন অভাব নেই। এই হলো সেই সিস্টেম, এটা থেকে যত খুশি পানি পেতে পারি আমরা।'

'অবশ্যই বরফ গলিয়ে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। কুয়াটা এখানে ছিল না, প্রথম যারা নেতাজি ক্যাম্পে আসে তারাই এটা তৈরি করেছে।' ক্ষীণ একটু হাসির সঙ্গে আরেকটু যোগ করল হাবিব, 'তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। কীভাবে কুয়াটা খোঁড়া হয়েছিল শুনবেন?'

কথা যখন বলে না তো বলে না, তবে শুরু করলে সহজে থামতে চায় না। তার মানে এই নয় যে বিরক্ত হচ্ছে রানা।

ছেলেটার কণ্ঠস্বর মার্জিত আর ভরাট, বাচনভঙ্গি আকর্ষণীয়, শব্দচয়ন সুন্দর:

সবচেয়ে বড় কথা, জটিল একটা বিষয়কে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারে, অর্থাৎ মাথায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখে।

রানার সম্মতির অপেক্ষায় না থেকে বলে চলেছে সে···

এই জায়গায়, ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, স্টিম-এর একটা জেট ব্যবহার করে তারা। গরম জেট দ্রুত বরফ গলাতে শুরু করে। পাম্প করে সরিয়ে নেওয়া হয় পানি। এভাবে দেখা গেল সরু একটা বৃত্তাকার গর্ত নীচের দিকে ক্রমশ গভীর হচ্ছে।

গলিত বরফ দূষিত কিনা টেস্ট করা হয়, বিশেষ করে রেডিও-অ্যাকটিভিটি। তারপর উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের বরফ স্তরকে, হিরোশিমা সহ অন্যান্য দূষণকেও, ছাড়িয়ে কুয়াটাকে চওড়া করা শুরু হয়।'

'অ্যাটম বোমা এখানকার বরফকেও দূষিত করেছে?'

'জী? হ্যাঁ, খুব ভালভাবেই করেছে। তবে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ স্তরের আগের সব নির্মল। এবার, মিস্টার জয়, আপনি একটা হোসপাইপের মুখ কল্পনা করুন, প্লিজ। মানে, নীচে ওরকম একটা আছে আর কী, মুখ থেকে শুধু গরম বাষ্প বেরুচ্ছে।

'স্টিম বরফ গলাচ্ছে, ফলে তলায় পানি জমছে, একটা পাম্প সব তুলে আনছে ওপরে। হোসপাইপের মুখ ধীরগতিতে ঘোরে, বাষ্পের চাপই ঘোরায় ওটাকে–এরমানে হলো, বৃত্তাকারে বরফ কাটা চলছে। আমার সঙ্গে আছেন, মিস্টার জয়?'

'ইন্টারেস্টিং,' বলল রানা, ভাবছে–ডক্টর ফারুকের উদ্ভাবিত উপকরণ আর ফর্মুলা কেউ যদি ক্যাম্পের ভিতরই কোথাও লুকিয়ে রাখতে চায়, তার কি এই কুয়াটাকে নিরাপদ বলে মনে হবে?

'অ্যান্ড সিম্পল। স্টিম প্রেশার নিয়ন্ত্রণ করে আমরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারি বরফ কতটা গভীর পর্যন্ত কাটা হবে। সহজবোধ্য কারণেই খুব বেশি কাটা উচিত নয়। তো, ধীরে ধীরে হোসের মুখ নিচু করা হয়, আরও তলার বরফ যাতে কাটা যায়, এভাবে শেষ পর্যন্ত আমাদের পায়ের নীচে যে স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়েছে সেটাকে আপনি, সার···মিস্টার জয়, প্রকাণ্ড একটা পিঁয়াজের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন।'

পাইপ দুটোর দিকে তাকাল রানা। একটা প্ল্যাস্টিক, আরেকটা ফ্লেক্সিব্‌ল্ স্টিল–ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকে গাঢ় কালো বৃত্তের ভিতর দিয়ে নীচের বিশাল আইস চেম্বারে নেমে গেছে। 'আমি তো কোনও হোসের মুখ বা পাম্প দেখছি না।'

হাসল হাবিব। 'এটা তো শুধু ওপরের পিঁয়াজটা। এই কুয়াটাকে নিয়ে আমাদের ছোট্ট একটা সমস্যা হলো, পিঁয়াজ বা বালবগুলো আমরা বেশি চওড়া করে কাটতে পারি না–তাতে নিজেদের সর্বনাশ ঘটে যাবার ভয় আছে। তাই, সাবধানের মার নেই ভেবে, ওপরেরটা একশো পঞ্চাশ ফুট গভীর হলে, গোটা পদ্ধতিটা আবার প্রথম থেকে শুরু করি আমরা–নতুন একটা মুখ বা বৃত্ত কাটি, তারপর তৈরি করি আরেকটা বালব বা পিঁয়াজ।'

'এখানে আপনি আমাকে কটা পিঁয়াজের গল্প শোনাচ্ছেন তাই বলুন।'

'আমাদের স্ট্রাকচারটা মোট তিনটে পিঁয়াজের সমষ্টি। একটার ওপর আরেকটা, এভাবে।'

'হোসপাইপটা?'

'চারশো বা আরও কিছু বেশি ফুট নীচে ঘুরছে স্টিম হোস, মানে ওটার মুখ। ওখানে, তৃতীয় বালবের তলায়, প্রায় এক লাখ গ্যালন পানি আছে।'

'বেশ ভাল বুদ্ধি,' স্বীকার করল রানা।

শ্রাগ করল তরুণ ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট। 'কি জানি, একটু বোধহয় বেশি চালাকি হয়ে যাচ্ছে। নেতাজি ক্যাম্পে আমরা খুব বেশি কুয়া খুঁড়তে চাই না। কারণ বরফ হলো প্ল্যাস্টিক–নিজের খালি জায়গা নিজে ভরতে শুরু করলে কী ঘটবে কে জানে। কাজেই আমরা এই একটা নিয়েই সন্তুষ্ট। তবে মেইন্টেন্যান্স-এ খুব ঝামেলা হয়।'

'কী ধরনের মেইন্টেন্যান্স?'

'আমার বোধহয় শব্দ বাছাইয়ে ভুল হলো। বলা উচিত ইন্সপেকশন্স। সব ঠিক আছে কিনা নিয়মিত চেক করতে হয়; খেয়াল রাখাটা জরুরি স্টিম জেট গোল করে কাটছে, নাকি শুধু একদিকের বরফ খাচ্ছে।'

কী যেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না রানা, তার বদলে জানতে চাইল, 'আপনি বলতে চাইছেন ওখানে কাউকে নামতে হয়?'

'অবশ্যই।'

'তা হলে ঝামেলা না বলে ওটাকে ভয়ঙ্কর বিপদ বলাই উচিত।' কুয়াটার নীচে আবার একবার তাকাল রানা। 'ওগুলো কি তুষারিকা–বরফের ঝুরি?' কুয়ার প্রবেশমুখের ঠোঁট থেকে বরফের দৈত্যাকার বল্লম ড্রাগনের দাঁতের মত অনেক গভীর পর্যন্ত ঝুলে আছে।

'এটাও আরেকটা ছোটখাট সমস্যা। কিছু বাষ্প ওপরে উঠে আসে, সেগুলো কখনও নিজেই জমে বরফ হয়ে যায়, আবার কখনও ওঠার পথে বরফ গলায়–এ কারণেই ঝুরি তৈরি হয়।'

'ওগুলোর একটা যদি কারও গায়ে খসে পড়ে?'

'সাবধানে থাকতে হয় আর কী । দ্বিতীয় আর তৃতীয় চেম্বারে ঝুরিগুলো আকারে আরও বড়, কিন্তু আঘাত করে ফেলে দেয়া সম্ভব নয়–সমস্ত ইকুইপমেন্ট ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।'

'তো নামেটা কে?'

হাবিব বলল, 'কাউকে স্বেচ্ছাসেবক হতে হয়।'

'কারণটা পরিষ্কার,' বলল রানা, তারপর চেপে রাখা প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বলেছেন কুয়াটা সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা আছে। নেমেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, নেমেছি। একবার নয়, দু'বার। আমার সার···ডক্টর ওসমান ফারুকের নির্দেশে; নিজেদের সংগ্রহ করা একশো ভাগ বিশুদ্ধ পানি চাইতেন তিনি।

'তবে প্রায় ভৌতিক, গা ছমছম করা এই ব্যাপারটা আমার আসলে ভাল লাগে। সত্যি ভারী ইন্টারেস্টিং। ওটার নীচে আপনি বরফের কত রকমেরই না

স্তর দেখতে পাবেন। প্রতি বছর নতুন স্তর। যত নীচে নামবেন দেখবেন স্তরগুলো চাপে পড়ে আরও নিরেট আর কঠিন হয়েছে।

'ওখানে আপনি ইতিহাস পড়ার সুযোগ পাবেন। একটু খেয়াল করে তাকালে দু'নম্বর বালবে সরু একটা কালো রেখা দেখতে পাবেন। ওই সময়ই আগ্নেয়গিরি ক্রাকাতোয়া বিস্ফোরিত হয়েছিল কিনা।'

'কিন্তু ওটা তো জাভায়! ছাই কি সত্যি এত দূর আসতে পারে?'

হাবিব হাসল। 'এক্সপার্টরা তো তাই বলেন। নিশ্চয়ই খুব জোরাল উদ্‌গীরণ ছিল, তাই না? যাই হোক, ওঁরা বলছেন পাঁচশো ফুটের কাছাকাছি গভীরে আমরা যে বরফ পাব সেটা ১৪৯২ সালে পড়েছিল; আর ওঁদের এ-কথা শুনে আমাদের কর্নেল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ওখানকার বরফ বোতলে ভরে কলম্বাস ওয়াটার নামে বাজারে ছাড়বেন। তাঁর ধারণা, ইউরোপ-আমেরিকায় এই পানি নাকি খুব ভাল দরে বিকাবে।'

'অসম্ভব নয়।'

'তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার সন্দেহ আছে অত গভীরে আমরা যেতে পারব কিনা। যেতে হলে আরেকটা পিঁয়া...কুয়া কাটতে হবে।' বোতাম টিপে দেয়ালের আলোগুলো নিভিয়ে দিল হাবিব।

প্রশংসার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। যার যত দুঃসাহসই থাকুক, কুয়ার উপরকার ফ্রেমওঅর্ক থেকে ঝুলন্ত ওই চেয়ারটায় বসতে বুক তার কাঁপবেই।

রানা তাকিয়ে আছে টের পেয়ে হাবিব একটু আড়ষ্ট হয়ে বলল, 'আমি বোধহয় আপনাকে খুব বিরক্ত...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা, বলল, 'ঠিক তার উল্টো। ধন্যবাদ, মিস্টার হাবিব। এবার কোথায়?'

পথ দেখিয়ে এরপর রানাকে রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চে নিয়ে আসা হলো। কিন্তু এখানে সবাই এত ব্যস্ত যে তদন্তকারী অফিসার হিসাবে হোক বা অতিথি হিসাবে, কেউ তারা আলাদাভাবে ওকে সময় দিতে পারবে না।

ইঞ্জিনিয়ার জাভেদ হাশমি এরই মধ্যে কাজে ফিরে এসেছেন। ক্লান্ত আর অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে তাঁকে, ভুরুজোড়া কুঁচকে রেখেছেন। রানার হিসাবে মাত্র আড়াই কি তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন ভদ্রলোক। অথচ কাজ তিনি যেটা করছেন সেটা গভীর আর সূক্ষ্ম মনোসংযোগ, সেই সঙ্গে নিঃশর্ত আন্তরিকতা দাবি করে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য মুখ তুলে বললেন, 'কাল আসুন, প্লিজ। সবটুকু ঘুরিয়ে দেখাব। আর যদি কাজের জন্যে এসে থাকেন, সে-ও কাল...'

ওখান থেকে ওরা ট্র্যাক্টর শেডে চলে এল। শেডটা গভীর করে কাটা হয়েছে। দৈত্যাকার ছ'টা ট্র্যাক্টর আর বুলডোজার ছাড়াও ক্যাটারপিলার লাগানো আট-দশটা ভেহিকেল আর পোলক্যাট দেখতে পেল রানা। একপাশে কয়েকটা স্কি-ডু রয়েছে–দ্রুতগতি স্নো-স্কুটার।

সময় করে এখানে একবার একা আসতে হবে ওকে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা–সম্ভব হলে আজ রাতেই। সিডি বা পেন ড্রাইভ, তার সঙ্গে তুলোয় মোড়া কাঁচের

টিউব বা অ্যামপুল লুকিয়ে রাখবার জন্য যে-কোন ভেহিকেল আদর্শ জায়গা হতে পারে।

ওখান থেকে ওয়েদার রিসার্চ ল্যাব। বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলল রানা।

একই ক্যাম্পে একটানা কয়েক বছর একসঙ্গে কাজ করেছেন, অথচ ডক্টর ওসমান ফারুক সম্পর্কে প্রায় কিছুই তাঁরা জানেন না। কারণ হিসাবে বলা হলো, ভদ্রলোক তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করবার সময় পেতেন না। তাঁর অবসরই তো ছিল না। ছুটির পরও নিজের ল্যাব ছেড়ে তাঁকে খুব কমই বেরুতে দেখা গেছে।

ল্যাবটা বেশ সময় নিয়ে ঘুরেফিরে দেখল রানা। এখানে টেকনিশিয়ান যারা কাজ করছে তারা সবাই নেপাল, মালদ্বীপ আর ভুটানের লোক।

হাবিব ইতিমধ্যে কিছুটা ক্লান্ত, কিছুটা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে, তবে রানা তাকে ছাড়ল না। স্লিপিং কোয়ার্টার হয়ে সার্জেন্টস ক্লাবে চলে এল ওরা।

স্লিপিং কোয়ার্টারের হাট বা ক্যাবিনগুলো রানারটার মতই। জানালা নেই, ভ্যাপসা পরিবেশ, স্থির বাতাসে ঘামের গন্ধ ভেসে আছে।

ক্লাব আসলে দুটো। একটা সার্জেন্টদের জন্য, আরেকটা শুধু তালিকাভুক্ত অফিসারদের। প্রতিটিতেই সাজানো বোতলের সারি আছে, আছে পিং-পং খেলবার টেবিল আর পুল। কিচেনগুলো এত সুন্দর, দেখলে মিস্টার হিলটনও বোধহয় প্রশংসা না করে পারতেন না।

গাইড হিসাবে হাবিব সত্যি খুব ভাল। ক্যাম্প নেতাজির প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ও তার নখদর্পণে।

সব কিছু ঘুরিয়ে দেখানোর পর সে বলল, 'গোটা ব্যাপারটা খুবই ইমপ্রেসিভ, বিশেষ করে আপনি যখন উপলব্ধি করবেন প্রতিটি আইটেম–রিয়্যাক্টর থেকে শুরু করে ছুরি আর চামচ পর্যন্ত–স্লেজে তুলে আইসক্যাপের ওপর দিয়ে একশো মাইল টেনে আনতে হয়েছে।'

সব দেখা শেষ হতে রানাকে সার্জেন্টস ক্লাবে কফি খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল সে। গেল রানা, জানে কী দেখতে পাবে।

ওর অনুমান মিথ্যে নয়। সার্জেন্টরা, যে-কোন আর্মিতেই, অত্যন্ত গুছানো স্বভাবের হয়। অফিসার্স মেসে একটা সামাজিক পিরামিড পাওয়া যাবে, সদস্যরা তরুণ থেকে শুরু করে প্রায় প্রৌঢ়, ফলে মেলামেশাটা সাধারণত সাবলীল হয় না, এক ধরনের আড়ষ্ট ভাব থেকেই যায়।

সার্জেন্টদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার কারণে বয়সের সামান্য হেরফের থাকলেও প্রায় সবাই তারা সমবয়সী, অভিজ্ঞ আর পরিণত, ফলে কে কাকে কী বলে ডাকবে তা নিয়ে কখনও কোন সমস্যায় পড়তে হয় না। আরও গুরুত্বপূর্ণ, এই সার্জেন্টরাই একটা আর্মিকে ঠিকঠাক মত চালায়, অর্থাৎ সচল রাখে।

তো পার্থক্য হলো, অফিসার্স ক্লাব যেখানে আরামদায়ক অথচ আগোছাল, সেখানে সার্জেন্ট'স ক্লাব খুব ঝকঝকে-তকতকে; অফিসাররা নিজেরাই গ্লাসে মদ ঢালেন, সার্জেন্টদের আছে সাদা জ্যাকেট পরা একজন বারম্যান।

জিগমে পিলুই রানাকে অভ্যর্থনা জানাল। ভুটানি এই তরুণ বারম্যান সারাক্ষণ হাসছে। হাবিবের নির্দেশ মত কফিই পরিবেশন করল সে, তবে ওদের

মগে বেশ কিছুটা করে ব্র্যান্ডি ঢালতে ভুলল না।

আগুনের মত গরম কফিতে চুমুক দিচ্ছে ওরা, এই সময় বারে ঢুকল আরেক তরুণ। সুঠাম স্বাস্থ্য, চোখেমুখে বাঙালীসুলভ সারল্য। রানার দৃষ্টিতে আগ্রহ লক্ষ করে খুশি মনে পরিচয় করিয়ে দিল হাবিব।

'যদি ভেবে থাকেন ও বাংলাদেশী, তা হলে ভুল করেননি, মিস্টার জয়,' বলল সে। 'উনি আমাদের রফিক শিকদার, ডক্টর আরিফ হাসানের সহকারী।'

এর কথা আগেই শুনেছে রানা। তিনজন মেইল নার্সের একজন সে। তার সঙ্গী অসুস্থ হয়ে পড়ায় ছুটি নিয়ে থিউলে চলে গেছে, প্রথম সুযোগেই দেশে ফিরে যাবে। তৃতীয়জন বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে ডিউটি দিচ্ছে।

রফিকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা।

'দেশের কী খবর, সার?' কোন ভূমিকা নেই, নেই কোন আড়ষ্টতা, দেশী মানুষকে আপনজন মনে করায় বুকে জমে থাকা সমস্ত ব্যাকুলতা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। 'মানুষ কি আশার কোনও আলো দেখতে পাচ্ছে?'

তার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'কে কবে আলো দেখাবে, তার অপেক্ষায় কি থাকার দরকার আছে আমাদের? ইচ্ছে করলে তো আমরা নিজেরাই আলোর উৎস খুঁজে নিতে পারি, পারি না?'

এক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে অপ্রতিভ একটু হাসল রফিক। তারপর শ্রদ্ধার সঙ্গে বলল, 'দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যটা ভাল লাগল, সার। আপনি বলার পর মনে হচ্ছে তা বোধহয় পারি আমরা।'

বারে আর কেউ না থাকলেও, ক্যাম্পের পরিস্থিতি বুঝবার জন্য গল্প করার অজুহাতে তিনজনকেই এটা-সেটা নানান প্রশ্ন করল রানা। তার মধ্যে একটা হলো, কে কতদিন আইসক্যাপে আছে, আরও কতদিন থাকার ইচ্ছা।

জিগমে পিলুই জানাল, 'আমি, সার, তিন বছর হলো আছি। এখান থেকে ছুটি পেলে আজই দুমকায় গিয়ে একটা বার খুলে বসি।'

'তুমি?'

'আমি এসেছি ইউরোপে ডাক্তারি পড়ার খরচ যোগাড় করতে,' বলল মেইল নার্স রফিক শিকদার। 'আমাকে আর মাত্র এক বছর কাজ করতে হবে এখানে।'

'আর আপনি?' ঘাড় ফিরিয়ে হাবিবের দিকে তাকাল রানা। 'ডক্টর ফারুক নেই, কাজেই আপনার বোধহয় এখানে আর কোন কাজও নেই?'

'প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম,' বলল হাবিব। 'কিন্তু কর্নেল যাদব আমাকে জানালেন, আমি থাকতে চাইলে থাকতে পারি, কারণ ল্যাবগুলোয় কাজের কোন অভাব নেই। প্রতি দু'বছর পর পর চুক্তি নবায়ন হয়, আমারটা গত বছর হয়েছে, তারমানে আরও এক বছর থাকতে পারব আমি।'

'তারমানে আপনি থাকছেন, আর চুক্তিটা বোধহয় রিনিউও করবেন?'

একটু ভুরু কোঁচকাল ডক্টর হারুন। 'ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করতে হয়, সা…মিস্টার জয়। ওই হেলিকপ্টার অ্যাক্সিডেন্টের কাছাকাছি সময়েই আমরা একজন মানুষকে হারাই খুবই কম বয়স, আমার চেয়েও ক'বছরের ছোট। আমার ধারণা, ছেলেটা আমার দোষেই হারিয়েছে। না, মিস্টার জয়, চুক্তিটা আমি

আর রিনিউ করছি না।'

রফিক বলল, 'কেউ ওঁকে দায়ী করে না, শুধু উনি নিজে বাদে। এ-কথা কর্নেল বলেছেন, আমি বলেছি, সবাই বলেছে।'

'এ-ধরনের ব্যাপার ঘটে,' সহানুভূতির সুরে বলল রানা। এরই মধ্যে হাবিবকে ভাল লেগে গেছে ওর। শুধু যে বুদ্ধিমান তা নয়, যথেষ্ট শক্তিশালী আর নির্ভরযোগ্য। তা ছাড়া, নিপাট ভদ্রলোকও বটে। 'এখান থেকে কোথায় ফিরবেন আপনি?' জানতে চাইল ও। 'ফিরে কী করবেন?'

'ফিরব তো অবশ্যই ঢাকায়,' বলল হাবিব। 'ভাবছি কোনও একটা ভার্সিটিতে চাকরি জুটিয়ে নেব। তবে আমার আসল কাজ হবে ফারুক সারকে অনুসরণ করা...অর্থাৎ গবেষণা।'

'ইন্টারেস্টিং। কী নিয়ে গবেষণা করবেন, কিছু ভেবেছেন?'

'আমার সাবজেক্ট ব্যাকটেরিয়লজি, তাই ভাবছি ভাল জাতের এমন এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কারের চেষ্টা করব, যেটা মন্দ জাতের সব ব্যাকটেরিয়াকে এক নিমেষে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে।'

'ভেরি গুড।'

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সার্জেন্টস ক্লাব ত্যাগ করল রানা ও হাবিব। বাথরুম সেরে মেসে আসছি বলে হাবিব চলে গেল নিজের ঘরের দিকে। লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে, তবে মেস হলে যাওয়ার আগে কোন মেসেজ এসেছে কিনা দেখবার জন্য একবার রেডিও রুমে ঢুঁ মারল রানা। ওর এখানে আসবার কথা রানা এজেন্সির কুইবেক চিফ শহীদুল হককে জানানো হয়েছে।

না, বিজয় হাসানের নামে কোন রেডিও মেসেজ নেই। শ্রীলঙ্কান অপারেটর কুমারাতুঙ্গা জানাল, 'তবে, সার, আমাদের সবার জন্যেই একটা দুঃসংবাদ আছে।'

'কী দুঃসংবাদ?'

'চলতি-কা-নাম-গাড়ির সঙ্গে গতকাল মাঝরাতে শেষবার যোগাযোগ হয়েছিল; তারপর ওদিক থেকে আর কোন টু-শব্দ নেই। আমার ধারণা, চকানাগা একটা হোয়াইট-আউটে পড়েছে। তারমানে স্নো ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়েছে, যোগাযোগও রক্ষা করতে পারছে না।'

'আমার ধারণা ছিল কিছুই ওটাকে থামাতে পারে না।'

'শুধু হোয়াইট-আউট বাদে, সার। যদি মন্দ প্রকৃতির হয়, দৃষ্টিসীমা বলে কিছুই আপনি পাবেন না। বাতাসে এত ঘনভাবে ভেসে থাকবে তুষার কণা, ঠিক মনে হবে আপনি যেন দুধের মধ্যে ডুবে আছেন। আকাশ নেই, দিগন্তরেখা নেই; পায়ের নীচেও কিছু দেখা যায় না। পরিস্থিতি ভাল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বাধ্য আপনি।'

'কতক্ষণ লাগতে পারে?'

'মিনিট, ঘণ্টা, দিন—কে জানে! হঠাৎ করেই জোরাল একটা বাতাস দিল, ব্যস, অমনি সব পরিষ্কার।'

লাঞ্চ খেতে মেস হলে চলে এল রানা। ইঞ্জিনিয়ার হাশমি বা কর্নেল যাদব, কাউকে এখানে পাওয়া গেল না। চুপচাপ একা শুধু কমিউনিকেশন এক্সপার্ট রত্নে

উপলচন্দ্র ম্লান মুখে বসে আছে। কাল এই বিষণ্ণ তরুণের সঙ্গেই বসেছিল রানা। 'আপনার টেবিলে বসতে পারি তো?' মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ, প্লিজ। কাল আমি...সত্যি দুঃখিত।'

'না-না, দুঃখ প্রকাশ করার কিছু নেই।'

সহজ আর স্বাভাবিক আচরণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করল উপল, কিন্তু আসলে ভিতর থেকে কোন সাড়া পাচ্ছে না সে। আরেকবার ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'মনটাকে কোনভাবেই ভাল করতে পারছি না।'

'ডাক্তারও কোন সাহায্যে আসছেন না?'

'হ্যাপি পিল?' মাথা নাড়ল উপল। 'ওগুলোর প্রভাব কেটে গেলে অবস্থা আরও কাহিল হয়ে পড়ে, তাই খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। শুনে হয়তো পাগলামি মনে হবে, তবে আমি জানি যে অনেক দূরে কোথাও হাঁটতে যাওয়া উচিত আমার।'

'কঠিন।'

'অসম্ভব। কিন্তু মাথায় ঢোকার পর আইডিয়াটাকে আর তাড়াতে পারছি না। বারবার শুধু মনে হচ্ছে বাইরে যদি একবার হাঁটতে যেতে পারতাম তা হলে সব ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু তা সম্ভব নয়, ফলে একই জায়গায় শুধু চক্কর খাচ্ছি।'

'আসলে বদ্ধ জায়গার ভেতর আটকা পড়ার ভীতি থেকে এরকম হয়—ক্লস্ট্রফোবিয়া।'

'হ্যা, আমি জানি।'

'কমবেশি সবারই এই অবস্থা।'

'তাও জানি। কিন্তু তারপরও...আপনি জানেন কী ঘটেছিল?'

মাথা নাড়ল রানা।

ধীরে ধীরে বলে গেল উপল। সাইযমলজি হাটে ছিল ওরা; সেটা উপরে, অর্থাৎ আইসক্যাপে, ক্যাম্প থেকে তিনশো গজ দূরে। খারাপ আবহাওয়ার একটা পালা শুরু হওয়ায় তিনদিন ওখানে আটকা পড়েছিল ওরা।

পরিস্থিতি একটু ভাল হতে ফিরতি পথ ধরে, আর তারপরই কোথাও কিছু নেই দিনের আলোয় ওদের উপরে ঝপ্ করে নেমে এল একটা হোয়াইট-আউট। মাত্র তিনশো গজ দূরত্ব, কিন্তু এই হোয়াইট-আউট ওদের নড়াচড়ার ক্ষমতা কেড়ে নিল।

অবশ্য মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই দুর্যোগটা কেটে যায়। কিন্তু কীভাবে যেন গাইড-লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে রত্নে গোপালচন্দ্র, উপলের চাচাতো ভাই। ব্যাকটেরিয়লজিস্ট ডক্টর হারুন হাবিব, সত্যিকারের সাহসী আর বিবেকবান মানুষ, গোপালের জন্য আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে ওখানে...ফলে বরফ হয়ে প্রায় মারাই যাচ্ছিল সে।

ওখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বারবার ডেকেছে হারুন, কিন্তু গোপালের কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। আইসক্যাপ স্রেফ যেন তাকে হজম করে নিয়েছে।

উপল থামতে রানা বলল, 'ডক্টর হারুনের মন ভেঙে গেছে। আপনি জানেন, ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাবেন উনি?'

'হ্যাঁ, জানি।'

ওদের খাওয়া শেষ হতে রানা বলল, 'হাঁটতে বেরুনো যখন সম্ভব নয়, অন্য কোন এক্সারসাইজ? পিং-পং?'

ধন্যবাদ জানিয়ে না বলতে গেল উপল, তারপর সিদ্ধান্ত পাল্টে মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, চলুন।'

এক ঘণ্টা দশ মিনিট খেলল ওরা, উত্তপ্ত রিক্রিয়েশন হাটে দু'জনের শরীর থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছে। প্রথমদিকে খেলায় মন ধরে রাখতে বেশ সমস্যা হলো উপলের, তবে একটু পরই প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে না হারবার জিদটা বোধহয় তাকে উজ্জীবিত করে তুলল, খেলাটা রানার সঙ্গে প্রায় সমান তালে চালিয়ে গেল সে।

ধীরে ধীরে উপলের কপাল থেকে মুছে গেল রেখাগুলো। হাসিখুশি না হলেও, এখন আর তাকে আগের মত ম্রিয়মান লাগছে না।

নিজের হাটে ফিরে রানা দেখল কর্নেল যাদব প্রায় এক বস্তা ফাইল পাঠিয়ে দিয়েছেন, বস্তার মুখে পিন দিয়ে আটকানো একটা কাগজে লেখা–'এখানে শুধু তাদের ফাইল আছে যাদের সঙ্গে ডক্টর ফারুকের ওঠা-বসা ছিল বা নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ হত। –কর্নেল যাদব।'

শাওয়ার সেরে বিছানায় আধশোয়া হলো রানা, একটা একটা করে ফাইলগুলো দেখছে। প্রথমেই কালা ভালুকের ফাইল।

ভীম সিং যাদবের দুই সন্তান, বড়টা ছেলে, ছোটটা মেয়ে। ছেলে তার বউ-বাচ্চা নিয়ে ওয়াশিংটনে থাকে, আর মেয়ে তার ব্রিটিশ স্বামীর সঙ্গে থাকে লন্ডনে। রানার মস্তিষ্কের নোটবুকে লেখা হয়ে গেল–দুটোই শ্বেতাঙ্গপ্রধান দেশ।

ছেলেটা শুধু যে আমেরিকায় থাকে তা নয়, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব নিয়ে বেশ উঁচু পদে সরকারী চাকরিও করছে। মেয়েটা আরও একধাপ এগিয়ে। গত বছর ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির হয়ে এমপি হওয়ার জন্য উপ-নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ছিল সে, যদিও জিততে পারেনি।

দ্বিতীয় ফাইলটা ডক্টর হারুন হাবিবের। বিসিআই-এর তৈরি ডোশিয়ে পড়ে তার সম্পর্কে প্রায় সবই জানা হয়ে গেছে রানার, তবু ফাইলটা ভাল করে পড়ল ও।

ঠিক যেমনটি আশা করেছে রানা–হারুন হাবিবের রেকর্ডে একটাও কালো দাগ নেই। মদ খায় সে, কিন্তু কখনও মাতলামি করেনি। তাস খেলায় নিয়মিত হারে, অথচ কেউ কখনও তাকে রাগতে দেখেনি। খেলায় সে চুরি করতেও অভ্যস্ত নয়।

তবে, আর সবার মত হাবিবের জীবনেও এমন কিছু ঘটনা আছে যেগুলোর সহজবোধ্য ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন। যেমন–স্ত্রী তাকে আমেরিকায় বসে তালাক দিতে চাইলে ঢাকা থেকে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায় সে; একমাত্র সন্তানটিকে নিজের কাছে নিয়ে এসে রাখবার কোন চেষ্টাই করেনি।

নিজেকে রানা নোটিশ দিয়ে রাখল, সুযোগ মত এ-ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে; এমনকী হাবিবকেও সরাসরি প্রশ্ন করা যেতে পারে।

পরের ফাইলটা পাকিস্তানি রিয়্যাক্টর ইঞ্জিনিয়ার জাভেদ হাশমির। এই

ভদ্রলোকের ফাইলটা না পাঠালেও পারতেন কর্নেল। হাশমি প্রতি বছর গড়ে তিন মাসের বেশি থাকেন না নেতাজি ক্যাম্পে, তা ছাড়া হেলিকপ্টার অ্যাক্সিডেন্টের সময় আইসক্যাপে তিনি ছিলেনই না। তবু ফাইলটা খুলে একবার চোখ বুলাল রানা।

প্রথমেই একটা ধাক্কা খেতে হলো। প্রমাণিত হয়নি, তবে হাশমির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল তিনি পাকিস্তানি পারমাণবিক প্রযুক্তি উত্তর কোরিয়ার কাছে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেটা যদিও আমেরিকা যতবড় অপরাধ মনে করে, রানা তা করে না।

অসৎ একজন মানুষ টাকার লোভে অনেক ধরনের অপরাধ করতে পারে, তবে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। জাভেদ হাশমির পক্ষে সম্ভব?

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করবার পর মাথা নাড়ল রানা—না।

তারপর ডাক্তার আরিফ হাসানের কথা মনে পড়ল ওর। একঘেয়েমি কাটাবার জন্য ভদ্রলোকের কাছে একবার যাওয়া যেতে পারে। উপরি পাওনা হিসাবে হয়তো জানা যাবে শ্বেতভালুকরা কী ধরনের জীবাণু বহন করে।

কাজেই গায়ে আবার গরম কাপড়ের বস্তা চাপিয়ে টানেলে বেরিয়ে এল রানা, গুটিগুটি পায়ে হসপিটালের দিকে এগোচ্ছে। পথে কারও সঙ্গে দেখা হলো না।

হসপিটালে এসে রানা দেখল ডাক্তার হাসানের আউটার অফিস খালি, তবে অপারেটিং থিয়েটারের দরজায় একটা লাল আলো জ্বলছে। ডাক্তার নিশ্চয়ই ওর ভিতরে ঢুকবার শব্দ শুনেছেন, কারণ ভিতর থেকে গলা চড়িয়ে জানতে চাইলেন, 'কে?'

সাড়া দিল রানা।

তারপর ডাক্তার হাসান বললেন, 'আপনাকে আমার একটা জিনিস দেখাবার আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি খুব ব্যস্ত। পরে দেখা হবে।'

ওখান থেকে চলে এল রানা। ফাইলগুলো তাড়াতাড়ি দেখে ফেলা দরকার, নিজের হাটে ফিরে আবার ওগুলো নিয়েই বসল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করল রানা। ডিনার সেরে থিয়েটার হাটে ঢুকে দেখল শাহরুখ আর ঐশ্বরিয়ার দেবদাস চলছে। চোখে ঘুম চলে আসায় আধ ঘণ্টা পর ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল।

ঘুমাবার ঠিক আগে খুশি মনে রানা ভাবল, আজ দিনটা ভালই কেটেছে, অন্তত খারাপ কিছু ঘটেনি। নষ্ট জেনারেটরটাকে আবার কাজের উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। কাল শুরু হতে যাচ্ছে রিয়্যাক্টরের 'গো ক্রিটিকাল' পর্যায়। এসব চিন্তা নিবিড় ঘুম হওয়ার জন্য খুবই সহায়ক।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, রানার খুশি হওয়ার কারণটা সত্যি নয়।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট করতে যাওয়ার পথে আরেকবার রেডিও রুমে ঢু মারল রানা। অপারেটর কুমারাতুঙ্গা জানাল, না, ওর কোন মেসেজ আসেনি। তারপর বলল, চলতি-কা-নাম-গাড়িরও কোন খবর নেই

রানা জিজ্ঞেস করল, 'চিন্তার কথা না?'

হাসল কুমারাতুঙ্গা। 'নাহ্। আবহাওয়া ভাল হলেই ঝট্ করে চলে আসবে, খারাপ থাকলে দেরি করবে–তবে আসবে ঠিকই। চকানাগা কখনও পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, ধন্যবাদ জানিয়ে কমিউনিকেশন রুম থেকে বেরিয়ে এল। ভ্যাপসা পরিবেশে রাত কাটানোয় সকাল বেলাতেই মাথা ধরেছে, ভাবল ব্রেকফাস্ট সেরে ডাক্তার হাসানের কাছ থেকে একজোড়া অ্যাসপিরিন নিয়ে আসবে।

দেখা গেল সবার পরে মেস হলে পৌঁছেছে রানা, ফলে একা বসে খেতে হলো। মগ ভর্তি গরম কফিতে চুমুক দেওয়ার সময় একটা সিগারেট ধরাল, তবে ভাল না লাগায় মাত্র এক কি দুটো টান দিয়ে গুঁজে রাখল অ্যাশট্রেতে।

কফি শেষ করে আবার নিজেকে গরম কাপড়ে মুড়ল রানা, তারপর মেস হল থেকে বেরিয়ে হসপিটালে চলে এল। কিন্তু হসপিটাল খালি, ডাক্তার হাসান নেই। কাবার্ড খুলে নিজেই অ্যাসপিরিন বের করবে কিনা ভাবল একবার, চিন্তাটা বাতিল করে দিয়ে ওখান থেকে চলে এল অফিসার্স ক্লাবে।

টেবিলে বসে ধূমায়িত কফি আর টাইম ম্যাগাজিনে ডুব দিল রানা। আধ ঘণ্টা কাটল, কিন্তু ডাক্তার হাসান অফিসার্স ক্লাবে আসছেন না। মাথাব্যথাটা আরও বাড়ছে দেখে আবার হসপিটালে চলে এল ও। কিন্তু এখনও ফেরেননি তিনি।

মেইন স্ট্রিটে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, মাথাব্যথার দাওয়াই হিসাবে কাজে লাগতে পারে ভেবে কমান্ড ট্রেঞ্চের দিকে রওনা হলো রানা। কিন্তু সেখানে ওর পৌঁছানো হলো না।

মেইন স্ট্রিটের শেষ মাথায়, টানেলটা যেখানে ক্রমশ উঁচু হয়ে আইসক্যাপে উঠে গেছে, বুলডোজারের পাশে লোকজনের একটা ভিড় দেখা গেল। সেদিকে এগোবার সময় রানা লক্ষ করল, লোকগুলো মেঝের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে। ভিড়টা বেশ বড় হওয়ায় জিনিসটা দেখতে পাচ্ছে না ও।

লোকজনকে ঠেলে ভিতরে ঢুকল রানা। এক পলক তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল ও। কী ঘটেছে বুঝে নিয়েছে। বুলডোজারের ছাপ্পান্ন ইঞ্চি স্টিল ট্র্যাক একজন মানুষকে পিষে ছাতু বানিয়ে ফেলেছে, তার অবশিষ্ট বলতে আছে শুধু রক্তের পোচ, মাংস আর ছেঁড়া কাপড়। অনেক কষ্টে বমির ভাবটা দমন করল রানা।

এক মিনিটের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বীভৎস দৃশ্যটার সামনে আবার ফিরে এল রানা, দাঁড়াল কর্নেল যাদবের পাশে। 'কে?' জানতে চাইল ও।

মাথা নাড়লেন কমান্ডার। 'বোঝা যাচ্ছে না। আমরা ধারণা করছি ডাক্তার আরিফ হাসান।'

ছয়

মাত্র দু'একদিন আগে পরিচয়; তবু রানা তাঁকে প্রাণবন্ত আর অত্যন্ত বুদ্ধিমান একজন মানুষ হিসাবে চিনতে পেরেছিল। খুব কম মানুষই নিজের দায়িত্বের পরিধি স্বেচ্ছায় বাড়িয়ে নিতে আগ্রহ দেখান, ইনি ছিলেন তাঁদের একজন।

বিশ্বাস করা কঠিন এই মুহূর্তে তাঁর রক্তাক্ত কণা বরফের মেঝে আর বুলডোজারের ট্র্যাকে লেপ্টে আছে।

'কীভাবে ঘটল?' জিজ্ঞেস করল রানা, কর্নেলকে নিয়ে একপাশে সরে এসেছে।

সতর্ক দেখাল কর্নেলকে। কথা বলছেন চিন্তা-ভাবনা করে। 'আমি কিছু জানি না, মানে দেখিনি। শুনলাম।'

রাগ চেপে রানা বলল, 'যা শুনেছেন তাই বলুন।'

'তাঁর ওপর দিয়ে বুলডোজার চলে গেছে। কয়েকবার। ড্রাইভার দেখতে পায়নি তাঁকে, তারমানে নিশ্চয়ই তুষারে ঢাকা ছিল।'

রানার চোখের পাতা স্থির হয়ে গেল। 'আপনি বলতে চাইছেন আগেই তিনি মারা গিয়েছিলেন?'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন কর্নেল, তাঁর পাঁশুটে রঙের ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল।

'কথা বলছেন না কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা, রাগটা এবার চেপে রাখতে পারল না। 'এটা মার্ডারও হতে পারে।'

'হ্যাঁ, পারে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না,' বললেন কর্নেল। 'হার্ট অ্যাটাক বা সেরেব্রাল হেমোরেজও তো হতে পারে, নাকি পারে না? আপনি তো পুলিশ কর্মকর্তা, দয়া করে আমাকে বলে দেবেন কীভাবে আমি জানব আসলে কী ঘটেছিল?'

রানা রীতিমত বিরক্তবোধ করছে। 'তা আপনার না জানলেও চলবে, মিস্টার যাদব। আমি যখন এখানে আছি, কী ঘটেছিল তা জানার দায়িত্ব আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'আমাকে কী তা হলে আপনি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকতে বলেন?' চাপা গলায় প্রায় গর্জে উঠল কর্নেল।

শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে রানা বলল, 'আমি আপনাকে কিছুই করতে বলি না। তবে, আপনি বা অন্য সবাই যাই করুন না কেন, সবই নোট করা হবে।'

'মানে? কী বলতে চান আপনি?' চেহারা দেখে বোঝা গেল বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেয়েছেন ভদ্রলোক।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমি একটা কেসের তদন্ত করতে এসেছি। শুনতে যেমনই লাগুক, আপনারা কেউই সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন।'

আর একটাও কথা না বলে ঘুরলেন কমান্ডার যাদব, পায়ের থপ্-থপ্ আওয়াজ তুলে নিজের হাটের দিকে ফিরে যাচ্ছেন। পারকা ঢাকা তাঁর চওড়া পিঠের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। ভদ্রলোকের আচরণ মোটেও স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি ওর।

নিজের বাঙ্কে ফিরে এসে পায়চারি শুরু করল রানা। গভীর চিন্তায় ডুবে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। এক সময় কয়েকটা উপসংহারে পৌঁছাল।

ক্যাম্প নেতাজিতে রহস্যময় অশুভ কাণ্ডকারখানা আর উটকো ঝামেলা একের পর এক ঘটেই চলেছে, এবার সেগুলোর সঙ্গে যোগ হলো—ক্যাম্পে এখন আর কোন ডাক্তার নেই।

ডাক্তার হাসানের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, এটা রানা কোনমতেই মেনে নিতে পারছে না। একজন ডাক্তার হয়ে তিনি কি নিয়মিত তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতেন না?

স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের কোন লক্ষণ থাকলে তাঁর তো আগে থেকেই তা বুঝতে পারা উচিত ছিল, আর সে-কথা কাউকে না কাউকে নিশ্চয়ই তিনি জানিয়ে রাখতেন। কিন্তু, কই, কেউ তো তেমন কিছু বলছে না।

এমন হতে পারে যে ডাক্তার হাসান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। যেভাবেই হোক সচল একটা ট্র্যাক্টরের তলায় পড়ে গিয়েছিলেন। কিংবা তিনি হয়তো আত্মহত্যা করেছেন।

এসব চিন্তা মাথায় এলেও দ্রুত আবার তা বাতিল করে দিচ্ছে রানা।

স্বাভাবিক মৃত্যু বা আত্মহত্যা নয়, ডাক্তার আরিফ হাসানকে খুন করা হয়েছে।

কোইন্সিডেন্স বা কাকতালীয় ব্যাপারটাও সেদিকে আঙুল তাক করছে। রিজার্ভ ফুয়েল স্টোর-এ ঢুকবার মুখ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে ডাক্তার হাসানের লাশ পাওয়া গেছে, যেখানে সাদা ভালুকটা ট্যাংক ছিঁড়েছিল আর ইমার্জেন্সি রেশন খেয়েছিল।

এক সকালে দোরগোড়া পরিষ্কার করতে গিয়ে সুইপার ভালুকের পায়ের ছাপ দেখতে পায়, আরেক সকালে আবিষ্কার করে ডাক্তার হাসানের লাশ। একই সুইপার নয় তো?

ট্র্যাক্টর ট্রেঞ্চে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। তবে তার আগে অন্য কাজ আছে।

নিজের হাট থেকে হসপিটালে চলে এল রানা। তালা দেওয়া নেই, ভিতরে ঢুকে আলো জ্বালল, দাঁড়াল অফিস আর থিয়েটারের মাঝখানে।

গলা চড়িয়ে কী যেন বলেছিলেন ডাক্তার হাসান? কিছু একটা দেখাতে চান ওকে...তবে এখন তিনি ব্যস্ত...পরে দেখা হবে।

থিয়েটারে ডাক্তারের সঙ্গে কি কোন রোগী ছিল? যদি থাকে, কে সে?

ডেস্কে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক পড়ে রয়েছে, তুলে পাতা ওল্টাচ্ছে রানা। খুব কম এন্ট্রি দেখা গেল, কালকের তারিখে মাত্র একটা—বিকাল সাড়ে তিনটার সময়। তারিখের নীচে লেখা— 'মুরালি মোহন: ন্যাসাল পলিপ।'

একেও প্রশ্ন করতে হবে, ভাবল রানা। তবে তার আগে জানতে হবে ডাক্তার

হাসানের ইমার্জেন্সি রেশন প্যাক নিয়ে মাইক্রোস্কোপিক এগজামিনেশনের রেজাল্টটা কোথায়। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে নমুনাগুলো নিয়ে আসেন তিনি, নিশ্চয়ই কাজ না করে ফেলে রাখবার জন্য নয়।

মাইক্রোস্কোপটা কাঠের বাক্সে ভরা, বাক্সটা পড়ে আছে একটা সাইড ওঅর্কবেঞ্চে। তবে ক্লিপে কোন স্লাইড দেখা যাচ্ছে না, যদিও ওটার পাশে বিশেষ একটা র‍্যাকে প্রচুর স্লাইড রয়েছে। যাই হোক, ওগুলোয় নম্বর দেওয়া থাকলেও, লেবেল সাঁটা নেই, কাজেই সঠিক স্লাইডটা খুঁজে বের করা রানার পক্ষে সম্ভব নয়: তা ছাড়া, খুঁজে পেলেও অর্থ উদ্ধার করবার মত জ্ঞান ওর নেই।

তবে তল্লাশি চালাবার শুরুতেই একটা জিনিস পেয়ে গেল রানা। ইমার্জেন্সি রেশনের সেই মোড়ক–ছেঁড়া প্ল্যাস্টিক আর টিনফয়েল, ডেস্কের পাশে ওয়েস্ট বাস্কেটে অবহেলার সঙ্গে ফেলে রাখা হয়েছে।

তবে আর কিছু নেই–না নোট সহ কোন প্যাড, না ওয়েস্ট বাস্কেটের তলায় পড়ে থাকা টুকরো কোন কাগজ। তারমানে কি ডাক্তার হাসান পরীক্ষা করে ওগুলোয় কিছু পাননি?

নিশ্চয়ই তাই। মন্তব্য করবার উপযোগী নয়; এমন কিছু পাওয়া যায়নি যে নোট লিখতে হবে। গোটা ব্যাপারটা নেগেটিভ।

নাকি কেউ চাইছে সবাই এই দৃষ্টিতে দেখুক ব্যাপারটা? এ কী হয়, একেবারে কিছুই পাওয়া যাবে না? ইমার্জেন্সি রেশনের প্যাক যদি কোন ভালুক ছিঁড়ে থাকে, ছেঁড়া মোড়কের টুকরোয় ওটার লালা থাকতে বাধ্য। আর সেই লালায় ব্যাকটেরিয়া না থেকে পারে না।

রানার মনে পড়ল, ডাক্তার হাসানও ঠিক এই কথাগুলোই কাল বলেছিলেন ওকে।

মোড়কের টুকরোগুলো তুলে একটা এনভেলাপে ভরল রানা, এনভেলাপটা রেখে দিল পকেটে। তারপর হসপিটাল থেকে বেরিয়ে সরাসরি ট্র্যাক্টর শেডে চলে এল।

এখানকার ইনচার্জ একজন শ্রীলঙ্কান, নাম বিশালা কালমুনাই। বিশালা আসলেও বিশাল, একটা দৈত্য বললেই হয়।

নিজের পরিচয় দিয়ে রানা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তার হাসানকে প্রথম কে দেখতে পায়?'

হাতের চুরুটটা ধরাতে গিয়ে থেমে গেল কালমুনাই। 'আমি। কেন?'

'আপনিই কি ড্রাইভ করছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আর ভালুকের পায়ের ছাপ? ওগুলো কে দেখে?'

রানার দিকে এক পা এগিয়ে এল প্রকাণ্ড দৈত্য, প্রায় আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। 'এসব আপনার জানতে চাওয়ার কারণ?'

'এইমাত্র না পরিচয় দিলাম? শোনেননি? কয়েকটা দুর্ঘটনা আর অপরাধ তদন্ত করছি আমি।'

আশা করেছিল, ধমকের সুরে কথা বললে দমে যাবে বঙ্গালি লোকটা, কিন্তু

হলো না দেখে ভারী কাঁধ দুটো একটু উঁচু করল কালমুনাই। বলল, 'পায়ের ছাপগুলো দেখেছিল আমাদেরই এক ছোকরা–মুরালি মোহন।'

'তার ন্যাসাল পলিপ আছে,' বলল রানা।

'ছিল। ডাক্তার কাল ওটা কেটে ফেলে দিয়েছেন। ওই তো, যখন আপনি ডাক্তারের খোঁজে হসপিটালে গিয়েছিলেন। মুরালির সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারে আমিও ছিলাম,' বলল কালমুনাই।

'হ্যাঁ, জানি,' বলে ঘুরল রানা, ট্রেঞ্চ শেড থেকে বেরিয়ে আসছে। পিঠে কালমুনাইয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অনুভব করল ও। ভাবল, ঠিক জায়গা মত খোঁচা দিয়ে ফেলেছি?

লাঞ্চ খেতে মেস হলে ঢুকছে রানা, কর্নেল যাদবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল–খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ওকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন, কপালে চিন্তার রেখা। 'আপনার সঙ্গে কথা আছে, মিস্টার জয়। লাঞ্চ শেষ করে আমার ওখানে চলে আসুন, প্লিজ।'

'এখনই বলতে পারেন।'

মাথা নাড়লেন কর্নেল। 'সাবসে আগে খানাপিনা। নেহি তো ইয়াহাঁ সারভাইভ কারনা মুশকিল হোগা। হাঁ!'

সকালে ওরকম একটা দৃশ্য দেখবার পর দুপুরে কারই বা খিদে থাকে, সামান্য কিছু মুখে দিয়ে উঠে পড়ল রানা।

কমান্ড হাটে ওর জন্য অপেক্ষা করছিলেন কর্নেল। ওকে নিয়ে নিজের চেম্বারে চলে এলেন তিনি, বসতে অনুরোধ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

প্রকাণ্ড মুখে ঘন কালো ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে, তবে কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট বন্ধুত্বের ভাব। 'পরিষ্কার করে, মন খুলে কথা বলুন। কী ভাবছেন?'

'সংখ্যায় এত বেশি, এগুলোকে আমি কোইন্সিডেন্স বলে মানতে রাজি নই,' সংক্ষেপে বলল রানা।

'আপনার ধারণা খুন, ষড়যন্ত্র, স্যাবটাজ···সবই ঘটছে এখানে?'

'হ্যাঁ।'

চেয়ারে হেলান দিলেন কর্নেল যাদব, ডেস্কের রুলারটা নাড়াচাড়া করছেন। হঠাৎ রানাকে বিস্মিত করে দিয়ে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি কেন আপনি এরকম ভাবছেন।'

'শুনে স্বস্তি বোধ করছি।'

'তবে আমি তা ভাবি না।'

'তাও জানি।'

'তবু গোটা ব্যাপারটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই আমি। কী ভাবছি, কেন ভাবছি–ঠিক আছে? আচ্ছা, দেখা যাক, কী কী ঘটেছে। প্রথম ব্যাপারটা কী যেন...রানওয়ের আলো?'

'না।' মাথা নাড়ল রানা। 'তার আগে আরও দুটো ঘটনা ঘটে গেছে।'

'একটা তো হেলি অ্যাক্সিডেন্ট। আরেকটা?' আবার ভুরু কোঁচকালেন কমান্ডার ভীম সিং যাদব।

'রত্নে গোপালচন্দ্র নিখোঁজ।'

চোখ বড় হয়ে গেল কমান্ডারের। 'ওটাকেও আপনি একই সুতোয় গাঁথছেন?'

'আপনি জানতে চাইলেন আলো নিভে যাওয়াটাই প্রথম ঘটনা কি না, তাই বলছি। আমি এখনও কোন যোগসূত্র খুঁজে পাইনি।'

'ওই ঘটনা দুটো সম্পর্কে আমার আগের সিদ্ধান্তে এখনও আমি অটল। কাজেই রানওয়ের আলো নেভাটাকেই এক নম্বর ধরছি আমি।'

কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আপনার মরজি।'

'শুনুন। আজ সকালে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শওকত জামিল আর দু'জন ইলেকট্রিশিয়ানকে নিয়ে কেবল্ দেখতে গিয়েছিলাম আমি। কী দেখেছি শুনবেন?'

'যদি শোনান।'

'ওগুলোকে চিবানো হয়েছে। চিন্তাও করতে পারবেন না ক'জায়গায়। কম করেও চল্লিশ জায়গায়! বেজন্মা শেয়ালগুলোর কাজ। শর্ট সার্কিট না হয়ে যায়? ফলে প্রয়োজনের সময় নিভে গেল আলো। ওই কেবল্ ছ'মাস পরপর বদলাতে হয় আমাদের। আাপনি সন্তুষ্ট?'

'না। কী করে সন্তুষ্ট হব? শর্ট সার্কিট হলো ঠিক যখন প্লেনটা ল্যান্ড করতে যাচ্ছে। শেয়ালগুলো কী করে জানল যে, প্লেনে আপনি ছিলেন, আর ছিলেন জাভেদ হাশমি?'

'হ্যাঁ। তা বটে। তবে তিন হপ্তার ভেতর ওটাই প্রথম প্লেন ছিল, ঠিক আছে? রানওয়ের আলো জ্বলল তিন হপ্তা পর।'

রানা বলল, 'কিন্তু জ্বলল ঠিকই, তাতে কোন সমস্যা হয়নি। নিভল কখন? ঠিক যখন নামতে যাচ্ছি আমরা। ভুলে যাবেন না, প্লেনটায় বাংলাদেশ স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন ডিআইজিও ছিলেন। অপরাধীর হয়তো জানা ছিল কেন আমি আসছি।'

'আলোটা ঠিক ওই সময় নিভল বলেই তো আমি নিজে কেবল্ পরীক্ষা করতে যাই। আপনার হয়তো মনে হচ্ছে সব কিছু আমি ধবধবে সাদা দেখছি। আসলে তা ঠিক নয়। কিন্তু কেবলে দাঁতের দাগ আর মরা একটা শেয়াল দেখতে পেলে কী ভাবা উচিত আপনিই বলুন।'

'পেয়েছেন?'

'অবশ্যই। আমরা সবাই দেখলাম, তারের পাশে পড়ে রয়েছে। বুঝতে পারছেন তো, মিস্টার জয়?'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'পরবর্তী সমস্যা ডিজেল জেনারেটর, ঠিক?'

'হুঁ।'

'স্বভাবতই আপনি প্রশ্ন করবেন, ফুয়েল দূষিত হলো কীভাবে? দুঃখিত, আমার কাছে এ প্রশ্নের জবাব নেই।'

'তবে একটা কিন্তু আছে?' কণ্ঠস্বরে তিক্ততা চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো রানা।

জোরেই শুরু করেছিলেন, রানার দিকে চোখ পড়তে হাসির ভলিউমটা তাড়াতাড়ি কমিয়ে আনলেন কমান্ডার যাদব। 'আলবত আছে! তা হলে শুনুন

থিউলে ফুয়েল আসে ট্যাংকারে করে। পাম্প করে স্টোরেজ ট্যাংকে তোলা হয়। এখানে নিয়ে আসবার জন্যেও আবার পাম্প করে নিয়োপ্রিনে তোলা হয়। তারপর, এখানে এনে স্টোর করা হয়, তাও নিয়োপ্রিনে।

'কথা হলো, পাম্পিঙে ব্যবহার করা হয় রাবার পাইপ, আর এই রাবার পাইপ বেশি ঠাণ্ডায় নিরেট হয়ে ফেটে যেতে পারে। পাইপের ভেতরের গা থেকে ছিলকা উঠে ফুয়েলে মেশে। চলতি-কা-নাম-গাড়ি টেনে আনে যে ট্র্যাক্টর, ওগুলোর বেলাতেও এটা ঘটে। অনেক উটকো ঝামেলার একটা, কারও কিচ্ছুটি করার নেই,' বলে শ্রাগ করলেন কর্নেল।

'মরা শেয়ালের মত বিশ্বাসযোগ্য হলো না।'

'কিন্তু ফ্যাক্টস কী বলে দেখুন, মিস্টার হোমস। এরকম থিউলে, বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে, ওখান থেকে আসার পথে আর এখানে–একবার নয়, কয়েকবার করে ঘটেছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আর রিয়্যাক্টরে কয়েন?'

'অবহেলা। মিস্টার হাশমি তাই বলেছেন, আমি তা বিশ্বাসও করেছি। এরকম সমস্যা আগেও হয়েছে, তাই বিশ্বাস করেছি, ব্যাপারটা তা নয়। আসলে অবহেলা বা মনোযোগের অভাব এখানে স্বাভাবিক। এখন আপনিও তিন কি চারদিন আগের মানুষ নন। আমিও নই। অলটিচিউড প্রভাব ফেলছে, প্রভাব ফেলছে ক্লসট্রফোবিয়া। বাথরুমে যাবার সময়ও ভারী কাপড়চোপড় পরতে ভাল লাগছে না আপনার।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এটা প্রয়োজন, গুরুত্বটা বুঝতে অন্তত আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না।'

'ঠিক আছে,' বললেন কর্নেল। 'কিন্তু আপনি পছন্দ করেন না। এত সব পরতে না হলে খুশি হতেন। এরকম এক লাখ বিষয় আছে। গামলা ভরে খাচ্ছি, অথচ ঠিকমত ব্যায়াম করা হচ্ছে না। সূর্য নেই, নড়াচড়ার জায়গার অভাব, প্রাইভেসি না থাকার মত। কেউ আমরা যথেষ্ট পানি খাচ্ছি না, ডিহাইড্রেশন সারাক্ষণ একটা সমস্যা, দুধ খাওয়ার কথা মনে থাকে না।

'কত বলব? এখানে রাত আর দিনের দৃষ্টিগ্রাহ্য কোন পার্থক্য নেই। নানাভাবে টেস্ট করে দেখা হয়েছে। ডাক্তার, সাইকিয়াট্রিস্ট, বিজ্ঞানী আর যোগ্য সব মানুষকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। জানেন টেস্টের রেজাল্ট থেকে কি জানা গেছে?'

'এ তো জানা কথা যে এখানে মানুষের দক্ষতা কমে যাবে,' বলল রানা।

'হ্যাঁ। তাদের দক্ষতা অর্ধেকে নেমে আসে। অর্ধেকে! কারুরই এ-থেকে রেহাই নেই–অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার, ভিজিটিং সায়েন্টিস্ট বা তদন্তকারী পুলিশ অফিসার। আপনিও, মিস্টার জয়, এই মুহূর্তে মোটামুটি শতকরা মাত্র পঞ্চাশ ভাগ স্বাভাবিক। দাঁড়ান, আপনাকে দুটো উদাহরণ দিই। গত শীতে আইস মুভমেন্টের ওপর কাজ করার জন্যে একজন গ্লেসিয়ার স্পেশালিস্ট এসেছিলেন। তিনি আবার খুব ভাল দাবাও খেলতেন।

'এক রাতে অফিসার্স ক্লাবে বসে খেলছেন ভদ্রলোক, হঠাৎ করে দেখা গেল

ভুল-ভাল চাল দিচ্ছেন তিনি। তাঁর ঘোড়া চলছে নৌকার মত, রাজা নকল করছে মন্ত্রীর আচরণ। কী ব্যাপার? কার কী কাজ স্রেফ ভুলে গেছেন ভদ্রলোক। কী এটা, মিস্টার জয়?

'আরেকজনের কথা বলি। ভদ্রলোক আমাদের এখানকার একজন অফিসার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। এখানে আসার মাত্র ছয় হপ্তা পরই যোগ অঙ্ক করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন। দুয়ে দুয়ে চার, এটা তিনি পারেন; কাগজ-পেন্সিল খোঁজেন আটান্ন আর সাঁইত্রিশ যোগ করার সময়।

'রিয়্যাক্টর কেটলিতে কয়েনগুলো স্রেফ নিউসেন্স। যদি জানতাম কার কাজ, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতাম ক্যাম্প থেকে। কিন্তু এসব এখানে ঘটবেই, মেনে না নিয়ে উপায় নেই আমার। 'হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিলেন কর্নেল।

'আপনার ব্যাখ্যা অনুসারে হেলিকপ্টার অ্যাক্সিডেন্টটাও তা হলে ওরকম একটা ভুলের খেসারত? আর সারফেসে গোপালচন্দ্র হারিয়ে গেছে সাময়িক স্মৃতিভ্রংশের কারণে?'

বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কমান্ডার যাদব। সতর্ক দৃষ্টিতে দেখলেন রানাকে। 'ঠিক আছে। আমার কাছে কোন ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু! এখানে আমরা পাঁচ বছর অপারেশন চালাচ্ছি। ওটাই ছিল প্রথম এয়ার ক্র্যাশ। একমাত্র। আগে বা পরে এ ঘটতই। এভাবে চিন্তা করলে আমি অসুস্থ বোধ করি, কিন্তু পরিসংখ্যান বলছিল··· আসছে।

'সারফেসে নিখোঁজ ছেলেটারও এই একই ব্যাপার। আমরা এখানে কমবেশি একশো পঞ্চাশজন আছি। কাজ করছি দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ আবহাওয়ায়। এটা তো মিরাকল যে আরও আগে দু'একজন হারিয়ে যায়নি। এই যুক্তি আপনি মানেন?'

কর্নেলের কথায় একেবারে যে যুক্তি নেই তা নয়, তবু সায় দিতে ইতস্তত করল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'আর ডাক্তার হাসান?'

'ডাক্তার আরিফ হাসানের মৃত্যুও,' ক্যাম্প কমান্ডার বললেন, 'আমার কাছে একটা রহস্য। কেন তিনি মারা গেলেন, কীভাবে মারা গেলেন, আমি জানি না।'

'কিন্তু জানি না বলে তো আর আপনি দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। মৃত্যুর কারণ জানতে হলে লাশের পোস্টমর্টেম করতে হবে। তার ব্যবস্থা করুন।'

'একজন প্যাথলজিস্ট ছাড়া কী করে তা সম্ভব, আপনিই বলুন? হয় তাকে থিউল থেকে আনাতে হবে, কিংবা লাশটা ওখানে পাঠিয়ে দিতে হবে। তার আগে পর্যন্ত ভদ্রলোকের মৃত্যু নিয়ে ভাল-মন্দ কিছু বলা উচিত হবে না।'

'আমার হবে,' বলল রানা। 'কারণ আমি এখানে এসেছিই অপরাধ তদন্ত করতে। ডাক্তার হাসানের মৃত্যু স্বাভাবিক, এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আমার দৃষ্টিতে তিনি খুন হয়েছেন।'

রেগেমেগে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে রাখলেন কর্নেল।

'ডাক্তার হাসানকে কেউ অপছন্দ করত?' জানতে চাইল রানা। 'মানে তাঁর কোন শত্রু ছিল কিনা জানেন?'

'নাহ্! পুরোপুরি আত্মনির্ভরশীল একজন মানুষ ছিলেন। কাজ থাকলে হসপিটাল থেকে বেরুতেন না। দাবা খেলতেন, মিউজিক ভালবাসতেন। গুটিয়ে থাকতেন নিজের ভেতর। ভাল একজন মানুষ। ভাল একজন ডাক্তার।' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন কর্নেল। 'কীভাবে চলে গেলেন!'

'ঠিক আছে, আমি এখন আসি,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা।

'উঁহুঁ, আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন।' শরীরটা প্রকাণ্ড হওয়া সত্ত্বেও প্রায় লাফ দিয়ে সিধে হলেন কর্নেল। 'আপনাকে একটা জিনিস দেখাব।'

পারকা আর ওভার-ট্রাউজার পরল ওরা। তারপর মেইন স্ট্রিট ধরে চলে এল কিচেনে। সরাসরি একজন কুকের দিকে এগোলেন কমান্ডার। 'আমি একটা বিফস্টেক চাই।'

দাঁত দিয়ে জিভ কেটে কুক বলল, 'কর্নেল, সার, আমাকে চিনতে আপনার ভুল হচ্ছে। আমি তো শুধু হিন্দুদের রান্না রাঁধি।'

'ও।' হেসে উঠলেন কমান্ডার। তারপর দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'ঠিক হ্যায়, তা হলে মাটন চপ দাও।' কুকের পিছু নিয়ে চলে গেলেন তিনি।

হাতে কুকিং টং নিয়ে ফিরে এলেন একটু পরই, সেটার মাথায় আটকান মাটন চপ। 'চলুন, মিস্টার জয়। গ্লাভ পরে নিন, ওপরে তুলে টাইট করুন পারকা হুড।'

ট্রেঞ্চ ধরে ইস্কেপ হ্যাচের দিকে এগোল ওরা, পেঁচান ধাতব সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। ঠেলে হ্যাচকাভারের বোল্ট সরালেন কর্নেল, তারপর ওটাকে উপরে তুলবার জন্য হাতল ঘোরালেন।

ঢাকনি খুলে যেতেই ওদের ওপর সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাতাস আর তুষার। রানার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠলেন কর্নেল, 'বাতাস ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল। টেম্পারেচার শূন্যাংকের পনেরো ডিগ্রি নীচে। বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবেন।'

আইসক্যাপে উঠে গেলেন কর্নেল, তাঁর ঠিক পিছনে রয়েছে রানা।

পাশাপাশি দাঁড়াল ওরা, আর্কটিক বাতাসের দিকে পিছন ফিরে, পারকার কাপড়ে জমাট বাঁধা শক্ত তুষারের অবিরাম আছড়ে পড়া অনুভব করছে।

টংটা উঁচু করে ধরলেন ভীম সিং যাদব, হাতটাকে সাবধানে কাঁধের আড়ালে রেখেছেন, মাটন চপ বাতাসে বেরিয়ে আছে। কথাগুলো হুঙ্কারের মত বেরিয়ে এল তাঁর গলা থেকে, 'সেকেন্ড গুনুন। এক...দুই...তিন...'

একযোগে চেঁচাচ্ছে ওরা। ত্রিশ পর্যন্ত গোনার পর রানা অনুভব করল, ফেল্ট বুট পরে থাকা সত্ত্বেও ওর গোড়ালিতে পৌঁছে যাচ্ছে ঠাণ্ডা। পঞ্চাশে দেখা গেল গোটা পা ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। ষাট উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে খালি হাতটা ঝাপটে রানাকে হ্যাচ কাভারটা দেখিয়ে দিলেন কর্নেল।

রানার পিছু নিয়ে নামলেন তিনি, হাতলটা আবার ঘুরিয়ে হ্যাচ কাভার বন্ধ করলেন। তুষার আর বাতাসের গর্জন চাপা পড়ে গেল।

মাটন চপটা রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন কর্নেল। জমে শক্ত হয়ে গেছে ওটা। 'এই পরিবেশে বেঁচে আছি আমরা,' বললেন তিনি। 'কথাটা আপনাকে আমি মনে রাখতে অনুরোধ করি। এটা অনেক কিছু ব্যাখ্যা করে।'

*

ট্রেঞ্চ ধরে একা হাঁটছে রানা, গন্তব্য রেডিও রুম।

উপরে উঠবার পর হ্যাচ-কাভার থেকে মাত্র ছয় ফুট দূরে গিয়েছিল ওরা। খাসির মাংসের ফালিটা এক ইঞ্চি পুরু ছিল, ষাট সেকেন্ডের মধ্যে তক্তার মত শক্ত হয়ে গেছে।

কী ভয়ঙ্কর বৈরি একটা আবহাওয়াকে চ্যালেঞ্জ করে ক্যাম্প নেতাজি এখানে টিকে আছে তার একটা নমুনা পাওয়া গেল।

আজও থিউল থেকে রানার কোন মেসেজ আসেনি। ডিউটিতে আজ শুধু একা কুমারাতুঙ্গাকে নয়, তার সঙ্গে কমিউনিকেশন এক্সপার্ট রত্নে উপলচন্দ্রকেও পাওয়া গেল। ওরা জানাল, আজ সকালে চলতি-কা-নাম-গাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে।

স্নো ট্রেনের খবর ভালোই, আবার রওনা হতে পেরেছে তারা। তবে হোয়াইটআউট আর বড় আকারের দুটো ফাটলে বাধা পাওয়ায় মাত্র ত্রিশ মাইল এগোতে পেরেছে, অর্থাৎ এখনও সত্তর মাইল পাড়ি দিতে হবে।

উপল জানাল, 'ওটার পৌঁছাতে আরও বেশ ক'টা দিন লাগবে বলে মনে হচ্ছে, অথচ এদিকে তো বড়ে মিয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন আমাদের কমান্ডার।'

ওখান থেকে ট্র্যাক্টর শেডে চলে এল রানা। দু'জন মেকানিককে নিয়ে একটা হাফ-ট্রাকের ক্যাটারপিলার পরীক্ষা করছে বিশালা কালমুনাই।

ওকে দেখে হাতের কাজ ফেলে ধীরে ধীরে সিধে হলো দৈত্যটা। 'বলুন কী জানতে চান?' জিজ্ঞেস করল সে, অনেকটা চ্যালেঞ্জের সুরে।

'শেডটা আমি একবার সার্চ করব,' বলল রানা।

'করুন, কেউ আপনাকে বাধা দিচ্ছে না,' কথাটা বলবার সময় মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল বিশালা কালমুনাই।

হাসল রানা, বলল, 'বাধা দিলেও আমি মানতাম না। এসেছি অফিসের ডুপ্লিকেট চাবিটা নিতে, যখন খুশি এসে যাতে বসতে পারি।'

'অফিস খোলা আছে, ডেস্কের দেরাজ থেকে বের করে নিন,' বলে নিজের কাজে ফিরে গেল কালমুনাই।

দেরাজ থেকে চাবিটা নিল রানা। তল্লাশির কাজটা অফিস থেকেই শুরু করল। কী খুঁজছে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই, তবে জানে দেখলে চিনতে পারবে।

অফিসে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। ওখান থেকে বেরিয়ে এসে কয়েকটা ট্র্যাক্টর, পোলক্যাট আর ক্যাটারপিলার লাগানো হাফ-ট্রাক সার্চ করল।

কাজের মধ্যেও বিশালা কালমুনাইয়ের দিকে একটা চোখ রেখেছে রানা। একা শুধু সে নয়, তার কয়েকজন সঙ্গীও চোরা দৃষ্টিতে ওর প্রতিটি নড়াচড়া অনুসরণ করছে।

শুধু সময় নষ্ট, তল্লাশি চালিয়ে কিছুই পাওয়া গেল না।

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চের দিকে হাঁটছে রানা। জাভেদ হাশমি আজ ওকে যেতে বলেছেন

ভিতরে ঢুকল রানা, মুখগুলোর উপর চোখ পড়তেই বুঝতে পারল খারাপ

কিছু একটা ঘটেছে।

একজন টেকনিশিয়ান এগিয়ে এসে ওর হাতে একটা রেডিয়েশন ব্যাজ ধরিয়ে দিল, যান্ত্রিক পুতুলের মত আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পিন দিয়ে নিজের কাঁধে সেটা আটকাল রানা। ব্যাজটার ভিতর খানিকটা ফিল্ম আছে, তাতে রেডিয়েশন এক্সপোজার রেকর্ড হয়, ডেভলপ করবার পর বোঝা যায় পরিমাণে জিনিসটা বেশি হয়ে গেছে কিনা। ততক্ষণে একটু দেরি হয়ে যাবে বটে, তবে দুনিয়ার সবখানে এই নিয়মই চলছে।

'আমার সন্দেহ,' ইঞ্জিনিয়ার হাশমিকে বলল রানা, 'আবার আমি অসময়ে চলে এসেছি।'

হাশমি হতাশকণ্ঠে বললেন, 'কিয়া বাতাউঁ!'

'এমন কিছু, যা আমি বুঝব।'

'শিওর,' বললেন হাশমি। 'যে-কেউ বুঝবে। কিন্তু বোধগম্য হচ্ছে না কী কারণে এটা ঘটল।'

'এখনও গো ক্রিটিক্যাল পর্যায় শুরু করা যাচ্ছে না?'

'আরে ভাই, আমাদেরকে একেবারে অচল করে দিয়েছে। কেটলিতে আমাদের পরিষ্কার পানি থাকা দরকার। পরিষ্কার মানে পুরোপুরি পরিষ্কার। সাধারণ ইন্সটলেশনে আমরা ডিস্টিলড্ ওয়াটার ব্যবহার করি। এখানে তার দরকার হয় না, কেননা কুয়ার পানি সম্পূর্ণ নির্ভেজাল। বিশ্বাস করুন, তিনশো বছর আগের তুষার গলা পানির চেয়ে পরিষ্কার আর কিছু নেই। ব্যাপারটা টেস্ট করে দেখা হয়েছে। এখানে আমরা ওই পানি বছরের পর বছর ব্যবহারও করছি।'

'এখন পানিটা পরিষ্কার নয়?'

সাবধানে মাথা নাড়লেন হাশমি। 'জানেন, আমি ভাবছিলাম টেস্ট করার দরকার নেই? জানাই তো আছে বিশুদ্ধ! কিন্তু কিতাবে লেখা আছে টেস্ট করো, তাই আমরা টেস্ট করলাম। কী রেজাল্ট পেলাম? পানি দূষিত।'

'কী থেকে?'

'জানি না। খুব ছোট, তবে আছে। মাইক্রোস্কোপে দেখা যায়। তারমানে বিরাট একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি আমরা। কেটলি থেকে সমস্ত পানি ফেলে দিতে হবে, কেটলি ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে, তারপর আবার নতুন করে ভালো পানি ভরতে হবে।'

'তাহলে তো খুবই মুশকিলে পড়ে গেলেন...

'কী ধরনের মুশকিল, না শুনলে বুঝবেন না। প্রথম কথা, কাজটা যে এখনই করা যাবে, তা নয়। তার আগে জানতে হবে পানিটা কীভাবে, কোত্থেকে দূষিত হচ্ছে। কোথাও থেকে কিছু একটা ঢুকছে পাইপে। আর তা না হলে...' বাক্যটা হাশমি শেষ করলেন না, তবে বোঝা গেল কী বলতে চাইছেন।

হয় পাইপে কিছু ঢুকেছে, তা না হলে কুয়াটাই দূষিত হয়ে পড়েছে।

সাত

রানা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কর্নেল যাদব জানেন কিনা, তবে তার দরকার হলো না।

দরজা খুলে গেল, থপ্-থপ্ শব্দ তুলে ভিতরে ঢুকলেন ক্যাম্প কমান্ডার। ওদের দিকে হেঁটে আসবার সময় খপ্ করে একটা রেডিয়েশন ব্যাজ তুলে নিয়ে পিন দিয়ে কাঁধে আটকালেন। সরাসরি হাশমির সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। 'আপনি নিশ্চিত?'

'নিশ্চিত, মিস্টার যাদব।'

'বারবার টেস্ট করেছেন?'

'তিনবার। তিনটে স্যাম্পল। জিনিসটা যাই হোক, খুব ছোট–তবে আছে।'

কর্নেল বললেন, 'হয় পাইপ, নয়তো কুয়া।'

'নিশ্চয়ই তাই।'

'ঠিক আছে। স্টপকক স্যাম্পল একেবারে সেই কুয়ার মাথা থেকে নিয়ে আসব আমরা, দেখি কোত্থেকে ঢুকছে জানা যায় কিনা।'

হাশমি বললেন, 'কিন্তু কুয়াটা? ওটাও দূষিত হয়ে থাকতে পারে, মিস্টার যাদব।'

'জানি, মিস্টার হাশমি। তবে একান্ত বাধ্য না হলে কুয়ার নীচে আমি কাউকে নামতে বলতে পারি না। আপনার লোকজন স্যাম্পল নিয়ে আসতে পারবে?'

'ওরা নিয়ে এলেই ভালো হয়।'

'গুড, চলুন তাহলে শুরু করা যাক।' রানার দিকে ফিরলেন কর্নেল। 'ব্যাপারটা কী বলুন তো, যেখানে দুর্ঘটনা সেখানেই আপনাকে দেখা যায় কেন?'

তাঁর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'আপনি জানলেন কীভাবে এটা দুর্ঘটনা?'

'জানি না, আশা করছি। ঠিক আছে, আপনি বরং এখানে অপেক্ষা...'

মাথা নেড়ে কর্নেলকে থামিয়ে দিল রানা। 'খুঁটিনাটি সবই দেখতে হবে আমাকে,' বলে তাঁকে পাশ কাটিয়ে হাশমির পিছু নিল ও।

হাশমির কাছে প্ল্যাস্টিকের একটা প্যাক রয়েছে। সবচেয়ে কাছের স্টপককটা রিয়্যাক্টর শেড থেকে সামান্য দূরে। ওটা অন করতে দ্রুতবেগে বেরিয়ে এল পানির ধারা। প্যাক খুলে এক প্রস্থ প্ল্যাস্টিক টিউবিং আর একটা বোতল বের করলেন হাশমি। ড্রেন ট্যাপ-এর মুখে টিউবের শেষ প্রান্তটা ধরলেন, অপেক্ষা করলেন পানির ধারা সেটার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত না হওয়া পর্যন্ত, তারপর বোতলটা ভরলেন।

কাজটা শেষ হতে প্ল্যাস্টিক মোড়ক খুলে একটা গ্লাস স্টপার বের করলেন হাশমি, বোতলটা সিল করলেন সেটা দিয়ে, তারপর একটা প্ল্যাস্টিক ব্যাগে রেখে

দিলেন।

'গোটা ব্যাপারটা জীবাণু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত,' বললেন তিনি। 'ধুলোবালি কিচ্ছু নেই। ক্লিন স্টেরাইল।' পারকার পকেটে হাত ভরে কলম বের করলেন, বোতলের গায়ে সাঁটা লেবেলে একটা সংখ্যা লিখলেন।

আবার সবাই রিয়্যাক্টর শেডে ফিরে এল। স্যাম্পলটা হাশমি ইলেকট্রনিক টেস্টিং মেশিনে ভরলেন। একটু পরই বললেন, 'ওই দেখুন।' টেস্টিং মেশিনের আলো মিটমিট করছে।

এক এক করে ফিরে আসছে টেকনিশিয়ানরা, প্রত্যেকের হাতে একটা বা দুটো করে বোতল। প্রতিটি বোতল টেস্ট করা হলো, প্রতিবার দূষিত বলে সনাক্ত করল মেশিন।

অনড় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল যাদব, ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসা।

অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁর দিকে ফিরলেন হাশমি। 'দুঃখিত, কর্নেল। কুয়াটাই। এ না হয়েই যায় না। কেউ কিছু ফেলেছে ওটায়।'

কর্নেল বললেন, 'কুয়ার কাছে কেউ যায় না। যাওয়া নিষেধ।'

'ভুল হলো,' বলল রানা। 'আমি গিয়েছিলাম।'

'তাতে আমার অনুমোদন ছিল। তাছাড়া, সঙ্গে লোকও ছিল। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, মিস্টার হাবিব নিশ্চয়ই আপনাকে কুয়ার ভেতর কিছু ফেলতে দেননি।'

'ইচ্ছা করলে তাঁর চোখকে ফাঁকি দিয়ে ফেলতে পারতাম, তবে চেষ্টা করিনি।'

'এটা কৌতুক করার সময় না,' বলে ওয়াল মাইকের দিকে হেঁটে গেলেন কর্নেল। সুইচ টিপে শুরু করলেন তিনি। ওরা সবাই লাউডস্পিকার থেকে বেরিয়ে আসা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

'কমান্ডার বলছি। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, কুয়ার ভেতর নামার জন্যে আবার আমাদের একজন স্বেচ্ছাসেবক দরকার। যাঁরা নামতে চান তাঁরা মেইন স্ট্রিটে চলে যান—ওয়েল ট্রেঞ্চে ঢোকার মুখে—এখন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

হাশমি বললেন, 'দেখবেন, কর্নেল, একদিন কেউই এ-কাজে স্বেচ্ছাসেবক হতে চাইবে না। ওখানে কাউকে নামতে বলা প্রায় একটা অন্যায় হয়ে যায়। কুয়ার পরিস্থিতি দিনে দিনে আরও খারাপ হচ্ছে। তখন কী করবেন আপনি? হুকুম খাটিয়ে নামতে বাধ্য করবেন কাউকে?'

'না,' কর্নেল যাদব বললেন। 'ওই গর্তে আমি কাউকে নামতে বাধ্য করতে পারি না। সেরকম পরিস্থিতি দেখা দিলে, আমি নিজে নামব।'

ট্রেঞ্চ এন্ট্রান্সের কাছে চারজন লোক অপেক্ষা করছে। তাদের উপর চোখ বুলিয়ে প্রশংসাসূচক ভঙ্গিতে মাথাটা একবার ঝাঁকালেন কর্নেল।

চারজনের মধ্যে দু'জনকে চেনে রানা। একজন হলো সেই দৈত্য, ট্র্যাক্টর শেডের ইনচার্জ বিশালা কালমুনাই। আরেকজন প্রয়াত ডক্টর ওসমান ফারুকের

অ্যাসিস্ট্যান্ট, ব্যাকটেরিয়লজিস্ট হারুন হাবিব।

বাকি দু'জনকে আগে কখনও দেখেনি রানা। দু'জনেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোক–সাধারণ সিপাই। একজনের বয়স খুবই কম।

তাদেরকে আরেকবার দেখে নিয়ে কর্নেল জানতে চাইলেন, 'কীভাবে ব্যাপারটা ফয়সালা হবে? কাঠি টেনে?'

দৈত্য কালমুনাই বলল, 'আমার, সার, অনেকদিনের ইচ্ছে কুয়াটা দেখব।'

'আমারও!' তাড়াতাড়ি বলল কম বয়েসী সিপাই।

হাবিব হাসছে। 'আমি বলি?'

'গো অ্যাহেড,' মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল।

'বাঙালীরা ভীতু, কেউ একজন এ-ধরনের একটা কথা বলায় আমার সার, ডক্টর ওসমান ফারুক খুব আহত হয়েছিলেন। আমাকে তিনি নির্দেশ দেন, অভিযোগটা মিথ্যে প্রমাণ করে আমি যেন কুয়ার তলা থেকে বিশুদ্ধ পানি তুলে আনি।'

'এ ঘটনা সবাই আমরা জানি, মিস্টার হাবিব,' বললেন কর্নেল। 'কুয়া থেকে পানি আপনি তুলেওছেন...'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে হারুন বলল, 'একবার নয়, দু'বার। তাই বলছি, কীভাবে নামতে হবে আমি জানি। পথটাও আমার চেনা, মিস্টার যাদব।'

তরুণ সিপাইয়ের দিকে তাকালেন কর্নেল। 'তোমার বয়স কত, কিরণ?'

'আঠারো, সার।'

'যাও, নিজের কাজে ফিরে যাও।'

'কিন্তু, সার–?'

'এখানে তোমাকে অমর্যাদা করা হচ্ছে না, বাছা। তবে ফিরে যাও।'

স্যালুট করে ফিরে গেল ছেলেটা–কিছুটা হতাশা বোধ করছে, আবার একই সঙ্গে কিছুটা স্বস্তিও।

'তুমিও, গোবিন্দা, ফিরে যাও,' নির্দেশ দিলেন ক্যাম্প কমান্ডার। 'এটা আর একটু বড় মানুষের কাজ।'

'ইয়েস, সার।'

বাকি থাকল কালমুনাই আর হারুন।

কর্নেল বললেন, 'মিস্টার বিশালা, মোটর শেডের দায়িত্ব নেয়ার মত আর কে আছে ওখানে?'

'দু'একজনকে অবশ্যই পাওয়া যাবে, মিস্টার যাদব।'

'যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া, এমনিতেও, অতিরিক্ত মোটা আপনি। গর্তগুলোর ভেতর দিয়ে গলবেন না।' ঘাড় ফেরালেন কর্নেল। 'দেখে মনে হচ্ছে, মিস্টার হাবিব, আপনার কপালই আবার পুড়ল। দুঃখিত।'

মাথা ঝাঁকাল হারুন, তার মুখের পেশি টান-টান।

'আপনি কি আপনার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে চান? এখনও সময় আছে

'আপনারা যাতে বাঙালীকে ভীতু বলার সুযোগ পান?' মাথা নেড়ে হাসল হারুন।

তার পিঠ চাপড়ে দিলেন কর্নেল। 'আপনি চলে গেলে, মিস্টার হাবিব, সবাই আমরা মিস করব আপনাকে। ঠিক আছে, কাজ শুরু হোক।'

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শওকত জামিল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করলেন ভদ্রলোক। বাথ রুমে ছিলেন তিনি।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে কুয়ার কাছাকাছি এমন একটা জায়গায় পজিশন নিল রানা, যেখান থেকে উপস্থিত লোকজন আর প্রবেশপথের উপর সহজেই নজর রাখা যায়। কিছু যদি ঘটতে দেখে, বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে; আর যদি একান্তই বাধা দেওয়া সম্ভব না হয়, ঘটনাটার সাক্ষী হতে চায় ও, কেউ যাতে স্যাবটাজকে দুর্ঘটনা বলে চালাতে না পারে।

মাথায় একটা ক্যাপ পরল হারুন, ক্যাপের ইয়ারফ্ল্যাপ চিবুকের নীচে আটকাল, তারপর কুয়ার উপর ঝুলে থাকা স্টিল ফ্রেমওঅর্ক থেকে সিট বা চেয়ারটা টেনে এনে চড়ে বসল. স্ট্র্যাপ দিয়ে ওটার সঙ্গে বাঁধল নিজেকে। 'আমি রেডি, মিস্টার জামিল।' তার মুখের হাসি ধীরে ধীরে ম্লান হতে শুরু করেছে।

ইঞ্জিনিয়ার জামিল তার হাতে একটা ল্যাম্প আর একটা ওয়াটার টেস্ট প্যাক ধরিয়ে দিলেন।

'তো ভাইয়োঁ,' বললেন কর্নেল, 'শুরু কিয়া যায়ে!'

ইঞ্জিনিয়ার জামিল একটা লিভার সরালেন, সেই সঙ্গে টান টান হলো রশি, চেয়ারসহ মেঝে থেকে শূন্যে উঠে পড়ল হারুন। পা লম্বা করে করোগেটেড স্টিল ব্যারিয়ারের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াল সে। হাসিটা এখন আর মুখে ধরে রাখতে পারছে না।

ক্রমশ আরও উঁচু হলো চেয়ারটা, দোল খাচ্ছে। কর্নেল আর ইঞ্জিনিয়ার হাত তুলে ধরে স্থির করলেন সেটাকে। জামিল জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, মিস্টার হাবিব, আরাম বোধ করছেন তো?'

'আই য়্যাম ফাইন, মিস্টার জামিল।'

আবার যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলল ইলেকট্রিক মোটর, চেয়ারটা ধীরে ধীরে গর্তমুখের মাঝখানে চলে এল।

তারপর ভিতরে নামতে শুরু করল। একসময় শুধু হারুনের মাথাটা দেখতে পেল ওরা।

'বিশ ফুটে ওয়াকি-টকি চেক করব আমরা,' হারুনকে জানালেন জামিল। 'খোদা হাফেজ।'

দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল হারুনের মাথা। রিল থেকে ধীরে ধীরে খুলছে স্টিল কেবল্। রানা লক্ষ করল, কেবলটা এক গজ পর পর মার্ক করা। সেদিকে একটা চোখ রেখে নিঃশব্দে গুণছে ও।

মোটর আবার থেমে গেল। ছোট একটা রেডিও সেট অন করে জামিল জানতে চাইলেন, 'ঠিক আছে সব?'

হারুনের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'নামাতে থাকুন, মিস্টার জামিল।' মোটর জ্যান্ত হতেই আবার সচল হলো কেবল্।

কুয়ার একেবারে কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালেন কর্নেল। উঁকি দিয়ে নীচেটা

দেখবার চেষ্টা করছেন।

'মিস্টার যাদব, সাবধান!' হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ইঞ্জিনিয়ার জামিল। ওই কেবলে যেন হাত না লাগে!'

'জানি,' কুয়ার কিনারা থেকে সরে এসে বললেন কর্নেল। 'সাপ!'

কেবলটাকে ভয় পাওয়ার কারণ হলো, খাড়াভাবে ওটার স্থির থাকবার উপরই হারুনের নিরাপত্তা নির্ভর করছে। ওটা যদি দোল খায়, এমনকী সামান্যও, সেই দোলা নীচের দিকে বহুগুণ বেড়ে যাবে–ওখানে পেন্ডুলামের মত ঝুলছে হারুন, আর প্রকাণ্ড আকারের বরফের ঝুরিগুলো ঝুলছে তার শরীর থেকে মাত্র তিন ফুট দূরে।

'বাহাদুর আদমি, নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট,' গম্ভীর সুরে বললেন কমান্ডার যাদব। 'মুখে বলেছি বটে, তবে ওখানে আমাকে নামতে হলে সত্যি আমার কান্না পাবে।' রানা কুয়ার আরও কাছে এগিয়ে আসছে দেখে চোখ পাকালেন। 'সাবধান, মিস্টার জয়!'

কুয়ার পাশ থেকে সাবধানেই নীচে উঁকি দিল রানা। ইতিমধ্যে পঁচিশ পর্যন্ত গুণেছে ও। ঝলমলে শুভ্রতার ভিতর, পঁচাত্তর ফুট নীচে, হারিয়ে যাচ্ছে হারুন। প্রথম চেম্বারের কমবেশি মাত্র অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছে সে।

কর্নেল বললেন, 'নীচে ঠিক এরকমই আরেকটা গর্ত আছে, তার নীচে আরেকটা। বর্ণনাটা এই জন্যে দিচ্ছি, কারও যেন বুঝতে ভুল না হয় ওখানে নামতে হলে কী ধরনের সাহসের দরকার।'

ওয়াকি-টকি থেকে হারুনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'কী জ্বালাতন! আমার কাশি পাচ্ছে।'

'চেপে রাখুন!' ইঞ্জিনিয়ারের কণ্ঠে একাধারে ধমক আর মিনতি। 'যতক্ষণ না দ্বিতীয় চেম্বারের গলার কাছে পৌঁছান।'

হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল রানার, তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব মনে থাকায় ঢোক গিলে বিদায় করে দিল ঝোঁকটাকে।

'সেটাই তো...' হারুনের গলার ভিতর কথা বেধে যাচ্ছে। কল্পনার চোখে রানা দেখতে পেল, গলার টান টান পেশি কাশির দমক বা বেগকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছে।

'আপনি সুস্থ বোধ করছেন তো?'

'জি, ভালো আছি আমি।' প্রায় গলার কাছে পৌঁছে গেছে হারুন।

'আপনি চান থামাই?' জামিল জানতে চাইলেন।

'না, তার কোন দরকার নেই, আমি এখন ভালো আছি।' কয়েক সেকেন্ড পর দ্বিতীয় চেম্বারের কালো গলার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল হারুন। আবছা মত তার ল্যাম্পের আভা দেখতে পাচ্ছে রানা। মুখ তুলে উপরে তাকাল, কেবল্ খুলছে।

জামিল বললেন, 'দুশো দশ ফুট। চারপাশ কেমন দেখছেন?'

'ওগুলোকে এর আগে এত বড় দেখিনি, মিস্টার জামিল। নিশ্চয় ষাট ফুট লম্বা হবে।'

'পাশ কাটিয়ে নেমে যেতে পেরেছেন?'

'এই আর এক সেকেন্ড, মিস্টার জামিল…হ্যাঁ, বেরিয়েছি!' হারুনের স্বস্তি ফেলবার নিঃশ্বাস ভেসে এল।

কুয়ার ভিতর চোখ রেখে এখন আর রানা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। শুধু স্টিল কেবলটা রুলার-এর মত সোজা নেমে গেছে বরফ খোঁড়া গর্তটার ঠিক মাঝখান দিয়ে একশো পঞ্চাশ ফুট গভীরে।

'তিনশো আসছে,' বললেন জামিল।

'আমি এখন গলার কাছাকাছি।'

'একটু জিরিয়ে নিতে চান, মিস্টার হাবিব? আপনার কাশির কী অবস্থা?'

'এখন সব ঠিক। আপনি নামান।'

'তিনশো দশ…তিনশো পনেরো। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে পার হয়ে যাবেন আপনি।'

'আমি পেরিয়ে এসেছি, মিস্টার জামিল।'

'কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

'না, এখনও নয়।'

কর্নেল বললেন, 'ওঁকে সাবধান করে দিন, একান্ত বাধ্য না হলে ওয়াটার লেভেলে যেন না নামেন।'

কথাটা বলা হলো হারুনকে, জবাবে সে জানাল, 'তা তো নামবই না। কিন্তু এখানে দেখার কিছুই নেই, শুধু একজোড়া ঝুরি বাদে–নিশ্চয় ওপর থেকে ভেঙে পড়েছে। বরফের বিরাট দুটো চাঙ ভাসছে।'

'আর কিছু না?'

'নাহ্। সবই পরিষ্কার দেখাচ্ছে। ইকুইপমেন্টগুলো অক্ষত রয়েছে, তারমানে ঝুরি দুটো ওগুলোয় লাগেনি। তবে আশ্চর্যই বটে যে কী করে মিস করল।'

'তিনশো পঞ্চাশ,' বললেন জামিল। 'আমি এবার থামতে চাই।'

'না, মিস্টার জামিল; কর্নেলকে জানান, এখানে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'ল্যাম্পটা থেকে যথেষ্ট আলো পাচ্ছেন?'

'মিস্টার জামিল, আমাকে আরেকটু নামান দেখি। এই বিশ ফুটের মত। পঁচিশের বেশি যেন না হয়।'

'ঠিক আছে, বিপদ হলে আপনার হবে।'

চট করে একবার কর্নেলের দিকে তাকাল রানা। ভুরু কুঁচকে কুয়ার ভিতর উঁকি দিলেন ভদ্রলোক, চোয়ালের পেশি ফুলে টান টান হয়ে আছে।

'মিস্টার হাবিবকে জিজ্ঞেস করুন,' জামিলকে বললেন তিনি, 'উনি কি তলাটা দেখতে পাচ্ছেন?'

প্রশ্নটা করা হলো।

'দেখতে পাবার চেষ্টা করছি, মিস্টার জামিল। আলো ফেলতে হচ্ছে ধীরে ধীরে ল্যাম্প ঘুরিয়ে।'

বেশ কিছুটা সময় অপেক্ষা করল ওরা। তারপর আবার হারুনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'ওখানে নেই কিছু। পানি পরিষ্কার। আমি কিছু দেখছি না।'

'বোতলটা ভরতে পারবেন?'

'সে চেষ্টাই তো করছি, রে, ভাই! ঘোড়ার ডিম জিনিসটা ডুবছে না। নিচু করলে ভেসে থাকছে। ধৈর্য ধরেন, আরেকবার চেষ্টা করে দেখি।'

শুভ্র আর হিম গহনে ঝুলে থাকা চেয়ারে হারুন নড়ে ওঠায় স্টিল কেবল কেঁপে উঠল।

রুদ্ধশ্বাসে জামিল বললেন, 'সাবধান, মিস্টার হাবিব, কোন ঝুঁকি নেবেন না–প্লিজ।'

'এখনও বোতলটা ভাসছে, মিস্টার জামিল। উপায় নেই, আরেকটু নীচে নামতে হবে; দেখি চেয়ার থেকে ঝুঁকে যদি খানিকটা তুলে নেয়া যায়। তবে খুব ধীরে ধীরে নামান, মিস্টার জামিল।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' জামিল আবার মোটর স্টার্ট দিলেন। স্টিল কেবল্ প্রতিবার মাত্র কয়েক ইঞ্চি করে কুণ্ডলী ছাড়াচ্ছে। 'কেমন নামছেন?'

'আর এক ফুট, মিস্টার জামিল।'

আরও খানিকটা কুণ্ডলী ছাড়াবার পর থেমে গেল কেবল্।

'আরও এক।'

মেশিনটাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, সযত্নে নিয়ন্ত্রণ করছেন ইঞ্জিনিয়ার জামিল। 'চলবে?'

'আরও বোধহয় এক ফুট।'

'এই শেষ। ঠিক আছে?'

'ঘোড়ার ডিম জিনিসটার…খুব বেশি বয়্যান্সি,' থেমে থেমে বলল হারুন। 'দাঁড়ান, এখনও আমি চেষ্টা করছি–' টান টান লাইন আচমকা ঝাঁকি খেল।

আঁতকে উঠে জামিল বললেন, 'কী হলো?'

'আমি ঠিক আছি, মিস্টার জামিল, কিছু হয়নি।' উত্তেজনাটুকু কানে বাজল। তারপর হারুন বলল, 'মনে হচ্ছে পা না ভিজিয়ে আর কোন উপায় নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করলেন কর্নেল। 'না!'

'কমান্ডার মানা করছেন, মিস্টার হাবিব,' মেসেজ পাঠালেন জামিল। 'বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়। পা বরফ করে ফেলবেন। শুধু ঝুঁকে আর হাত বাড়িয়েই আরেকবার চেষ্টা করুন।'

কেবলটা আবার কেঁপে উঠল। একটু পরই রিপোর্ট করল হারুন। 'কয়েক ফোঁটা বোধহয় ম্যানেজ করা গেছে। হ্যাঁ, খুবই সামান্য।'

ঘাড় ফিরিয়ে রিয়্যাক্টর এক্সপার্ট জাভেদ হাশমির দিকে তাকালেন কর্নেল যাদব, সেই প্রথম থেকেই নিষ্প্রাণ মূর্তির মত চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক। 'সামান্যতে কাজ হবে কি?' জানতে চাইলেন কর্নেল।

'হওয়া উচিত,' জবাব দিলেন হাশমি। 'কী করা, ওতেই কাজ চালাতে হবে।'

জামিলের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল যাদব।

হারুনকে জামিল বললেন, 'আপনাকে আমরা তুলে আনছি, মিস্টার হাবিব। এখন আর এতটুকু নড়াচড়া নয়!'

'দাঁড়ান, মিস্টার জামিল। আরেকবার চেষ্টা করতে দিন আমাকে।'

দ্রুত মাথা নাড়লেন কর্নেল।

'কমান্ডার মানা করছেন, মিস্টার হাবিব।'

'ঠিক আছে।'

'শক্ত হয়ে বসুন।' যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে স্টার্ট নিল মোটর, কুয়ার মাথার উপর স্পুল-এ গুটাতে শুরু করল স্টিল কেবল্।

'প্লিজ, মিস্টার জয়,' রানাকে বললেন কর্নেল। তারপর কুয়ার কাছ থেকে সরে যাওয়ার ইশারা করলেন ওকে। নিজের জায়গা ছেড়ে নড়লেন না, ঝুঁকে কুয়ার ভিতরটা দেখছেন।

রানার পাশে এসে দাঁড়ালেন হাশমি। 'নামার চেয়ে ওঠাটা অনেক বেশি বিপজ্জনক,' বললেন তিনি। 'চেয়ারের দোল খাওয়ার ঝোঁক বেড়ে যায়। পঞ্চাশ লাখ দিলেও ওই চেয়ারে আমি বসব না। তাও কিনা কয়েক ফোঁটা পানির জন্যে!'

হঠাৎ করে হারুন কথা বলে উঠল। 'একবার থামাতে পারবেন, মিস্টার জামিল?'

'কি হলো? কোনও বিপদ?' ভয়ে যেন কুঁকড়ে যাবেন জামিল।

'না, সামান্য ক্র্যাম্প।'

'আপনি কোথায়?'

'তিন নম্বর চেম্বারের গলায়। চিন্তার কিছু নেই, মিস্টার জামিল, এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।'

'ওকে।'

অপেক্ষা করছে সবাই। ষাট সেকেন্ড পার হলো। কেবল সামান্য কাঁপছে। তারপর হারুন বলল, 'হ্যাঁ, মিস্টার জামিল, ঠিক হয়ে গেছে।'

কেবল্ আবার গুটাচ্ছেন জামিল। সেটা আর থামল না, প্রায় মিনিট দুয়েক পর করোগেটেড ব্যারিয়ারের উপর হঠাৎ করে হারুনের মাথা দেখা গেল।

খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে তাকে। বিবর্ণ চেহারা। গ্লাভ পরা হাতে মহামূল্যবান বোতলটা শক্ত করে ধরে আছে।

জামিল মোটর বন্ধ করে উপস্থিত সবার মুখের উপর একবার করে চোখ বুলালেন।

প্রত্যেকের প্রতিক্রিয়া আর আচরণ খুঁটিয়ে লক্ষ করছে রানা।

হারুনের কাছ থেকে বোতলটা নেওয়ার জন্য সামনে এগোলেন হাশমি।

হারুন কি বোতলটা দেওয়ার সময় এক মুহূর্ত ইতস্তত করল?

কর্নেল যাদব আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জামিল পরস্পরের সঙ্গে চোখের পলকে দৃষ্টি বিনিময় করলেন?

বোতলটা উঁচু করে আলোর কাছাকাছি ধরলেন হাশমি। দেখা গেল বোতলটার তলায় সিকি ইঞ্চির মত পানি রয়েছে।

করোগেটেড ব্যারিয়ারের উপর দিয়ে হাবিবকে সহ চেয়ারটাকে সরিয়ে এনে মেঝেতে নামাতে রানাকে সাহায্য করলেন কর্নেল যাদব।

স্ট্র্যাপগুলো হারুন নিজেই খুলল। 'দুঃখিত, মিস্টার হাশমি। কোনভাবেই ওটাকে আমি ডোবাতে পারছিলাম না। চাপ দিয়ে ডোবাবার মত কিছু একটা যদি

থাকত...'

হাশমি বললেন, 'আপনি আপনার সাধ্যের অতিরিক্ত করেছেন, মিস্টার হাবিব। ব্যক্তিগতভাবে আমি, আমরা সবাই, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।' বোতলটা উঁচু করে পানিটুকু আরেকবার দেখলেন। 'উপায় কী, এ দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হবে।'

'আপনি আমাদের সেনাবাহিনীর সদস্য নন, মিস্টার হাবিব। কাজেই আপনাকে সামরিক কোন পদক দেয়া যাবে না,' বললেন কর্নেল যাদব। 'ভাবছি একটা প্রশংসা-পত্র দেব। সেটা আপনার কোন কাজে আসবে বলে মনে হয় না, তবু দেব।'

পারকা তুলে নিয়ে পরবার সময় বিড়বিড় করে কর্নেলকে ধন্যবাদ দিল হারুন।

'পরীক্ষায় নিশ্চয়ই কিছু ধরা পড়বে,' বললেন কর্নেল। 'তারমানে নতুন আরেকটা কুয়া খুঁড়তে হবে আমাদের। এভাবে তো আর চলতে পারে না। নীচেটা কত খারাপ, মিস্টার হাবিব?'

ঘুরে তাঁর মুখোমুখি হলো হারুন। 'গা ছমছম করে, মিস্টার যাদব।'

প্রথমে রানা, তারপর ওর দেখাদেখি জামিল আর হাশমিও হেসে ফেললেন।

'আর কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, আমি কথাটা বিশ্বাস করি,' বললেন নেতাজি ক্যাম্পের কমান্ডার। 'ধন্যবাদ, মিস্টার হাবিব। যান, ক্লাবে বসে যত খুশি হুইস্কি খান।'

'ও-সব পরে দেখা যাবে,' বলল হারুন। 'এখন আমি লম্বা একটা ঘুম দিতে চাই।'

পরীক্ষা করে জানা গেল, কুয়ার পানি দূষিত নয়।

আট

শ্রীলঙ্কান ট্র্যাক্টর ড্রাইভার মুরালি মোহনের বয়স বেশি নয়। অত্যন্ত সরল চেহারা, দুনিয়াদারির প্যাঁচ বা নোংরামির সঙ্গে এখনও বোধহয় তার পরিচয় ঘটেনি।

এক সুযোগে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে রানা তাকে নিজের হাট বা ক্যাবিনে এনে বেশ কিছুক্ষণ নিরিবিলিতে কথা বলল। হ্যাঁ, বুলডোজার চালাবার সময় ছাপগুলো সে-ই দেখেছিল।

'তুমি যে ছাপ দেখেছ, আমিও সেই একই ছাপ দেখেছি,' বলল রানা। 'কিন্তু ওগুলো যে ভালুকের পায়ের ছাপ তা তুমি বুঝলে কীভাবে?'

'আকার দেখে বুঝলাম, সার,' জবাব দিল মুরালি মোহন। 'একেকটা এই মস্ত বড়...'

'মুরালি, আগে কখনও তুমি ভালুক বা ভালুকের পায়ের ছাপ দেখেছ?'

'কী বলেন দেখিনি! প্রায় ফি হপ্তাতেই তো দেখছি!' প্রবল উৎসাহের সঙ্গে

বলল মুরালি, চোখ-মুখ থেকে উত্তেজনা উথলাচ্ছে। 'আরে, সিংহ আর ভালুক দেখব বলেই তো টারজানের একটা ছবিও বাদ দিই না।'

কাগজ আর পেনসিল বের করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। 'ভালুকের পায়ের ছাপ দেখতে কেমন, এঁকে দেখাও তো দেখি।'

আগ্রহের সঙ্গে শুরু করল মুরালি। আঁকবার হাত ভালই তার। ঝটপট ভালুকের একজোড়া থাবা এঁকে ফেলল সে।

'বাহ্, ভারী সুন্দর হয়েছে,' বলল রানা। 'একবারে নিখুঁত ভালুকের পা। এবার, মুরালি, ক্যাম্পে ঢোকার মুখে তুমি কী দেখেছ সেটা আঁকো–আমরা ওখানে পৌঁছানর আগে।'

'জী?' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মুরালি, রানার কথা যেন বুঝতে পারেনি।

'তুমি তো ট্র্যাক্টরের সাহায্যে ক্যাম্পের দোরগোড়া পরিষ্কার করার সময় দাগগুলো দেখতে পাও, তাই না? সারারাত ধরে পড়া তুষারের ওপর। দাগ যখন তৈরি হয় ঠিক তখনই দেখোনি, তা দেখলে ভালুকটাকেও দেখতে পেতে। বেশ কিছু পরে দেখেছ। তুষার পড়া কিন্তু বন্ধ হয়নি তখনও। তা হলে পায়ের ছাপ তুমি হুবহু এরকম দেখতে পাওনি।'

'সার, আপনি বলার পর আমার কাছেও ব্যাপারটা এখন আশ্চর্য লাগছে,' ধীরে ধীরে বলল মুরালি। 'আমি যেমন দাগ দেখেছি, এঁকেছিও প্রায় সেরকম। খবর পেয়ে আপনারা যখন দেখতে গেলেন, ততক্ষণে ছাপগুলো প্রায় অর্ধেকই ভরাট হয়ে গিয়েছিল।'

'তা হলে রহস্যটা কী?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এমন হতে পারে, কেউ কৌতুক করেছে–মিছিমিছি ভয় দেখাবার জন্যে? কিংবা কারও হয়তো খুব খারাপ, ভয়ঙ্কর কোন উদ্দেশ্য আছে? লোহা বা কাঠ দিয়ে ছাঁচ তৈরি করেছে সে, তুষারে রেখে চাপ দিলে ভালুকের পায়ের ছাপ হয়ে যায়?'

'হতে পারে,' বিড়বিড় করল মুরালি। 'অসম্ভব নয়।'

'একটা কথা, মুরালি। তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি তো?'

'জী, সার, অবশ্যই।'

'তা হলে শোনো, ব্যাপারটা কৌতুক নয়। এর পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র আছে। আমি চাই চোখ-কান খোলা রেখে কে কী করে আর কে কী বলে সব শুনবে তুমি। কী, পারবে না?' মুরালি মাথা ঝাঁকাতে স্বস্তি বোধ করল রানা। 'ভেরি গুড। কাউকে যদি তোমার সন্দেহ হয়, সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে, কেমন?'

আবার মাথা ঝাঁকাল মুরালি। তারপর জানতে চাইল, 'আমাকে কি, সার, বিশেষ কারও ওপর নজর রাখতে হবে?'

'বিশালা কালমুন্নিয়াকে তোমার মানুষ হিসেবে কেমন মনে হয়?' জবাব না দিয়ে জানতে চাইল রানা।

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুরালির, যেন হঠাৎ খুব ভয় পেয়েছে সে।

'কী ব্যাপার, মুরালি? কী হলো তোমার?'

'আমাকে মাফ করতে হবে, সার,' অবশেষে বলল মুরালি। 'আপনি যার নাম বললেন তার বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে বা বলতে পারব না।'

'তোমার কিন্তু কোন ভয় নেই, মুরালি। যদি চাও তো কথা দিতে পারি, আমি বেঁচে থাকতে কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

অপলক তাকিয়ে রানার চোখে কী যেন খুঁজল মুরালি। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আমি জানি আপনি একজন পুলিশ অফিসার, ডিআইজি, এখানে অপরাধী ধরতে এসেছেন। এ-ও জানি যে আমাদের কমান্ডারকেও আপনার অনেক কথা মেনে নিতে হচ্ছে। কিন্তু, সার, আপনি কি যথেষ্ট সাবধানী? কথা দিয়ে সে-কথা রক্ষা করেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'যতটুকু সাবধান হওয়া সম্ভব। আর প্রাণ দিয়ে হলেও প্রতিশ্রুতি রক্ষার চেষ্টা করি। কিন্তু এ-কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'আপনাকে কোন কথা বললে সেটা কখনও দশ কান হয় না?'

'তুমি নির্ভয়ে সব কথা খুলে বলো আমাকে, কথা দিচ্ছি কেউ জানবে না।'

'না, সার, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমি কাউকে সন্দেহ করার মত কিছু দেখিনি। তবে বিশালাকে আমি ভয় পাই।'

রানা অপেক্ষা করছে।

'আমি একা না, সার। আমরা যারা ড্রাইভার আর মেকানিক আছি সবাই তাকে ভয় করি।'

'কিন্তু কেন?'

'সব কথা ব্যাখ্যা করে বলতে অনেক সময় লাগবে, সার,' বলল মুরালি, চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। 'সংক্ষেপে ব্যাপারটা হলো, আমরা সবাই বিশালার কাছে কমবেশি ঋণী।'

'সবাই…কেন?' শুধু রহস্য নয়, অপরাধেরও গন্ধ পাচ্ছে রানা।

'সার, বিশালা আসলে ক্যান্ডির একজন জুয়াড়ী আর গুণ্ডা সর্দার। বিশালা কালমুনাই তার আসল নাম নয়, আসল নাম পুত্তালাম বর্ধন। জুয়ার আড্ডায় তার এক বন্ধু খুন হওয়ায় পুলিশের ভয়ে পরিচয় পাল্টে এখানে চাকরি নিয়ে পালিয়ে এসেছে।'

ইন্টারেস্টিং, ভাবল রানা। 'এ-কথা আর কে জানে? কর্নেলকে বলা হয়েছে?'

মাথা নাড়ল মুরালি। 'কার এত সাহস যে কর্নেলকে তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাবে? শ্রীলঙ্কায় পুত্তালাম বর্ধন নেই, কিন্তু তার বাহিনী এখনও ওখানে দাপটের সঙ্গে কাজ করছে, সার।' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর আবার বলল, 'সে তার ওই বাহিনীর লোকজনকে দিয়েই আমাদের মা-বাবার ওপর অত্যাচার করছে আর সয়-সম্পত্তি সব কেড়ে নিচ্ছে।'

'মানে? এ-সব কী বলছ তুমি?'

'জি-সার, সত্যি কথাই বলছি। সব মিলিয়ে এখানে আমরা শ্রীলঙ্কান আছি প্রায় পঞ্চাশজনের মত, পাঁচজন বাদে বাকি সবাই আমরা তার কাছে ঋণী।'

গোটা ব্যাপারটা চোখের জল ফেলে ধীরে ধীরে বলে গেল মুরালি। বিশালা আর তার পাঁচ সঙ্গী প্রতি রাতে তাসের আসর বসায়। খেললেই জেতা যায়, নিজেদের কাউকে জিতিয়ে দিয়ে এরকম অনেক দৃষ্টান্ত তৈরি করে তারা, ফলে লোভে পড়ে একে একে সবাই তার জুয়ার আসরে খেলতে বসেছে আর প্রচুর জিতেওছে।

জেতার পালা চলে দুই কি তিনদিন। তারপর হঠাৎ করে শুরু হয় হারার

পালা। আর একবার হারার পালা শুরু হলে তা আর থামতে চায় না। তবে বিশালা আর তার সঙ্গীরা কৌশলে এমন ফাঁদই ফেঁদেছে, সব টাকা-পয়সা হেরে গেলেও কারও তেমন গায়ে লাগে না।

ফাঁদটা হলো, যারা হারে তাদেরকে টাকা-পয়সার অভাব টের পেতে দেয় না বিশালা। চাইতে হয় না, সেধে সেধে ধার দেয় সে। লোকে যত হারে তত বেশি ধার করে, আর তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে বাজি ধরবার অঙ্ক। এক সময় দেখা যায়, এক একজনের দেনার পরিমাণ লাখ-দু'লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

যে-ই টাকা ধার নিক, একটা সাদা কাগজে সই করতে হয় তাকে। বেতনের টাকা থেকে এই দেনা শোধ করা সম্ভব নয়, তাই শ্রীলঙ্কায় নিজের বাহিনীকে দায়িত্ব দেয় বিশালা—সংশ্লিষ্ট ঋণীর মা-বাবা বা আপনজনদের কাছ থেকে টাকাটা সুদে-আসলে আদায় করো, নগদ আদায় করা সম্ভব না হলে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল করো।

দেনাদারকে ভয় দেখানো হয় ঋণ শোধ করতে ব্যর্থ হলে দেশে তোমার আপনজনেরা খুন হয়ে যাবে, ফলে দেনাদারকে চিঠি লিখে বা সুযোগ পেলে রেডিও মেসেজ পাঠিয়ে আপনজনকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করতে হয়। আর আপনজনদের হুমকি দিয়ে বলা হয় দেনা পরিশোধ না করা হলে আইসক্যাপে খুন হয়ে যাবে তোমাদের লোক, তারা যাতে টাকা দিতে গড়িমসি না করে।

নানাভাবে প্রশ্ন করে মুরালির কাছ থেকে আরও কিছু তথ্য পেল রানা। তবে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা, তুষার ঝড়ে পড়ে রত্নে গোপালচন্দ্রের নিখোঁজ হওয়া, প্লেন ল্যান্ড করবার আগে রানওয়ের আলো নিভে যাওয়া, ভালুকের পায়ের ছাপ তৈরি, ইমার্জেন্সি রেশনের মোড়ক ছেঁড়া, রিয়্যাক্টর কেটলিতে কয়েন ফেলা বা ডক্টর হাসানের মৃত্যুর সঙ্গে বিশালা কালমুনাই ওরফে পুত্তালাম বর্ধনের কোন সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাওয়া গেল না।

তবে রানা উপলব্ধি করল, লোকটার উপর কড়া নজর রাখতে হবে। সেই সঙ্গে মুরালি মোহনের নিরাপত্তার দিকটাও দেখতে হবে।

মুরালিকে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে বিদায় করল রানা। কর্নেল যাদবের পাঠানো ফাইলের স্তূপ থেকে একটা তুলে নিয়ে চোখ বুলাল কিছুক্ষণ। তারপর ডিনারের সময় হয়ে আসতে ফাইলটা রেখে দিয়ে বেরিয়ে এল ক্যাবিন থেকে।

সরাসরি অফিসার্স ক্লাবে চলে এল রানা। একটা টেবিলে বসে হুইস্কি খাচ্ছেন কর্নেল যাদব।

রানা বসতে না বসতে একটা গ্লাসে এক আউন্স হুইস্কি ঢেলে ওর সামনে রাখলেন তিনি।

কেউ এসে পড়বার আগেই প্রসঙ্গটা তুলল রানা। 'আচ্ছা, কর্নেল, যে-সব রেডিও মেসেজ আসে বা যায় সেগুলোর কোন রেকর্ড রাখা হয় কিনা আপনি জানেন?'

'কেন জানব না, অবশ্যই রাখা হয়।'

'গত ছ'মাসের রেকর্ড দরকার আমার, একবার চোখ বুলাব।'

'কমিউনিকেশন হাটে গিয়ে আমার কথা বলে চেয়ে নিন।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি দেখতে চেয়েছি, এটা আপাতত গোপন রাখতে চাইছি।'

'ঠিক আছে, আপনার ক্যাবিনে পৌঁছে যাবে।'

'ধন্যবাদ। আরেকটা কথা, মিস্টার যাদব।'

'বলুন?'

'আচ্ছা, কেউ কোন গুরুতর অপরাধ করে ধরা পড়লে তাকে নিয়ে কী করেন আপনারা?'

'থিউলে পাঠিয়ে দিই, সেখান থেকে তার দেশে।'

'তার আগে? যতদিন না থিউলে পাঠাতে পারছেন?'

'আমাদের এখানে প্রিজন সেল আছে, সেখানে আটকে রাখি। আপনি যদি মনে করেন কাউকে বন্দি করা দরকার, তার শুধু নামটা বলুন আমাকে–দশ মিনিটের মধ্যে সেলে ভরে দিই।'

'হ্যাঁ, দরকার,' বলল রানা। 'দরজা খোলা ছিল, আমার ক্যাবিনে ঢুকে দু'হাজার টাকা চুরি করেছে সে।'

'কী! এতবড় সাহস? কে সে?'

'শ্রীলঙ্কান ড্রাইভার মুরালি মোহন।'

ওয়াল ফোনের কাছ থেকে টেবিলে ফিরে এসে কর্নেল যাদব গম্ভীর কণ্ঠে জানালেন, 'মুরালিকে অ্যারেস্ট করে প্রিজন সেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মিস্টার জয়। আমাকে যেটা অবাক করল, অভিযোগটা অস্বীকার করেনি সে। তারমানে সত্যি সে টাকাটা চুরি করেছে!'

'চুপ!' ফিসফিস করল রানা, চোখ ইশারায় দেখাল ওদের দিকে এগিয়ে আসছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শওকত জামিল। ও ধারণা করল, মুরালি বোধহয় বুঝতে পেরেছে যে তার ভালর জন্যই চুরির মিথ্যে অভিযোগে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তাকে।

জামিলের জন্যও একটা গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢাললেন কর্নেল, বললেন, 'পানি দূষিত হতে পারে, কিন্তু মদ নির্ভেজাল। আসুন, জেন্টেলমেন, আমরা সবকিছুর মধ্যে বিশুদ্ধতা কামনা করে পান করি।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'পানির ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল, মিস্টার যাদব?'

কর্নেলের চোখ দুটো ঘুরে গেল ওর দিকে। 'পানি,' বললেন তিনি, 'রিয়্যাক্টরে দূষিত, পাইপে দূষিত, কিন্তু কুয়ায় দূষিত নয়।'

'সমস্যাটা তা হলে পাম্পে,' বলল রানা। 'কিংবা হয়তো কুয়ার তলা আর মাথার মাঝখানে পাইপে কোথাও।'

'আমিও প্রায় তাই আন্দাজ করেছি,' কর্নেলের সুরে একটু যেন শ্লেষ।

'এখন তা হলে সব বদলাতে হবে?'

'বাধ্য। চারশো ফুট নিউপ্রিন পাইপ। কিন্তু অত নিউপ্রিন পাইপ কোথায় পাব

আমি?'

জামিল বললেন, 'নিউপ্রিন কেন, কোনও পাইপই তো নেই।'

'তুলে এনে ধুয়ে নিন,' বলল রানা।

'দূষিত পানি দিয়ে?'

'কেন, তুষার গলিয়ে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা যায় না?'

'সে চিন্তা করেও দেখা হয়েছে,' বললেন কর্নেল। 'ওই বরফ গলা পানি আমরা শুধু ভেতর দিয়ে গড়িয়ে এদিক থেকে ওদিকে নিতে পারব, জোরাল কোন চাপ তৈরি করতে পারব না।'

জামিল বললেন, 'আমাদের আসলে দরকার স্টিম-ক্লিনিং, কিন্তু...'

কথাটা কেড়ে নিয়ে কর্নেল বললেন, 'কিন্তু হাই-প্রেশার স্টিম আপনি নিউপ্রিনের ভেতর দিয়ে পাঠাতে পারবেন না।' তাঁর তালুর গোড়া টেবিলে ড্রাম বাজাচ্ছে, অর্থাৎ হতাশা চেপে রাখতে পারছেন না। 'আমার শুধু জানতে ইচ্ছে করছে কী আছে ওই টিউবটার ভেতর।'

'ইঁদুর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, সাধারণত মরা একটা ইঁদুরই আটকে থাকে,' বললেন কর্নেল। 'কিন্তু আমাদের এখানে কোন ইঁদুর নেই। তা ছাড়া, পাইপ কিন্তু বোজেনি, মানে পানি আটকাচ্ছে না।'

বিষয়টা নিয়ে তখনও আলোচনা চলছে, ক্লাব থেকে বেরিয়ে এল রানা। স্পষ্ট সমাধান, ওর দৃষ্টিতে, তাড়াতাড়ি নতুন একটা কুয়া খোঁড়া; কিন্তু ক্যাম্প অফিসারদের ভাবসাব দেখে সন্দেহ জাগে তাঁরা যেন কোনও ধরনের কুসংস্কারগত কারণে পুরানো কুয়াটার প্রতি দুর্বল।

রানা নিজের কানে শুনেছে, কর্নেল যাদব আর ইঞ্জিনিয়ার জামিল নতুন একটা কুয়া কাটবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত হয়েছেন, কিন্তু কী এক রহস্যময় কারণে এখন তাঁরা প্রসঙ্গটা যেন সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছেন, তার বদলে শুধু পাইপ পরিষ্কার করবার কথাটা বারবার তুলছেন।

এটাও রানার কাছে বোধগম্য নয় যে এরকম একটা সাজানো-গুছানো, স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্যাম্পে কয়েকশো ফুট অতিরিক্ত পাইপ কেন থাকবে না, বিশেষ করে জিনিসটা না থাকলে যেখানে কমবেশি দেড়শো মানুষকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা সম্ভব নয়? পানির অভাব দীর্ঘায়িত হলেই তো শুরু হয়ে যাবে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

জেনারেটর থেকে খাবার পর্যন্ত সবই দুই-তিন প্রস্থ করে মজুদ করা আছে। তা হলে কী কারণে পানির পাইপ শুধু একটা?

অন্য একটা কাজের কথা মগজে থাকায় প্রশ্নটার উত্তর খুঁজবার সময় পেল না রানা। ঠিক এই সময় ডক্টর ওসমান ফারুকের অ্যাসিস্ট্যান্ট হারুণ হাবিবকে কোথায় পাওয়া যাবে জানা আছে ওর, সিদ্ধান্ত নিল সারপ্রাইজ ভিজিট দেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। জানা দরকার কী কারণে, কোন্ যুক্তিতে সে তার সন্তানসহ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করল।

মেইন স্ট্রিট হয়ে রেড জোনে চলে এল রানা। এয়ারটাইট দরজার তালা খুলে

একটা ইস্পাতের ঘরে ঢুকল, সারা গায়ে অ্যান্টি-ভাইরাস লিকুইড স্প্রে করে প্রটেকটিভ সুট আর মাস্ক পরছে, এই সময় খুলে গেল দরজাটা।

প্রটেকটিভ সুট আর মাস্ক পরে থাকায় আগন্তুককে সঙ্গে সঙ্গে রানা চিনতে পারল না।

'আমি রফিক, সার,' মাস্ক খুলে বলল ডাক্তার আরিফ হাসানের অ্যাসিস্ট্যান্ট, মেইল নার্স রফিক শিকদার। 'আপনি কি ল্যাবে যাবেন, সার? মিস্টার হাবিবের সঙ্গে দেখা করতে?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ রফিকের চেহারা ম্লান হয়ে গেল। 'আমার তো আপনাকে যেতে মানা করা সাজে না, সার, তবু বলছি এখন ভদ্রলোকের কাছে কারও না যাওয়াই ভালো। তাঁকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দেয়া উচিত। আমিও দরজা থেকে ফিরে এসেছি, ভেতরে ঢুকিনি…'

রানা উদ্বিগ্ন। 'কেন, কী হয়েছে?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে রফিক বলল, 'ভদ্রলোককে বাইরে থেকে দেখে বেশ শক্ত মনে হলেও, আসলে উনি খুব দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। মিস্টার হাবিব এখন নির্জনে একা বসে কাঁদছেন, সার।'

'সে কী! কাঁদছেন কেন?'

'কেন আবার, নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর প্রতি এখনও তাঁর দুর্বলতা আছে।'

'মানে?'

এবার রফিককেই বিস্মিত দেখাল। 'কেন, সার, আপনি জানেন না?'

'কী জানব?'

'নাসার চাকরি ছেড়ে মিস্টার হাবিব যখন বাংলাদেশে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর স্ত্রী তখন তাতে কোন আপত্তি করেনি। তবে বলেছিল বাচ্চাটা আরেকটু বড় হোক, ছ'মাস পর যাবে সে। ছ'মাস পর স্ত্রী নয়, ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো স্ত্রীর ডিভোর্স লেটার পেলেন মিস্টার হাবিব।

'পরে ব্যাপারটা বিস্তারিত জানা যায়। মেয়েটি অন্য এক ছেলেকে ভালবাসত, মিস্টার হাবিবকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় মা-বাবার চাপে পড়ে। বিয়েটা যখন হয়, তার আগেই গর্ভে এসে গেছে প্রেমিকের সন্তান।

'ডিভোর্স লেটারের সঙ্গে এ-সব কথা জানিয়ে একটা চিঠি লিখেছিল মেয়েটি। আইনী লড়াইয়ে গিয়ে লাভ নেই, ডিভোর্স মেনে নিয়ে কাগজে সই করে দিয়েছিলেন মিস্টার হাবিব। কিন্তু সমস্যা হলো, মাত্র বছরখানেক সংসার করেই বউটাকে ভালবেসে ফেলেছিলেন তিনি। তার কথা মনে পড়লে নিজের ওপর এখনও ভদ্রলোকের নিয়ন্ত্রণ থাকে না।'

যে প্রশ্নের জবাব দরকার ছিল সেটা পেয়ে গেছে রানা। এখন আর ল্যাবে না গেলেও চলে ওর। তবে সিদ্ধান্ত নিল যাবে।

'এক অর্থে তোমার কথা ঠিক, রফিক,' বলল রানা। 'এরকম পরিস্থিতিতে কাউকে বিরক্ত করা উচিত নয়। তবে এ-ও সত্যি যে এরকম সময়ে মানুষ দুটো সান্ত্বনার কথা শুনতে পেলে খুশি হয়। আমি একবার যাই।'

'যান তা হলে,' মাথা ঝাঁকাল রফিক শিকদার, কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে কামরা থেকে রানার বেরিয়ে যাওয়াটা দেখল।

টানেল ধরে ল্যাবের সামনে চলে এল রানা। ক্যাম্পের প্রায় সব দরজার চাবি আছে ওর কাছে, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে তালা খুলে ভিতরে ঢুকল–কাতর কোন মানুষকে সারপ্রাইজ বা চমকে দেয়া রীতিমত অন্যায়।

প্রথম কামরাটা খালি। খোলা দরজা দিয়ে পাশের ঘর দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে বড় করুণ একটা দৃশ্য দেখতে পেল রানা। এ এমন একটা দৃশ্য, যে দেখবে তারই বুকটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠবে।

দুই হাতে ধরা বাঁধানো একটা ফটোগ্রাফের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে হারুন। একচুল নড়ছে না সে, যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে। মাঝে মধ্যে শুধু পিঠটা ফুলে উঠতে দেখছে রানা। তার মুখের সবটুকু নয়, একটা পাশ দেখতে পাচ্ছে ও–গড়িয়ে নেমে আসা চোখের পানি টপ টপ করে পায়ের উপর পড়ছে।

যেভাবে ঢুকেছিল সেভাবেই বেরিয়ে এল রানা, এতটুকু আওয়াজ না করে।

নয়

নিজের ক্যাবিনে ফিরে ফাইল নিয়ে বসেছে রানা, একজন সিপাই নক করল ওর দরজায়। অনুমতি নিয়ে ভিতরে ঢুকে রানার দিকে একটা এনভেলাপ বাড়িয়ে ধরল সে। 'সেলাম, জী। কার্নেল সাব ভেজা, জী।'

এনভেলাপ খুলে একটা ছোট্ট চিঠি পেল রানা, নীচে কর্নেল যাদবের সই। কর্নেল লিখেছেন: 'বিশেষ জরুরি প্রয়োজন, দয়া করে এখুনি যদি একবার কমান্ড হাটে চলে আসেন'তো কৃতার্থ হই।'

'কী ব্যাপার, তুমি কিছু জানো?'

জবাবে শুধু মাথা নাড়ল সিপাই। জানে না।

কমান্ড হাটে চলে এল রানা।

ওকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন কর্নেল। 'যতদূর মনে পড়ে, বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে থাকতে আমাকে একবার বলেছিলেন, আপনি হোভারক্রাফট চালাতে জানেন।'

'বলেছিলাম। তাতে কী?' জানতে চাইল রানা।

'বরফের ওপর দিয়ে, তুষার ঝড়ের মধ্যে চালাতে পারবেন?'

'কাজটা এমন কঠিন কিছু নয় যে চেষ্টা করলে পারব না।'

'গুড। ধন্যবাদ।' কর্নেল এই মুহূর্তে যেমন গম্ভীর, তাঁর কণ্ঠস্বরও তেমনি ভারী। 'শুনুন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে একটা পোলক্যাট পাঠাব নিউপ্রিন পাইপ নিয়ে আসার জন্যে। যেতে-আসতে দুশো মাইল। কিছু দূর গিয়ে স্নো ট্রেনকে ধরবেন আপনারা, তারপর বাকি পথ পাড়ি দেবেন হোভারক্রাফট

নিয়ে। এভাবে সময় খুব কম লাগবে। আমি চাই এই অভিযানে আপনি নেতৃত্ব দেবেন। এটা আমার অনুরোধ। দেড়শো মানুষের বাঁচা-মরার সমস্যা, কাজেই আমি কোন ঝুঁকি নিতে পারি না।'

'ঠিক কী ধরনের ঝুঁকির কথা ভাবছেন বলুন তো?'

'বিশুদ্ধ পানি ছাড়া ক্যাম্প অচল হয়ে পড়বে,' বললেন কর্নেল। 'আর লম্বা একটা সময় ক্যাম্প অচল হয়ে থাকার অর্থ আমরা কেউ বাঁচব না। যে পাইপের এত গুরুত্ব সেটা যদি ভুল করে অপরাধীদের একজনকে আনতে পাঠাই?'

'সবকিছু দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দিতে চাইছিলেন, অথচ এখন বলছেন অপরাধী একজন নয়?'

'কোন সম্ভাবনাই আমি উড়িয়ে দিতে চাইছি না, ঠিক আছে?'

'আসা-যাওয়া দুশো মাইল,' বলল রানা, চিন্তিত হলেও চোখে-মুখে তার কোন ছাপ নেই। 'এই খারাপ আবহাওয়ায়?'

'খারাপ মানে খুনী। ঠাণ্ডা, প্লাস বাতাস, বহুমাত্রিক বিপদ।'

অনেক কথা ভাবতে হচ্ছে রানাকে। এমন নয় তো, কোন বিশেষ কারণে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ওকে? 'কখন যেতে বলছেন, মিস্টার যাদব?'

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলালেন কর্নেল। 'বিশ মিনিটের মধ্যে। মিস্টার শওকত জামিল, একজন ড্রাইভার আর আপনি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এত কম সময়ের মধ্যে...'

'বেশ, সময় বাড়িয়ে এক ঘণ্টা করা যায়।'

চিন্তা করছে রানা। 'এই অন্ধকারে...'

ওকে বিস্মিত হতে দেখে হাসলেন কর্নেল। 'হ্যাঁ, রাতে, মিস্টার জয়। শীতকালে আমরা রাতেই অপারেট করি, কারণ দিনটাও তখন রাত হয়ে যায় কিনা। তবে যাত্রা যদি নির্বিঘ্ন হয়, আপনারা চার ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবেন।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'শুধু একটা পোলক্যাট?'

হেসে উঠলেন ক্যাম্প কমান্ডার। 'বেশি পোলক্যাট মানে বেশি লোক, তাতে আপনার ঝুঁকির মাত্রাও অনেক বেড়ে যাবে। কাজেই ভগবান আর মা ভগবতীর নামে একটা পোলক্যাট নিয়েই বেরিয়ে পড়ুন...মাফি মাঙতা হুঁ, মিস্টার জয়, আল্লাহ্ আওর রাসুলকা নাম লে কার নিকাল পড়িয়ে।'

'চলতি-কা-নাম-গাড়ি রয়েছে মাইল থারটি আর মাইল ফোরটির মাঝখানে কোথাও, এদিকেই আসছে। কোন সমস্যা দেখা দিলে ট্রেইল-এর ধারে তিন মাইল পরপর একটা করে সেফটি ওয়ানিগান আছে–পর্যাপ্ত সাপ্লাইসহ ইমার্জেন্সি শেলটার। বিপদ দেখলে চলতি-কা-নাম-গাড়ি না পৌঁছানো পর্যন্ত ওগুলোর একটায় অপেক্ষা করতে পারবেন। যথেষ্ট নিরাপদ।'

'ওখানে পৌঁছে আমার কাজ কী হবে?'

'আপনাকে শুধু দেখতে হবে নিউপ্রিন পাইপ ঠিকমত যেন এখানে পৌঁছায়। খাটা-খাটনির কাজ ওরা করবে, আপনার কাজ অভিযানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে পৌঁছাবেন, ঘুম দেবেন একটা, তারপর ফিরে আসবেন।'

'কিন্তু এখানে আমার কিছু কাজ ছিল, মিস্টার যাদব। ভাবছি, আরও

খানিকটা দেরি করে রওনা হলে হয় না?'

কমান্ড অফিসের মেঝেতে পায়চারি শুরু করলেন কর্নেল। 'মিস্টার জয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিয়্যাক্টরটাকে আবার চালু করতে চাই আমি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।' রানার সামনে দাঁড়ালেন। 'কী কাজ, আমাকে বলুন।'

'অন্তত দু'একটার কথা তো আপনাকে বলাই যায়। আপনার কাছে গত ছ'মাসের রেডিও মেসেজের রেকর্ড চেয়েছিলাম, মনে আছে?'

'ওদেরকে বলা হয়েছে। কমপিউটার প্রিন্ট-আউট রওনা হবার সময় পেয়ে যাবেন। আর কী?'

'মুরালিকে অ্যারেস্ট করতে বলেছি ঠিকই, কিন্তু আমি চাই কেউ যেন ওর নাগাল না পায়। তার নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনি নিচ্ছেন, ঠিক আছে?'

রানার দিকে কেমন অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকালেন ভীম সিং যাদব, তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে—অবশ্যই। তবে তার নিরাপত্তার আরও ভাল ব্যবস্থা করা যায়।'

'যেমন?'

'ওকেও আপনি সঙ্গে নিন।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে রাজি হয়ে গেল রানা। 'বেশ। আরেকটা কথা, মিস্টার যাদব—পোলক্যাট স্যাবটাজ করা হতে পারে, তাই বলছি ওদিকটা আপনি নিজে বা আপনার অত্যন্ত বিশ্বস্ত কেউ দেখলে ভাল হয়, আমরা রওনা না হওয়া পর্যন্ত আর কী।'

'ঠিক আছে, দেখব। ধন্যবাদ, মিস্টার জয়।'

দরজার কাছে পৌঁছে হঠাৎ থেমে ঘাড় ফিরাল রানা। 'ভাল কথা, নেতাজি ক্যাম্পে স্পেয়ার পাইপ নেই কেন?'

কর্নেল যাদব হাসলেন। 'জানতাম প্রশ্নটা আপনি করবেন। কিন্তু আমি উত্তর দিচ্ছি না। প্রার্থনা করি আপনার যাত্রা যেন শুভ হয়।'

একটা এয়ারলাইন শোল্ডার ব্যাগে একান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিস ভরে নিয়ে ট্র্যাক্টর শেডে চলে এল রানা, তার মধ্যে কর্নেলের কাছ থেকে পাওয়া একগাদা কমপিউটার প্রিন্ট-আউট আর নিজের খুদে পোর্টেবল রেডিও-ট্র্যান্সমিটারটাও আছে।

থিউল থেকে কোন মেসেজ এসেছে কিনা জানবার জন্য একবার রেডিও হাটে যেতে হয়েছিল ওকে, ফলে এখানে পৌঁছাতে বেশ একটু দেরি হয়ে গেছে ওর।

পোলক্যাট দেখা গেল রেডি, ভিতরে অপেক্ষা করছে ড্রাইভার। দু'জন সিপাইকে দেখা গেল, মুরালি মোহনের দু'পাশে দাঁড়িয়ে। মুরালিকে খানিকটা হতচকিত দেখাচ্ছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শওকত জামিল হন্তদন্ত হয়ে এইমাত্র পৌঁছালেন। শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা তাঁর যেন একটা স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

বিশালা কালমুনাই রানাকে আড়চোখে দেখছে, তার আগের সেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিটা চোখে পড়ছে না। বেশ চিন্তিত মনে হলো তাকে।

পোলক্যাটে উঠে বসল ওরা।

লিভার ঘোরাল কালমুনাই, ট্র্যাক্টর শেডের বিশাল দরজা সরে গেল একপাশে। স্টার্ট দিতেই গর্জে উঠল পোলক্যাট, তারপর ওদেরকে নিয়ে বেরিয়ে এল তুষার ঝড়ের মধ্যে।

ড্রাইভারের পাশে জামিল বসেছেন সামনের বেঞ্চে, মুরালিকে নিয়ে পিছনের বেঞ্চে রানা। খানিক পর ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকালেন জামিল।

'লো ফেজ টু চলছে,' রানাকে বললেন তিনি। 'মানে হলো বাতাসের গতিবেগ পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ। টেমপারেচার শূন্যের চেয়ে আটত্রিশ ডিগ্রি নীচে।' ঘাড় সোজা করে উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে সামনে তাকালেন।

পিছন থেকে রানাও সেদিকে তাকিয়ে আছে। উঁচু বাঁশের মাথায় কমলা পতাকা পতপত করে উড়ছে, প্রতি পাঁচ গজ পরপর একটা করে, পোলক্যাটের তীব্র আলোয় উজ্জ্বল রঙ প্রায় শিখার মত জ্বলছে।

'কী করতে হবে জানো তো, দারজি লালা?' ভুটানী ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন জামিল। 'খিঁচে দৌড় লাগাও, যতক্ষণ না চলতি-কা-নাম-গাড়ির দেখা পাচ্ছ। ট্রেইল ধরে গেলে দু'ঘণ্টা লাগবে। থেমে ওদের কাছ থেকে খাবার চেয়ে নেব, ঠিক আছে? তারপর হোভারক্রাফট নিয়ে আবার এক দৌড়, সোজা বঙ্গবন্ধু ক্যাম্প।'

রানা জানতে চাইল, 'আর যদি হোয়াইট-আউট দেখা দেয়?'

ঘাড় ফিরিয়ে আবার রানার দিকে তাকালেন জামিল। 'প্রথমে আসুন আমরা প্রার্থনা করি, তা যেন না ঘটে। আর যদি ঘটেই, আশা করুন কাছাকাছি যেন একটা সেফটি ওয়ানিগান থাকে, আর সেটাকে যেন আমরা দেখতে পাই। খুব বাজে ধরনের হোয়াইট-আউট হলে গ্যাঁট হয়ে ওখানে বসে থাকব, যতক্ষণ না বিপদ কাটে। তাতে অবশ্য বেশ সময় লাগতে পারে।'

'এত সময় যে জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে, সার?' রানার পাশ থেকে জানতে চাইল মুরালি।

'অসম্ভব না,' বললেন জামিল। 'তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এই কারণে যে হোয়াইট-আউট হাজির হয় স্থির বাতাসে, কিন্তু আমরা রয়েছি জোরালো বাতাসের মধ্যে।' পাইপ বের করে তাতে সুগন্ধি তামাক ভরছেন। 'বুঝলেন, মিস্টার জয়, আমার দুশ্চিন্তা এই লোককে নিয়ে,' বলে ইঙ্গিতে পোলক্যাটের ড্রাইভারকে দেখালেন। 'তার ঘর্মাক্ত হাতে কী রয়েছে জানেন? আমাদের প্রাণ। কি, লালা, ঠিক বলিনি?'

'ইয়ে, মাতলাব, জী-হুজুর; সহি কাহা আপনে।' তার ঠোঁটে গর্বিত হাসি।

'ইদানীং তুমি আইসক্যাপে মরীচিকা দেখেছ নাকি, লালা?'

'বুধবার দেখলাম, হুজুর–দুই রাজস্থানী সুন্দরী। আর সোমবারে দেখলাম বাদশা শাহজাহানের তৈরি তাজমহল।'

জামিল বললেন, 'কথাবার্তা এখনই পাকা হয়ে যাক, লালা। এই ট্রেইলে যে-সব সুন্দরী তুমি দেখবে, সব তোমার। কথা দিলাম। তুমি কখনও পথ হারিয়েছ?'

'না, সার।'

'খোদার কসম, আমি হারিয়েছি,' বললেন জামিল। 'প্রথমবার এসেছি,

বুঝলে। চাঁদের আলো আমাকে স্নোব্লাইন্ড করে ছেড়েছিল। গাঢ় চশমা ছিল চোখে, তারপরও। ট্রেইল ছেড়ে আধ মাইল সরে যাই। আল্লাহই জানেন কোন ফাটলে সেঁধোতাম, যদি না আরেকজন আমার পিছু নিয়ে আসত।' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালেন। 'স্নোব্লাইন্ড হলে অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে, জানেন। সূর্যই দায়ী হোক বা চাঁদ, আপনি নিজের অজান্তে ক্রমশ বাম দিকে ঘুরে যাবেন। কেউ জানে না কেন ব্যাপারটা ঘটে।'

'সব সময় শুধু বাঁ দিকে?'

'সব সময়,' জোর দিয়ে বললেন জামিল। 'আরেকটা রহস্য, আইসক্যাপ মিরাজ বা মরীচিকা। আসলে নেই, অথচ আপনি পোল বা খুঁটি দেখতে পাবেন। সারি সারি, মিস্টার জয়। আর সব সময়, সত্যি সব সময়, উল্টোদিকে চলে গেছে—মানে, ডানদিকে। ড্রাইভাররা ট্রেইল ছেড়ে আরেকদিকে রওনা দেয়।'

গায়ে কাঁটা দেওয়ার মত একটা রহস্য, ভাবল রানা।

'মজার ব্যাপার হলো,' বলে চলছেন জামিল, 'প্রথমটার, মানে স্নোব্লাইন্ড-এর শিকার যে-কেউ হতে পারে, এখানে সে কয়েক দিন থাকুক বা কয়েক মাস। এমনকী চকানাগার ড্রাইভাররা, ধরুন ছ'মাস হলো বঙ্গবন্ধু আর নেতাজি ক্যাম্পে আসা-যাওয়া করছে, তারাও বাঁ দিকে সরে যায়। তবে দ্বিতীয়টা, মানে মরীচিকার কথা বলছি, কিছুদিন ড্রাইভিং করার পর ওটার প্রভাব কেটে যায়। চলতি-কা-নাম-গাড়ির কমান্ডার ঘিসিং থাপার ধারণা, পুরোটা ট্রেইল ধরে একবার আসা-যাওয়া করলে আর কোন সমস্যা হয় না। জানেন, কী করেন তিনি? নতুন ড্রাইভারকে রাখেন মাঝখানে, অন্য দুটো ট্র্যাক্টর থাকে সামনে আর পেছনে—সেগুলোয় থাকে অভিজ্ঞ ড্রাইভার।'

'অথচ কেউ জানে না কেন?'

'নাহ্।' তৃপ্তির সঙ্গে পাইপে টান দিয়ে যাচ্ছেন জামিল।

ড্রাইভারের কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে পোলক্যাটের স্পিড দেখল রানা। ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেশ ভালই বলতে হবে। রানার মনে হলো, ওকে যদি বড়ে মিয়া অর্থাৎ হোভারক্রাফটটা চালাতে হয়, তারপর হঠাৎ যদি বুঝতে পারে যে ও স্নোব্লাইন্ড হয়ে গেছে বা মরীচিকার খপ্পরে পড়েছে, ওর স্পিড থাকবে এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ। দারজি লালার কাঁধে টোকা মারল ও। 'আমার একটা উপকার করবে?'

'যদি পারি অবশ্যই করব, সার।'

'আমি যদি বড়ে মিয়াকে চালাই, তুমি আমার সঙ্গে থেকো। আরেকটা কথা—কোন রাজস্থানী সুন্দরীকে দেখলে পাত্তা দিয়ো না।'

হেসে ফেলল সবাই।

প্রায় বিশ মাইলের মত এগিয়েছে ওরা, এই সময় নিজের ব্যাগ খুলে একটা ফ্লাস্ক বের করলেন জামিল। 'কিসিকো কফি চাহিয়ে?'

সবারই কফি চাই। দ্রুতগতি পোলক্যাটের অত্যন্ত শক্তিশালী হিটার ওদের মুখের ভিতরটা শুকিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেককে আধ কাপ করে কফি দিলেন জামিল। তার সঙ্গে স্কচের একটা বোতলও রয়েছে। তিনজনের কাপে খানিকটা করে

ঢাললেন। 'তোমাকে স্কচ দিচ্ছি না, বাছা,' দারজি লালাকে বললেন তিনি।

'পেশার কারণে অনেক সময় অবিচার মেনে নিতে হয়,' কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ড্রাইভার।

'দুনিয়া অনেক কঠিন জায়গা। ঠিক না, মিস্টার জয়?'

'ভারি।'

কতটুকু কঠিন তা ওরা টের পেল পোলক্যাট পঞ্চাশতম মাইল মার্কার পার হওয়ার পর।

কমলা রঙ করা স্টিল ড্রাম, ট্রেইলের পাশে উঁচু তুষার স্তূপে বসানো হয়েছে, ওগুলোই মাইল মার্কার।

হঠাৎ, বিনা নোটিশে, খক্-খক্ করে উঠে একেবারে থেমে গেল ইঞ্জিন। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল ওদের বাহন।

দশ

অন্তত দশবার স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করল লালা। ইঞ্জিন ঘোরে, কিন্তু ফায়ার করে না বা কাশিও দেয় না। অথচ এরইমধ্যে বাইরের বাতাস ভিতরের উষ্ণতা শুষে নিচ্ছে। মাত্র এক কি দু'মিনিটের মধ্যে খেয়াল করবার মত নেমে গেল তাপমাত্রা।

হঠাৎ বোমার মত বিস্ফোরণ ঘটল. যদিও কথাটা রানা স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠেই বলেছে। 'স্টার্ট নেয়ার তো কথা নয়, লালাজি। দেখছ না ফুয়েল ট্যাংক খালি!'

এতক্ষণে খেয়াল হলো সবার। ফুয়েল গজের দিকে তাকিয়ে দেখল রানার কথাই ঠিক।

'এটা স্যাবোটাজ, কোনও সন্দেহ নেই তাতে!' হুঙ্কার ছাড়লেন জামিল, 'এর জন্যে কে দায়ী?' এই মুহূর্তে তিনি আর হাসিখুশি অফিসার নন, দারজি লালাও নয় প্রশ্রয় পাওয়া ড্রাইভার। পদমর্যাদা মাথাচাড়া দিচ্ছে।

'তুমি চেক করোনি, লালা?' জামিলকে ইঙ্গিতে শান্ত হতে বলে জানতে চাইল রানা।

'গাড়িতে উঠে প্রথমেই চেক করেছি, সার। ট্যাংক তখন ফুল দেখাচ্ছিল, সার।'

'ঠিক জানো?' রানার কণ্ঠস্বর শান্ত, তবে কঠিন শোনাল।

'সার, কাঁটাটা ফুল-এর ঘরে ছিল। পরিষ্কার দেখেছি।'

'কে ফুয়েল ভরেছে? তুমি?'

'না, সার। আমি শেডে এসে দেখি ফুয়েল ভরা হয়ে গেছে। কাজটা বিশালা কালমুনাইয়ের লোকদের করার কথা।'

'তুমি শেডে এসে কর্নেল যাদব বা অন্য কোনও অফিসারকে দেখোনি?'

'না, সার।'

'মিস্টার জয়, আপনি যখন নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন, আপনারই কি উচিত ছিল না এ-সব দেখা?' শুকনো গলায় প্রশ্ন করলেন জামিল।

কী জবাব দেবে রানা? ব্যাপারটা মেলাতে পারছে না ও। কর্নেল যাদব কথা দিয়েও তা রাখবেন না? পোলক্যাটে স্যাবটাজ করা হতে পারে, এ-কথা তাঁকে বলবার পরেও?

'কী ভাবছেন বলবেন আমাকে, মিস্টার জয়?'

'এখন আমরা কোথায়?' গম্ভীর সুরে জানতে চাইল রানা। 'মাইল ফিফটিতে?'

'ফিফটির কাছাকাছি, সার,' জবাব দিল লালা।

'আমার পরামর্শ শুনবেন, মিস্টার জয়?' জিজ্ঞেস করলেন জামিল।

'বলুন।'

'ফিফটি-ওয়ানে একটা সেফটি ওয়ানিগান আছে, চলুন ওদিকেই হাঁটি।'

'সামনের ওয়ানিগানটা কত দূরে?' জিজ্ঞেস করল রানা। ওয়ানিগান মানে বড় আকৃতির একটা বক্স কার। 'তার আগে জানতে হবে বাতাস কোনদিকে, কত গতিতে বইছে।'

ড্যাশবোর্ড ডিসপ্লের বোতামে চাপ দিল দারজি লালা। 'পুবদিক ঘেঁষে দক্ষিণে বইছে বাতাস। ঘণ্টায় আটত্রিশ মাইল, সার।'

'আমরা সামনে এগোব,' বলল রানা। 'ওদিকের ওয়ানিগানটা কত দূরে?'

'ফোরটি-এইট মাইলে, সার।'

'একটু বেশি দূরে, তবে পিঠে বাতাস পাব।' জামিলের কাঁধে টোকা দিল রানা। 'সবার গায়ে সব আউটফিট আছে তো?'

'তা আছে, মিস্টার জয়।'

'পোলক্যাট ছেড়ে বেরুবার আগে চেক করে দেখতে চাই আমি। একেকটা আইটেম ধরে জবাব দিন।' তালিকা ধরে চেক করল ও–স্নো বুট, সক্স, লং জন, উলেন ট্রাউজার, উইন্ডপ্রুফ ট্রাউজার, ভেস্ট, শার্ট, উলেন জ্যাকেট, পারকা, হ্যাট, সিল্ক দিয়ে কিনারা মোড়া গ্লাভ আর ওভার-গ্লাভ। প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করবার সময় নিজের আইটেমগুলোও চেক করে নিল রানা।

সবশেষে বলল, 'ওকে, বয়েজ, লেট'স গো। পোলক্যাটটা ডিপ ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে মার্কার পোলের কাছাকাছি থাকব আমরা। দু'জন করে পাশাপাশি হাঁটব। আমি হাঁটব লালার সঙ্গে। মিস্টার জামিল হাঁটবেন মুরালির সঙ্গে। ঠিক আছে?'

খুক করে কেশে জামিল বললেন, 'আরেকটা কথা। পারকা হুডের ড্রস্ট্রিং জোরে টেনে আঁটো করতে হবে।' নিজেরটা টানলেন তিনি। 'না, আরও টাইট। ওখানে আসলে এক ইঞ্চির একটা অ্যাপারচার দরকার, যাতে ওটার ভেতর দিয়ে দেখা যায়। মূল ব্যাপার হলো, এভাবে আঁটো করে রাখলে নিঃশ্বাসের উষ্ণতা মুখের আশপাশে থেকে যায়।'

এরপর রানা যখন কথা বলল, ওর গলার আওয়াজ ভোঁতা শোনাল। 'কেউ আহত না হলে আমরা থামব না। স্ট্রেচারটা আমি টানছি। হ্যাঁ, এবার বেরুনো যেতে পারে।'

দরজা খোলা মাত্র সগর্জন বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর। বাইরে বেরিয়ে এসে হিম অন্ধকারে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, লালার সাহায্য নিয়ে পোলক্যাটের পাশে ফিট করা ক্লিপ থেকে স্টিল স্লেজ-স্ট্রেচারটা নামাচ্ছে রানা। কাজটা শেষ হতে সুইচ টিপে আলো নেভাল লালা, তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিল। ইতিমধ্যে বাকি তিনজনকে তুষারের বিপরীতে গাঢ় আকৃতি ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না।

তুষার পায়ের তলায় আলগা লাগছে, ওদের হাঁটবার ধরনটা তাই আড়ষ্ট, যেন শুকনো বালির উপর দিয়ে এগোচ্ছে।

খানিক পর স্ট্রেচারটা রানার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন জামিল। এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে স্ট্রেচার আর তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। প্রতি দশ কদম পর ওর কাঁধে টোকা মারছে লালা।

টোকাটা যখন প্রথমবার লাগল, ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। কিন্তু সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছে লালা, থামল না বা তাকাল না। ব্যাপারটা তখন নিজেই বুঝে নিল রানা।

দৃষ্টিসীমা দ্রুত কমে এলে যোগাযোগ রক্ষা করবার একটা পদ্ধতি এটা। গ্রিনল্যান্ড আইসক্যাপে যাঁরা বসবাস বা কাজ করে, এরকম অসংখ্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তাদের। দশ পা এগোও, টোকা; দশ পা এগোও, টোকা।

হিসাব করছে রানা। দুই মাইল হাঁটতে হবে। প্রতি পদক্ষেপ ত্রিশ ইঞ্চি। সব মিলিয়ে কত পদক্ষেপ দরকার? কত টোকা?

বেশি সময় লাগল না, পাওয়া গেল হিসাবটা। চার হাজারের কিছু বেশি কদম, টোকা পড়বে চারশোর কিছু বেশি।

ওদের সামনে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে মুরালি আর জামিল। দু'জনের বয়সের পার্থক্য কমকরেও বিশ বছর, তবে জামিলই বেশি শক্তিশালী; অনায়াস ভঙ্গিতে এগোচ্ছেন তিনি, ভাব দেখে মনেই হচ্ছে না একটা স্ট্রেচার টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর পাশে থাকবার জন্য প্রায়ই নিজের হাঁটবার গতি বাড়াতে হচ্ছে মুরালিকে।

ওদের চারপাশে চাবুকের মত আঘাত করছে বাতাস, তবে সামনে ঠেলেও নিয়ে যাচ্ছে।

পৌনে এক মাইল বা তার কিছু বেশি এগোবার পর ঠাণ্ডার কামড় অনুভব করল রানা। কায়িক পরিশ্রম ঠেকিয়ে রেখেছিল, সন্দেহ নেই; কয়েক প্রস্থ গরম পরিচ্ছদের অবদানও কম না। প্রথমে পায়ে ধরা পড়ল ঠাণ্ডাটা।

একটু পর ওর সামনে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মুরালি। তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সিধে হলো সে, জামিলের পাশে থাকবার জন্য ছুটল।

ওয়ানিগানের কাছে হঠাৎ করেই পৌঁছে গেল ওরা। রানা আসলে দেখতে পেত কিনা সন্দেহ। জামিল আর মুরালি নিশ্চয়ই দূরত্বটা আন্দাজ করতে পেরেছে, কিংবা মার্কার ব্যারেলে কোন চিহ্ন আছে, কারণ হঠাৎই তারা ডানদিকে বাঁক নিল।

ওদের পিছু নিয়ে কিছু দূর এগোতেই কমলা রঙের চৌকো আকৃতিটাকে

সামনে ঝুলে থাকতে দেখল রানা। ওটার গায়ে আট ফুট উঁচু তুষার জমেছে, ফলে উপরের মাত্র ফুট দুয়েক ধরা পড়ল চোখে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন জামিল, হাত দিয়ে তুষার সরিয়ে কী যেন খুঁজছেন তিনি।

তুষারের ভিতর থেকে একটা কোদাল বের করে আনলেন জামিল। সেটা চেয়ে নিয়ে তুষার সরাতে শুরু করল মুরালি।

ওয়ানিগানের দরজা থেকে তুষার সরাতে মাত্র দু'মিনিট লাগল, কিন্তু তাতেই মনে হলো জমে বরফ হয়ে যাবে সবাই। হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল ওরা।

ভিতরটা হকচকিয়ে দেওয়ার মত স্থির আর নীরব। স্টোভ জ্বালা হলো। ওয়ানিগানটা চারজনের জন্য যথেষ্ট বড়, চার হপ্তা প্রাণ ধারণের প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুই মজুদ করে রাখা আছে এখানে, এমনকী একটা ওয়াল-র‍্যাক ভর্তি তরল গ্যাসের বোতল পর্যন্ত।

রানা অবশ্য প্রথমেই খোঁজ করল রেডিওর। স্টিলের একটা দরজা থেকে সেটটা বের করলেন জামিল।

সুইচ অন করে নেতাজি ক্যাম্পকে ডাকল রানা। প্রচুর যান্ত্রিক শব্দজট ভেসে এলেও, ওদিক থেকে সাড়া পাওয়া গেল। রানা জানাল, 'ওয়ানিগান ফিফটিন টু হানড্রেড। পোলক্যাট ইনঅপারেটিভ, রিপিট পোলক্যাট ইনঅপারেটিভ। ইনফর্ম কর্নেল যাদব।'

'দিস ইজ ক্যাম্প নেতাজি। স্ট্যান্ড বাই।'

দু'মিনিট পর লাইনে এলেন কর্নেল যাদব। সরাসরি জানতে চাইলেন, 'কী ব্যাপার, মিস্টার জয়, কী ঘটল?'

'যাই ঘটে থাকুক, ব্যাখ্যা দিতে হবে আপনাকে,' বলল রানা, রাগ গোপন রাখবার কোন চেষ্টাই করছে না। 'ট্যাঙ্কে পুরোপুরি ফুয়েল ভরা হয়নি, অথচ ফুয়েল গজের কাঁটা ফুলের ঘরে ছিল। এদিকটা না আপনার দেখার কথা?'

'হ্যাঁ,' শান্তভাবেই জবাব দিচ্ছেন কর্নেল যাদব, কিছুটা যেন বিস্মিত। 'সব কাজ তো আর নিজে উপস্থিত থেকে করা সম্ভব নয়, তাই আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত একজনকে ডেকে বলে দিই সবদিকে যেন কড়া নজর রাখা হয়। অথচ আপনি বলছেন ফুয়েল ট্যাঙ্ক পুরোপুরি ভরা হয়নি?'

'না, হয়নি,' বলল রানা। 'জানতে পারি, মিস্টার যাদব, আপনার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেই লোকটা কে?'

'হ্যাঁ, পারেন। নেতাজি ক্যাম্পের সবচেয়ে পুরানো লোকদের একজন সে। বিশালা কালমুনাই, ট্র্যাক্টর শেডের ইনচার্জ।'

'ওহ্ গড!' মনে মনে গুঙিয়ে উঠল রানা। মাউথপিসে বলল, 'এ-ব্যাপারে পরে আলাপ হবে। শুনুন, আমরা চলতি-কা-নাম-গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'কিন্তু তাতে কী লাভ? কমান্ডার ঘিসিং থাপার সঙ্গে শুধু ফুয়েল আর খাবার আছে, নিউপ্রিন নেই। এদিকে আমরা নতুন একটা বিপদে পড়েছি।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা। 'কী বিপদ?'

'আমরা আরেকটা জেনারেটর হারিয়েছি।'

কথাটা বোধহয় ঠিক, আইসক্যাপে যে-কারও মগজ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কাজ করে। কর্নেলের সঙ্গে কথা বলবার অন্তত দশ মিনিট পর চিন্তাটা রানার মাথায় এল।

'চলতি-কা-নাম-গাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন?' জামিলকে জিজ্ঞেস করল ও।

'অবশ্যই। ট্রেনটা বোধহয় মাইল দশেক দূরে এখন। ওদেরকে বলতে হবে আমরা কোথায়। পোলক্যাটকে ওরা দেখতে পাবে আট মাইল এগোবার পর। মনে আছে তো, এখানে আমরা হেঁটে এসেছি?'

'শুনুন,' বলল রানা, 'বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে পৌছানোর একটা সুযোগ এখনও আমাদের আছে।'

মাথা নাড়লেন জামিল। 'স্লো ট্রেন তো কোন ট্র্যাক্টর স্পেয়ার করতে পারবে না...' হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। হাসলেন নিঃশব্দে। 'আপনি বড়ে মিয়ার কথা ভাবছেন, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনি জানেন না, তবে কর্নেল যাদব তাই বলে দিয়েছেন। তাঁর প্ল্যানটা আমারও পছন্দ।'

জামিলের মুখ থেকে ধীরে ধীরে মুছে গেল হাসিটা। 'কিন্তু, না,' বললেন, 'এ ঝুঁকি নেয়া চলে না। চালিয়ে পরীক্ষা করবার জন্যে আনা হয়েছে ওই হোভারক্রাফট। সেই পরীক্ষাটাই তো করা হয়নি। চলতি-কা-নাম-গাড়ি একবার চলে যাবার পর পঞ্চাশ মাইল ফাঁকা জায়গার ভেতর পড়ে যাবেন।'

রানা বলল, 'এ-ধরনের হোভারক্রাফট সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা আছে। আমার বিশ্বাস, পরীক্ষায় ওটা পাস করবে। তা ছাড়া, ভেবে দেখুন, বড়ে মিয়াকে কাজে না লাগালে বঙ্গবন্ধু ক্যাম্প থেকে ..ইপ আনা সম্ভব না। এখানে পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে স্লো ট্রেনটার?'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন জামিল। 'নির্ভুল হিসাব দেয়া সম্ভব নয়। দশ, কিংবা বারো মাইল দূরে রয়েছে ওটা। ঘণ্টায় তিন মাইল ভাল স্পিড বলা যায়।'

'তাহলে...'

'কিন্তু এই স্পিড ওরা ধরে রাখতে পারে না। প্রতি তিন মাইল পরপর জোড়া লাগানো বুলডোজারগুলোকে আলাদা করা হয় ওয়ানিগানগুলোকে তুষারের ওপর টেনে তোলার জন্যে, ওগুলো যাতে পুরোপুরি চাপা না পড়ে যায়।'

'বেশ অনেকটা সময় বেরিয়ে যায়।'

'হ্যাঁ, প্রতিবার। ট্রেন আবার জোড়া লাগাতেও সময় লাগে। ড্রাইভার বদলের জন্যে থামতে হয়। কিংবা হঠাৎ দেখা গেল সামনে নতুন একটা ফাটল। ভাগ্য ভাল হলে ধরুন পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছাবে। আর ভাগ্য খারাপ হলে বারো থেকে চোদ্দ ঘণ্টার ধাক্কা। কয়েকদিনও লেগে যেতে পারে, আমরা যদি অভিশপ্ত হই।'

'দশ কি বারো মাইল পেরুতে?'

'আপনাকে আগেও বলেছি, মিস্টার জয়। এমনও দেখা গেছে যে চলতি-কা-নাম-গাড়ির পৌঁছাতে সময় লেগেছে পুরো ছয় হপ্তা।'

তারচেয়ে দ্রুত হবে, ভাবল রানা, নেতাজি ক্যাম্প থেকে কর্নেল যদি নতুন আরেকটা পোলক্যাট পাঠান—কিংবা বঙ্গবন্ধু ক্যাম্প থেকে কর্নেল শর্মা।

কথাটা বলল রানা।

শুনে মাথা নাড়লেন জামিল। 'বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে পোলক্যাট নেই, আছে শুধু হাফ-ট্রাক, আর বছরের এই সময়, মানে এরকম খারাপ আবহাওয়ায় ওগুলো তেমন কাজে আসে না।'

'বেশ, বুঝলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু স্লো ট্রেনের সঙ্গে একটা স্পেয়ার ট্র্যাক্টর থাকে না?'

মাথা ঝাঁকালেন জামিল। 'ফাটল ভরার জন্যে একজোড়া অতিরিক্ত বুলডোজার আছে।'

'ওগুলোর একটা বক্স কার সহ বড়ে মিয়াকে নিয়ে আসুক,' বলল রানা। 'ট্রেন থেকে ওই বক্স কার আলাদা করতে হবে। বুলডোজারের স্পিড কত?'

'ঘণ্টায় পাঁচ কি ছয় মাইল।'

'তারমানে এখানে পৌঁছাবে দু'ঘণ্টায়। তারপর আরও দু'ঘণ্টায় আমরা বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে পৌঁছে যাব। ঘুরে ফিরতি পথ ধরলে...চলতি-কা-নাম-গাড়ি সম্ভবত এই পয়েন্টে আসার আগেই নেতাজি ক্যাম্পে পৌঁছে যাব আমরা।'

'আপনার সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে অনেক কিছুই আমরা জানি না। এই পরিবেশ আর আবহাওয়ায় এত আত্মবিশ্বাস আসে কোত্থেকে?'

'কারণ আছে। এ-ধরনের মেশিন আমি চিনি।'

'কিন্তু আইসক্যাপ নয়।'

'আপনি চেনেন। মুরালি চেনে, লালা চেনে। আপনারা পালা করে হাত ধরবেন আমার।'

হঠাৎ মাথা ঝাঁকালেন জামিল, দাঁড়ালেন, রেডিওর কাছে গিয়ে চাপ দিলেন সুইচে। 'সেফটি ওয়ানিগান ফিফটিন টু চকানাগা।' মেসেজটা পুনরাবৃত্তি করে অপেক্ষায় থাকলেন।

'চকানাগা বলছি, ওয়ানিগান ফিফটিন। কারা তোমরা গর্তে মুখ লুকালে?'

'এখানে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শওকত জামিল। ট্রেন কমান্ডার ঘিসিং থাপাকে দাও। কুইক!'

কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। তারপর নতুন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'থাপা, মিস্টার জামিল। আশ্রয় নিতে হয়েছে বলে দুঃখিত। সকালের মধ্যে দেখা হচ্ছে।'

'আমি কথা বলব,' জামিলের পাশে এসে দাঁড়াল রানা।

'শুনুন, থাপা,' রেডিওর মাউথপিসে বলল জামিল। 'মিস্টার বিজয় হাসান সম্পর্কে শুনেছেন আপনি? বাংলাদেশী পুলিশ আফিসার? ডিআইজি?'

'কে শোনেনি? ডক্টর ফারুকের কেসটা তদন্ত করতে এসেছেন।'

'হ্যাঁ। তো আমরা ওই ভদ্রলোকের আন্ডারে পোলক্যাট নিয়ে বেরিয়েছি। ভাল হয় আপনি যদি এখন ওঁর সঙ্গে কথা বলেন।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

মাউথপিসে রানা বলল, 'হাই! শুনুন, থাপা–প্রথমে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। আপনার ট্র্যাকশান পুরোপুরি অপারেশনাল? নাকি কোন ইউনিট বসে গেছে?'

'জি নেহি, উপ্পরওয়ালা সাব ঠিক রাখ্‌খা।'

'সেক্ষেত্রে একটা বুলডোজার ধার দিতে পারবেন?'

'ধার...এই যে ভাই, কী জন্যে?' ঘিসিং থাপার কণ্ঠস্বর কঠিন শোনাল।

বেশ স্পষ্টভাবেই আরেকটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ওরা, 'ইয়ে আদমি পাগল হ্যায় কিয়া?' লোকটা সম্ভবত রেডিও অপারেটর।

হেসে উঠল রানা। বলল, 'ওকে বলুনঃ না, স্রেফ একজন ইনভেস্টিগেটর।'

জবাবে ট্রেন কমান্ডারও হাসল। 'মাফ করবেন, মিস্টার জয়, আমার কপালে সত্যিকার একজন বাচাল জুটেছে। আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনার সমস্যাটা ব্যাখ্যা করবেন, প্লিজ?'

'যে বক্স কারে বড়ে মিয়া আছে,' বলল রানা। 'আমি চাই একটা বুলডোজার যথাসম্ভব দ্রুত ওটাকে এখানে পৌঁছে দিক। তাহলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হতে পারব। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি।'

'ওটা এক্সপেরিমেন্টাল, মিস্টার জয়। তাছাড়া ড্রাইভার অসুস্থ হয়ে বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে পড়ে আছে।'

'ড্রাইভার দরকার নেই, আমি নিজে চালাব।'

'ঠিক আছে তা হলে। ব্যবস্থা করছি।'

'কী রকম সময় লাগবে?' জানতে চাইল রানা।

'মাইল ফোরটির কাছাকাছি রয়েছি আমরা, তবে পথে দু'একটা ফাটল পড়ছে। আমি এমন লোকদের পাঠাচ্ছি, যারা সাধ্যমত তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর চেষ্টা করবে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে রেডিও বন্ধ করে দিল রানা।

'কর্নেল খুব সাবধানী মানুষ তো, তাই,...' শুরু করলেন জামিল।

'সত্যি কী সাবধানী? তাহলে একের পর এক এতগুলো স্যাবটাজের ঘটনা কী করে ঘটছে?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

চুপ করে আছেন জামিল।

'এতই যদি সাবধানী,' আবার বলল রানা, 'তা হলে নেতাজি ক্যাম্পে অতিরিক্ত পাইপ নেই কেন?'

জামিলের ভুরু জোড়া নেমে এল। 'ওটা টপ সিক্রেট।'

'নিউপ্রিন? পাগল হলেন?'

'নিউপ্রিন নয়। তথ্যটা।'

রানা লক্ষ করল, জামিলের কোঁচকানো ভুরু জোড়া নীচে যেন থাকতে চাইছে না। ঘন ঘন নড়ছে ওগুলো, সেই সঙ্গে জামিলের কালো চোখের তারায় কীসের যেন একটা ঝিলিক দেখা যাচ্ছে।

তাগাদা দিল রানা। 'বলে ফেলুন।'

এখন আসলেও হাসছেন জামিল, কাঁধ দুটো কাঁপছে। বললেন, 'কর্নেল যাদব ভুলে গেছেন। পাইপ আনার কথা তাঁর মনে ছিল না।'

নিঃশব্দে হাসল রানা; অন্তত এমন একটা রহস্য পাওয়া গেল যেটার মধ্যে সত্যিই কোন রহস্য নেই।

জামিল জানতে চাইলেন, 'চাইলেই যখন খুশি ঘুমিয়ে পড়তে পারেন, মিস্টার জয়?'

'তা পারি। কেন?'

'এখন দেখুন পারেন কিনা। হাতে দু'ঘণ্টা সময় পাচ্ছেন।'

হাসল রানা। 'ঘুমালে তো চলবে না। জরুরি কাজ আছে আমার।'

'এখানে আপনার আবার জরুরি কাজ কী? তদন্তের কাজ তো নেতাজি ক্যাম্পে ফিরে করবেন।'

'সে আপনি বুঝবেন না,' বলল রানা। 'আপনারা ঘুমান, আমি হাতের কাজটা সেরে রেডিওতে নিচু স্বরে কথা বলব–কথা দিচ্ছি, ডিসটার্ব করব না।'

'রেডিওতে আপনি…কার সঙ্গে কথা বলবেন, মিস্টার জয়?'

তাঁর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। নিজের এয়ারলাইন ব্যাগ খুলে কর্নেল যাদবের কাছ থেকে পাওয়া কমপিউটার প্রিন্ট-আউটগুলো বের করল।

নেতাজি ক্যাম্পের কমিউনিকেশন হাটে যত মেসেজ এসেছে, আর ওখান থেকে যত মেসেজ পাঠানো হয়েছে তার ছ'মাসের রেকর্ড এগুলো। দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে রানা, মাঝে মধ্যে একটা নোটবুকে পেন্সিল দিয়ে দু'একটা নাম-ঠিকানা টুকছে।

কাজটা শেষ করতে আধ ঘণ্টা লাগল। আঠারোজনের নাম ঠিকানা টুকেছে রানা। বেশিরভাগই শ্রীলঙ্কার।

ভাগ্যটা বেশ ভালই বলতে হবে ওর। রেডিও অন করে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে খুঁজতে একটু পরেই যোগাযোগ ঘটে গেল থিউল কমিউনিকেশন সেন্টারের সঙ্গে। প্রতিষ্ঠানটা গ্রিনল্যান্ড সরকারের হলেও, সম্প্রতি বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওদের রেডিও অপারেটরকে একটা অনুরোধ করল রানা–'মিস্টার শহীদুল হক যদি যোগাযোগ করেন, তাকে এই মেসেজটা দিতে হবে: বিজয় হাসান আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।' শহীদুল হক হলো রানা এজেন্সির কুইবেক শাখার প্রধান।। রানাকে জানতে হবে হাতের কাজ শেষ করে থিউলে সে পৌঁছাতে পেরেছে কিনা।

'মিস্টার হাসান, সার,' রেডিও অপারেটর হঠাৎ বলল, 'এক মিনিট অপেক্ষা করুন, প্লিজ।' মাত্র দশ সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হলো, এবং রানাকে অবাক করে দিয়ে মাউথপিস থেকে বেরিয়ে এল রেডিও অপারেটরের বদলে পরিচিত কণ্ঠস্বর। 'কেমন আছেন, মাসুদ ভাই? আমি শহীদুল হক।'

'ভালো। তুমি ভালো তো, শহীদ?' বলল রানা, উত্তরের অপেক্ষায় থাকল না। 'কাগজ কলম বের করো। কয়েকটা ঠিকানা দিচ্ছি। খোঁজ নিয়ে জানবে এরা কারা। যদি দেখো ক্রিমিনাল, তা হলে পুলিশ বা আমাদের এজেন্সিকে দিয়ে কড়া

নজরদারির মধ্যে রাখবে। ঠিক আছে?'

রানার ভারি গলা শুনে সতর্ক হলো শহীদ। 'কাগজ-কলম রেডি।'

দশজন সিংহলীর নাম আর ঠিকানা বলে গেল রানা, সবশেষে নিজের মিনি রেডিওর ফ্রিকোয়েন্সি জানিয়ে বলল, 'যে-কোন মেসেজ এখানে পাঠাবে।'

'ঠিক আছে।'

'আরও আটটা নাম-ঠিকানা লেখো,' বলল রানা। এই ঠিকানাগুলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা আর ইউরোপের কয়েকটা দেশের। 'এগুলো সম্পর্কে শুধু খবর নেবে, তারপর রিপোর্ট করবে আমাকে, কোন ব্যবস্থা নিতে হবে না।'

'জী, মাসুদ ভাই।'

যোগাযোগ কেটে দিল রানা। ও ভেবেছিল এরকম প্রায়-ভেন্টিলেশনবিহীন ওয়ানিগানে ঘুম আসবে না, কিন্তু শুতে না শুতে আপনা থেকেই বুজে এল চোখ।

সেই ঘুম আকস্মিক ঠাণ্ডা বাতাসের বিস্ফোরণে ভাঙল। ট্র্যাক্টর এসে পৌঁছানোর খবর দেওয়ার জন্য খোলা হয়েছে ওয়ানিগানের দরজা। ঢুলু-ঢুলু চোখ নিয়ে সিধে হলো রানা, হাত চালিয়ে কাপড় পরে নিল।

বুলডোজারের ড্রাইভার একটা সমস্যার কথা জানাল, সে নাকি দু'ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করেও সমাধান করতে পারছে না। সঙ্গে ক্রেন নেই, ফ্ল্যাটবেড থেকে বড়ে মিয়াকে নামানো হবে কীভাবে?'

'সেটা বোধহয় তেমন কোনও সমস্যা হবে না,' বলল রানা। 'ঠিক আছে, আমি দেখে এসে বলছি। না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করো তুমি।'

'আপনার সঙ্গে আমিও যাচ্ছি,' বললেন জামিল। 'আপনাকে একা আমি ছাড়তে পারি না।'

দু'জন একসঙ্গে বাইরে বেরুল ওরা। একটু পরই ফিরে এসে কী করতে হবে ড্রাইভারকে জানাল রানা। 'বুলডোজারের ব্লেড দিয়ে আমাদের সেফটি ওয়ানিগানের পাশে তুষার জমা করো। মানে, আমি একটা র‍্যাম্প চাইছি। খুব যেন খাড়া না হয়, ঠিক আছে? ওই র‍্যাম্প ধরে বড়ে মিয়াকে নামিয়ে আনব।'

এক গাল হাসল ড্রাইভার। 'মাত্র এক মিনিটের কাজ, সার।'

বুলডোজারের সাহায্যে সেফটি ওয়ানিগানের গায়ে তুষারের ঢালু স্তূপ তৈরি করছে ড্রাইভার, মুরালি আর লালাকে নিয়ে রানা তখন ব্যস্ত বড়ে মিয়াকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা ধাতব বাঁধন খুলতে। হাতে গ্লাভ পরে থাকায় কাজটায় প্রচুর সময় লাগল।

মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে র‍্যাম্প তৈরি হয়ে গেল, কিন্তু হোভারক্রাফট ফ্ল্যাটবোর্ডের ডেক-বোর্ডিংয়ে স্থির হয়ে আছে। অবশেষে বুলডোজার ফেলে ওদের সাহায্যে এগিয়ে এল ড্রাইভার। 'তুষার জমে আটকে গেছে বুঝি?' রানার হুড লক্ষ করে চেঁচাল সে।

পাল্টা চিৎকার করে জবাব দিল রানা। 'না। স্ট্র্যাপ খুলতে সময় লাগছে।'

'দাঁড়ান, আমার কাছে কাটার আছে।'

'ধন্যবাদ।'

কাটার দিয়ে ইস্পাতের চেইনগুলো কেটে ফেলল রানা। তারপর উঠে বসল

বড়ে মিয়ার ক্যাবিনে। বিল্ট-ইন হিটার আছে, তাই ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে কোন সমস্যা হলো না। বুলডোজারের শক্তিশালী হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় ওদের চারজনকে ট্রেইলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা, গভীর আগ্রহ আর প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে।

সহজ, সাবলীলভাবে র‍্যাম্প বেয়ে নেমে এল বড়ে মিয়া। ওটাকে ঘুরিয়ে নিল রানা, দরজা খুলে হাতছানি দিল। জামিলের পিছু নিয়ে মুরালি আর লালা উঠে পড়ল। বুলডোজারের ড্রাইভার হাত নেড়ে ফিরে যাচ্ছে ওয়ানিগানের দিকে।

জামিল বললেন, 'চলতি-কা-নাম-গাড়ি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও।'

'ইঞ্জিন কিন্তু বন্ধ করেনি,' বলল রানা।

'হ্যাঁ। সেটাই নিরাপদ।'

'ওকে জিজ্ঞেস করেছেন, পথে ফাটলের কী অবস্থা?'

জামিল বললেন, 'স্নো ট্রেন রওনা হবার পর তিনটে ফাটল ভরাট করেছে। দুটো বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পের কাছাকাছি, আরেকটা মাইল টোয়েনটি-এইটে। শেষেরটা বিরাট। বিশ ফুট চওড়া, আর সম্ভবত একশো ফুট গভীর। আপনার কোন ধারণা আছে, আমাদের সামনে ওরকম এক-আধটা পড়লে বড়ে মিয়া কী করবে?'

'সেখানে কী স্নো-ব্রিজ থাকবে?'

জামিল বললেন, 'কখনও থাকবে, কখনও থাকবে না। থাকলে ওটার ওপর দিয়ে এটাকে আপনি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'জোরে ছুটলে প্রতি বর্গইঞ্চিতে চাপ খুব কম পড়ে,' বলল রানা। 'তা ছাড়া, এমনিতেও সারফেসের সঙ্গে যোগাযোগ খুবই কম। ফাটলটা যদি বড় আর খোলা হয়, আমাদেরকে সম্ভবত ঘুরে পার হতে হবে। সরুগুলোর ওপর দিয়ে ভেসে যাব।' অভয় দিয়ে হাসল রানা। 'চিন্তা করবেন না।'

স্পিড আরেকটু বাড়াল রানা। শূন্য অন্ধকার চিরে সামনে লম্বা হয়ে আছে উজ্জ্বল আলোর টানেল। বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ত্রিশ নট।

রানার পাশ থেকে লালা জানতে চাইল, 'হোভারক্রাফটের মজাটা কী, সার?'

'ক্রসওয়ার্ড পাজল-এর সমাধান ছাড়া বাকি সব পারে,' কৌতুকের সুরে বলল রানা। 'যদি স্পিডের কথা বলো, ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল ছুটতে পারবে।'

'পঞ্চাশ মাইল?' চোখ বড় বড় করল লালা।

'হ্যাঁ, পঞ্চাশ।' তবে রানা স্পিড ধরে রাখল চল্লিশে।

বারো মিনিট পর এক সারি আলো চোখে পড়ল। এই প্রথম একটা চলতি-কা-নাম-গাড়িকে কাছে আসতে দেখল রানা। গতি ধীরে ধীরে কমিয়ে এনে বড়ে মিয়াকে দাঁড় করিয়ে ফেলল ও। স্নো ট্রেন আকারে বিরাট, যেন তিনটে মালগাড়ি পাশপাশি ছুটছে। পার্থক্য হলো, ইঞ্জিনের বদলে প্রতিটি ট্রেনকে টানছে একটা করে ট্র্যাক্টর, মাল ভর্তি বক্স কার বা বগিগুলোর নীচে চাকার বদলে রয়েছে রানার। ওরা কেউ বাইরে বেরুল না। স্নো ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সিতে রেডিও অন করে ঘিসিং থাপার সঙ্গে কথা বলল রানা। শুধু হ্যালো আর গুডবাই, ব্যস।

এরপর আবার ওরা অন্ধকারে একা, ট্রেইল ধরে বিরতিহীন শুধু ছুটে চলা। রানার পাশের সিটে বসে দারজি লালা আশ্চর্য এক দৃষ্টিতে নজর রাখছে সামনে,

চোখের পাতা পড়ছে না বললেই চলে—অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা একের পর এক মার্কার পোলের পাশ কাটানো দেখছে, ওগুলোর কমলা পতাকা যেন ওদের উদ্দেশেই পতপত করছে, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পিছনে।

রানা তাকে একবার জিজ্ঞেস করল, 'পতাকাগুলো চোখের ভুল নয় তো?'

'জি-না, বাস্তব।'

'যদি দেখো ডান দিকে চক্কর মারছি, আমাকে থামিয়ো কিন্তু।'

লালা হেসে উঠল। 'আর রাজস্থানী মেয়েগুলোকে দেখতে পেলে, সার?'

ওদের সামনে ফাটল কোন সমস্যা হলো না। আইসক্যাপের মাথা থেকে ঢাল বেয়ে সমতল উপকূলীয় বিস্তৃতিতে নামতেও পারা গেল প্রায় অনায়াসে। সেফটি ওয়ানিগান থেকে রওনা হওয়ার দেড় ঘণ্টার মধ্যে ওদেরকে বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে পৌঁছে দিল বড়ে মিয়া।

জামিল রীতিমত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, বললেন, 'আপনি ভাই খুব দেখালেন! পুলিশের? কেউ বিশ্বাস করবে না!'

রানাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রবেশপথের ভিতর অপেক্ষা করছিলেন কর্নেল শঙ্কর দয়াল শর্মা। কুশল বিনিময়ের পর ওদেরকে নিয়ে সোজা মেস হলে চলে এলেন তিনি।

খাওয়াদাওয়ার পরে নিউপ্রিন পাইপ লোড করবার কাজ তদারক করতে চলে গেলেন শওকত জামিল, সঙ্গে নিলেন লালাকে। মুরালি তার দেশী লোকজনের সঙ্গে দাবা খেলতে বসল।

রানার অনুরোধে মুরালির নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিলেন কর্নেল শর্মা, তারপর নিজের কাজে ফিরে গেলেন তিনি।

রানার জন্য একটা ক্যাবিন বরাদ্দ করা হয়েছে, বিশ্রাম নিতে সেখানে ঢুকেছে পাঁচ মিনিটও হয়নি, পকেটের মিনি রেডিও জ্যান্ত হয়ে উঠল।

'শহীদুল হক।'

'বিজয় হাসান।'

'যে দশজনের নাম দিয়েছেন, মাসুদ ভাই। ওরা আসলে বিরাট একটা গ্যাঙ—নাম, ফিফটি পারসেন্ট। সব মিলিয়ে দুশোর বেশি সদস্য। ক্যান্ডি সহ শ্রীলঙ্কার অন্তত তিনটে শহরে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে।'

'কী ধরনের সন্ত্রাস?'

'ব্ল্যাকমেইল, চাঁদাবাজি, সম্পত্তি দখল, খুন, ভাঙচুর, আগুন লাগানো—এই সব। যাকে ধরে তার টাকা বা সম্পদের ফিফটি পারসেন্ট দাবি করে।'

'খোঁজ নিয়েছ, আন্তর্জাতিক ক্রিমিনালদের সঙ্গে এই ফিফটি পারসেন্টের কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ আছে কিনা? মাফিয়া, রেড ব্রিগেড, কিংবা আইআরএ, সিআইএ—এদের সঙ্গে?'

'ইন্টারপোলে খবর নিতে হবে...'

'থাক,' নিষেধ করল রানা। 'তুমি বরং রানা এজেন্সিকে দিয়েই আরও খোঁজ নাও, যতটা পার নিজেরাই চেষ্টা করে দেখো আর কী জানা যায়। শ্রীলঙ্কান পুলিশ কী বলছে?'

'বলছে ওরা অসহায়। তবে আমাদের এজেন্সি সাহায্য করলে ফিফটি পারসেন্টের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করতে রাজি আছে।'

'তার সময় এখনও আসেনি,' বলল রানা। 'আগে জানতে হবে গ্যাঙটা সাদাদের হয়ে কাজ করছে কি না।'

'সেক্ষেত্রে দু'একজকে সেফ-হাউসে ধরে এনে ইন্টারোগেট করতে বলতে হয়, মাসুদ ভাই।'

'বলো,' অনুমতি দিল রানা। 'এবার বাকি আটটা নাম-ঠিকানা সম্পর্কে রিপোর্ট দাও–কোডেড হওয়া চাই।'

'এত অল্প সময়ের নোটিশে, মাসুদ ভাই?'

'ঠিক আছে। তা হলে পরে।'

কথা ছিল পাইপ লোড করা হয়ে গেলেই ফিরতি পথ ধরবে ওরা, কিন্তু অঘটন ঘটাবার আর্কটিক প্রবণতা এমন বাড়াবাড়ি শুরু করল যে তুষার ঝড় ঘণ্টায় নব্বুই মাইলের নীচে নামতে চায় না। বঙ্গবন্ধু ক্যাম্প আইসক্যাপের নীচে, সেখানেই যদি এই অবস্থা হয় তা হলে উপরে কী ঘটছে কল্পনা করতেও ভয় লাগে।

তাপমাত্রা শূন্যাঙ্কের নীচে ষাট। ফিরে যাওয়ার কথা কেউ সাহস করে ভাবতেই পারছে না। এমনকী হাট ছেড়ে বেরুনোটাও বোকামির পর্যায়ে পড়ে, কারণ বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে বসবাসের আয়োজনটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

মেস হল বা ক্যাফেটিরিয়ায় ঠায় বসে থেকে ধূমায়িত মগ থেকে ব্র্যান্ডি মেশানো কফি খাওয়া চলল, রাতের বেশির ভাগটা কাটল গল্প-গুজব করে। তারপর যখন ঘুমাবার ইচ্ছে বা প্রয়োজন হলো, প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে লাইফ লাইন ধরে বিশ গজ পেরিয়ে ফিরল ওরা ডরমিটারি হাটে। বিশ গজ–শুনে দূরত্বটা খুব বেশি মনে হয় না, তবে রত্নে গোপালচন্দ্র কীভাবে মারা গেছে সেটা রানা উপলব্ধি করতে পারল।

পরদিন ঘুম ভাঙবার পর আবহাওয়া আরও খারাপ দেখল রানা। তারই মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে খেতে আসতে হলো মেস হলে।

এসে শুনল আবহাওয়া খারাপ হলে কী হবে, রেডিও খুব ভাল সার্ভিস দিচ্ছে।

কিন্তু নেতাজি ক্যাম্পের খবর ভাল নয়। ডিজেল জেনারেটর অচল হয়ে পড়েছে, সেটার এত বেশি ক্ষতি হয়েছে যে মেরামত করা খুব কঠিন। আরেকটা চালু থাকলেও, মতিগতি বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না।

রিয়্যাক্টর এখনও অকেজো হয়ে পড়ে থাকায় নেতাজি ক্যাম্পের পাওয়ার সাপ্লাই ভয়ানক টানাপোড়েনের মধ্যে রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত বড় একটা সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছেন কর্নেল যাদব, নতুন একটা কুয়া খোঁড়া হবে।

'পাইপ?' জানতে চাইল রানা।

উত্তরে কর্নেল জানালেন, পুরানো কুয়ার এক প্রস্থ নিউপ্রিন ব্যবহার করা হবে, যতটা সম্ভব পরিষ্কার করবার পর।

তবে নতুন কুয়া খুঁড়লেই শুধু হবে না, বিশুদ্ধতার কথা মনে রেখে অনেক

গভীর করতে হবে ওটাকে। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে যে তুষারপাত ঘটেছে, সেই স্তরের নীচে নামতে হবে ওদেরকে, অর্থাৎ সত্তর ফুট গভীর পর্যন্ত বরফ কাটতে হবে। তার উপরের স্তরগুলো রেডিয়েশন দূষণে দূষিত।

যোগাযোগ কেটে দিয়ে জামিলকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'পাইপগুলো কীভাবে পরিষ্কার করা হবে?'

'যতটুকু বুঝলাম, মাত্র একশো দশ ফুট পাইপ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাইপের ভেতর একটা লাইন ঢোকাবে ওরা, তারপর সেই লাইনে আটকে পরিষ্কার কাপড় টানা হবে ভেতর দিয়ে–ঠিক যেভাবে রাইফেলের ব্যারেল পরিষ্কার করা হয়। সবশেষে তুষার গলানো পানি দিয়ে ধোয়া হবে।'

'এই আবহাওয়ায়?'

'দেয়াল থেকে করাত দিয়ে বরফের বড় বড় টুকরো কাটবে ওরা, তারপর সেগুলো গলাবে,' বললেন জামিল। 'এতে তেমন সমস্যা হবার কথা নয়। কিছু সময় লাগবে হোস দিয়ে গরম পানি ছেড়ে কুয়াটা খুঁড়তে। পানি সরাবার জন্যে পাম্প ব্যবহার করতে হবে।'

'ব্যাপারটা এখন সিরিয়াস, তাই না?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দিলেন জামিল। 'মার্জিনের বড় বেশি কাছে। একটা জেনারেটর অচল, আরেকটা ভালভাবে চলছে না। অর্থাৎ একটা মাত্র জেনারেটর গোটা ফ্যাসিলিটিকে চালাচ্ছে। ওটার যদি কিছু হয়...'

লালা জিজ্ঞেস করল, 'তাতে কী, সার, ক্যাম্প বন্ধ হয়ে যাবে?'

'সঙ্গে সঙ্গে নয়,' বললেন জামিল। 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্ধ না করে উপায়ও থাকবে না–বিশেষ করে যদি না ওরা খুব তাড়াতাড়ি আবার রিয়্যাক্টরটা চালু করতে পারে। খাবার আর ফুয়েলই তো সব নয়, বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠবে তাপ আর পানি না থাকলে।'

কথাবার্তা সব ফুরিয়ে গেল ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে, অথচ ওদিকে তুষার ঝড় থামবার কোনও লক্ষণ নেই।

রানার সঙ্গে আরও দু'বার যোগাযোগ করল শহীদুল হক। দু'বারই কোড করা রিপোর্ট রিসিভ করল রানা। নেতাজি ক্যাম্প থেকে মাঝে মধ্যে যোগাযোগ করলেন কর্নেল যাদব। দুই কর্নেলের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলো। ইঞ্জিনিয়ার জামিলের সঙ্গেও কথা বললেন যাদব।

পরিষ্কার বোঝা গেল, রানার অস্তিত্ব তিনি যেন ভুলে থাকবার চেষ্টা করছেন। কর্নেল শর্মা বা জামিলের সঙ্গে আলাপ করবার সময় ওর প্রসঙ্গে একটা শব্দও তিনি উচ্চারণ করেননি।

জামিলের কাছ থেকে শুনল রানা, নেতাজি ক্যাম্পের খবর ভাল নয়। কুয়া খুঁড়বার জন্য প্রেশার স্টিম হোস ব্যবহার করতে হচ্ছে, ফলে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে অন্যদিকে।

অন্যান্য সব মেশিন বন্ধ না করলে বরফ গলাবার মত উত্তপ্ত বাষ্প প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। আবার বরফ গলাবার কাজ চালু রাখলে উত্তাপের অভাবে পানির পাইপ ঠাণ্ডায় জমে যেতে শুরু করে।

বাধ্য হয়ে থেমে থেমে, প্রতিবার এক পশলা করে বাষ্প ব্যবহার করা হচ্ছে, ফলে কুয়া তৈরির কাজ এগোচ্ছে ঢিমে তালে।

কর্নেল শর্মার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হলো জামিলের, এক জোড়া স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর থিউল থেকে প্লেনে করে নিয়ে গিয়ে প্যারাশুটের সাহায্যে নেতাজি ক্যাম্পে পৌছে দেওয়া যায় কিনা। কিন্তু আলাপ করাই সার, আইডিয়াটা বাস্তবসম্মত নয়। এখানকার তুষার ঝড় দেখে কল্পনা করা যায় আইসক্যাপের অবস্থা কী ভয়াবহ, পাইলট আকাশ থেকে নেতাজি ক্যাম্প দেখতেই পাবে না।

আর যদি কোন জাদুমন্ত্রবলে জেনারেটরগুলো কাছাকাছি কোথাও ফেলা সম্ভবও হয়, নেতাজি ক্যাম্পের লোকেরা তা না পাবে দেখতে, না পারবে সংগ্রহ করতে। বেরুলে তাদের বেরুতে হবে ট্র্যাক্টরে চড়ে; দৃষ্টিসীমা না থাকবার মত, গ্লাসের ভিতর দিয়ে আরও কম। তা ছাড়া, মিনিট কয়েকের মধ্যে প্যারাশুট সহ মেশিনারিগুলো চাপা পড়ে যাবে তুষারে।

নাহ্, নেতাজি ক্যাম্পকে কোনভাবেই তাঁরা সাহায্য করতে পারছেন না।

এই পর্যায়ে ওদের আলোচনায় যোগ দিল রানা। এতক্ষণ নীরব দর্শক সেজে শুনছিল শুধু। জানতে চাইল, 'একটা জেনারেটরের ওজন কত, যেটা পাঠাবার কথা ভাবছেন আপনারা?'

কর্নেল শর্মা জানালেন, 'এটা ছোট মডেলের। আউটপুটও কম। দু'হাজার পাউন্ড।'

রানা বলল, 'সেক্ষেত্রে বড়ে মিয়ায় তুলে ওটাকে নিয়ে যাওয়া কোন সমস্যা নয়।'

কর্নেল শর্মা আর জামিল, দু'জনেই কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

নিরেট তথ্য আর অঙ্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল রানা। 'তা ছাড়া, চল্লিশ নট বাতাস হোভারক্রাফটকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তুষারও না। ফাটলের ওপর দিয়ে উড়ে যাব আমরা।'

পরস্পরের দিকে তাকালেন ওঁরা দু'জন। তারপর জামিল বললেন, 'সব মিলিয়ে আড়াই হাজার পাউন্ড বোঝা। আপনি ঠিক জানেন?'

'জেনেই বলছি।' হাসল রানা। 'লিটারেচার পড়া থাকলে আপনারাও জানতেন, হোভারক্র্যাফটেই রাখা আছে। জেনারেটর দু'হাজার পাউন্ড তো? কোন সমস্যা নয়। তারপরও একজনের জায়গা হবে।'

তবে রানা জানে, একটা ওয়েদার স্লট দরকার হবে ওদের; প্রায় ঘণ্টা তিনেকের একটা ফাঁক বা বিরতি।

অবশেষে সেটা পেলও ওরা।

জেনারেটর নিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, বাকি আর কিছু নিয়ে যাওয়া হবে না। আর কিছুর সংখ্যা তিনটে–দু'জন মানুষ আর নিউপ্রিন পাইপ।

কর্নেল শর্মা বললেন, 'এটা একটা ভাল সিদ্ধান্ত বলে মনে করি আমি, তবে অনুমোদনটা আসা উচিত নেতাজি ক্যাম্প থেকে।'

যোগাযোগ করা হলো। রেডিও আগের মত ভাল সার্ভিস দিচ্ছে না। তারমানে সিগন্যাল কোয়ালিটি সব সময় আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে না।

খারাপ আবহাওয়ায় ভাল সার্ভিস পাওয়া যায়, অথচ আবহাওয়া যখন ভাল হতে শুরু করে সার্ভিসের মান তখন খারাপ হয়ে যায়।

তবে কর্নেল যাদবের ভারী কণ্ঠস্বর চিনতে পারা গেল।

ইতিমধ্যে এক প্রস্থ নিউপ্রিন পরিষ্কার করা হয়েছে ওখানে। আপাতত কাজ চালানো যাবে আর কী। তবে ডিজেল ফিটাররা রাতদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে–একটা জেনারেটর পুরোটা খুলে আবার জোড়া লাগাতে হচ্ছে, দ্বিতীয়টায় চলছে কঠিন মেরামতের কাজ। হ্যাঁ, জানালেন কর্নেল যাদব, নতুন একটা জেনারেটর পেলে বর্তে যান তিনি।

তবে ইঞ্জিনিয়ার জামিলকে তাঁর ভারী দরকার। মিস্টার জয় যেন মুরালি আর লালাকে বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে রেখে আসেন।

'আমাকে কথা বলতে দিন,' কর্নেল শর্মাকে বলল রানা, তারপর তাঁর বাড়ানো হাত থেকে মাউথপিসটা নিল। 'জয়, কর্নেল যাদব। দুঃখিত, আমি শুধু লালাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

অপরপ্রান্তে দু'সেকেন্ড কোন শব্দ করলেন না কর্নেল যাদব। 'আপনি মিস্টার জামিলকে নিয়ে আসবেন, মিস্টার জয়। তাঁকে এখানে আমার দরকার।'

'আমার দরকার অভিজ্ঞ কোন ড্রাইভারের একজোড়া চোখ,' বলল রানা। 'চাই না ট্রেইল ছেড়ে আরেক দিকে সরে যাই।'

'আপনি আমার লোককে ওখানে ফেলে আসতে পারেন না!' রেগে গেলেন কর্নেল যাদব, প্রায় চেঁচাচ্ছেন।

'পারি, মিস্টার যাদব,' রানা শান্তকণ্ঠে বলল।

'কী বললেন?' রাগ নয়, বিস্ময়ের ভয়ানক একটা ধাক্কা খেয়েছেন নেতাজি ক্যাম্পের কমান্ডার। 'আরেকবার বলুন তো!'

'প্রয়োজন দেখি না,' বলল রানা। 'কারণ প্রথমবারই শুনতে পেয়েছেন আপনি। বরং আরও একটু ব্যাখ্যা করতে পারি।'

'কী ব্যাখ্যা করতে পারেন?' উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছেন কর্নেল যাদব।

'আপনি যে মারাত্মক অপরাধ করেছেন, ভাবছি আমি রিপোর্ট করব কি না...

'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! আমার অপরাধের কী প্রমাণ আছে আপনার কাছে?'

'আমি আসছি, তখন শুনবেন,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

কর্নেল যাদবের সঙ্গে এভাবে ওর কথা বলাটা কর্নেল শর্মা বা ইঞ্জিনিয়ার জামিল যে ভালভাবে নেননি, সেটা রানা তাঁদের দিকে একবার তাকাতেই বুঝতে পারল। তবে ওর যুক্তি মেনে নেওয়ার মত বোধ আর উদারতা তাঁদের আছে।

রানাকে খুশি করে দিয়ে গ্রিনল্যান্ড আবহাওয়া দফতর প্রচার করল, স্যাটেলাইট সার্ভে থেকে জানা গেছে, কয়েক ঘণ্টার জন্য বাতাসের দাপট কমতে যাচ্ছে, সেই অনুপাতে তুষারপাতও।

কাজেই ওরা বেরিয়ে পড়ল। ক্ষণস্থায়ী দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে ফুরিয়ে গেল। রাতটা গহন কালো আর আকাশে নেই চাঁদ। বঙ্গবন্ধু ক্যাম্প ছেড়ে আসবার পর থেকে যতই উপরে উঠছে বড়ে মিয়া, বাতাসের গতিবেগ ততই

বাড়ছে।

হোভারক্রাফটের সামনের দুটো স্কি বের করে রেখেছে রানা, আকস্মিক দমকা বাতাস যাতে সামাল দিতে পারে। কানাডিয়ান কোম্পানির এই মডেলটা আইসক্যাপের উপযোগী করেই তৈরি করা হয়েছে, কাজেই তুষার ঝড় বা আর্কটিক ফাটল এটার পথে কোন বাধা তৈরি করতে পারছে না।

দু'ঘণ্টা ট্রেইল ধরে ছুটবার পর মাইল ফোরটি মার্কারকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। এই সময় রানা দেখতে পেল ওর দৃষ্টি মিটমিটে সহস্র আলোর টুকরো হয়ে যাচ্ছে–বিদ্যুচ্চমকের আকৃতি; মাথার একপাশে ব্যথা, বমি-বমি ভাব।

কী ঘটছে লালাকে জানাল রানা। লালা হোভারক্রাফট থামাতে বলল; তারপর ইঞ্জিন অলস করে রাখতে হবে। তার কথা মেনে নিল রানা।

সিটের উপর ওকে শুইয়ে দিল লালা, শেষ প্রান্ত থেকে নীচের দিকে মাথাটা ঝুলছে। 'এবার,' বলল সে, 'চোখ বুজে গভীর মনোযোগের সঙ্গে নিজের মাথার ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করুন। দেখতে চেষ্টা করুন খুলির ভেতর কী আছে।'

বাধ্য ছেলের মত চেষ্টা করল রানা, তবে কোন লাভ হচ্ছে বলে মনে হলো না।

হঠাৎ রানা খেয়াল করল ওর পাশে একটা লাইটার ক্লিক করল, সেই সঙ্গে নাকে গন্ধ ঢুকল ধোঁয়ার। তারপর ওর ঠোঁটের ফাঁকে একটা সিগারেট গুঁজে দেওয়া হলো। 'টান দেন, সার,' বলল লালা। 'সিগারেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত চোখ খুলবেন না।'

ধোঁয়া গিলছে রানা, নিজেকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে গ্রিনল্যান্ড ত্যাগ করবার পর আবার ধূমপান ছেড়ে দেবে, সেই সঙ্গে কল্পনার চোখে দেখবার চেষ্টা করছে খুলির ভেতর কী আছে। অনুভব করল, ওর পেশি ব্যথা করছে। আঙুলে আগুনের আঁচ লাগতে লালা বলল, 'ঠিক আছে, সার। এবার চোখ খুলে তাকান।'

তাকাল রানা। মাথা তুলল। সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্ন বোধ করল ও। তবে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যাওয়ার পর, দু'মিনিটের মধ্যেই, ওর দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেল।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'এটা কার মাথা থেকে বেরিয়েছে?'

'কেউ জানে না, সার,' বলল লালা। 'বহু যুগ ধরে এক ড্রাইভারের মুখ থেকে আরেক ড্রাইভার শুনে আসছে। তবে কাজের জিনিস, সার।'

'সন্দেহ নেই।'

আবার রওনা হলো বড়ে মিয়া। পাঁচ মাইল পর চলতি-কা-নাম-গাড়িকে পাশ কাটাল ওরা; যেন মৌমাছি ছাড়িয়ে এল গুবরে পোকাকে, শুভেচ্ছা হিসাবে বিনিময় হলো শুধু হেডলাইটের আলো, থামাথামির মধ্যে গেল না কেউ।

বাতাসের গতিবেগ আরও খানিক বেড়েছে। গত বিশ মাইল প্রায় একটা সরলরেখা ধরে ছুটছে বড়ে মিয়া। রওনা হওয়ার তিন ঘণ্টা বিশ মিনিটের মাথায় নেতাজি ক্যাম্পে পৌঁছে গেল ওরা।

ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্য কর্নেল যাদব আশপাশে কোথাও নেই দেখে একটু স্বস্তি বোধ করল রানা। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় আপাতত তোলা থাকুক, এই মুহূর্তে অসম্ভব ক্লান্ত ও।

ট্র্যাকশান শেডে বড়ে মিয়াকে নিরাপদে পার্ক করা হলো। মাথায় ব্যথা, ঝিমুনি আসছে, তা সত্ত্বেও নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পোর্টেবল জেনারেটরটাকে হোভারক্রাফট থেকে নামানোর কাজ তদারক করল রানা।

একা শুধু কর্নেল যাদব না, শেডের ইনচার্জ বিশালা কালমুনাইয়ের অনুপস্থিতিও খেয়াল করল রানা। আরও খেয়াল করল শ্রীলঙ্কান ক্রিমিন্যালের ঘনিষ্ঠ সহচররা ওর দিকে রোষ কষায়িত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, পারলে যেন ভস্ম করে ফেলে।

পোর্টেবল জেনারেটর ঠিক জায়গায়, নেতাজির সিকিউরিটি আফিসারদের হাতে পৌঁছে দিল রানা। তারপর নিজের ক্যাবিনে ফিরে সোজা বিছানায়।

কিন্তু এত ক্লান্তির মধ্যেও ঘুম আসছে না। অন্ধকারে চোখ খুলে শুয়ে আছে। মাথায় রাজ্যের চিন্তা এসে ভিড় করছে।

ডক্টর ওসমান ফারুক খুন হয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে বা যারাই তাঁকে খুন করে থাকুক, এখনও খুনিরা ক্যাম্প নেতাজি ছেড়ে চলে যায়নি। চলে যায়নি, নাকি চলে যেতে পারেনি? এমন কি হতে পারে, পালাবার পথ তৈরি করবার উদ্দেশ্যেই একের পর এক স্যাবটাজ করে যাচ্ছে সে বা তারা?

ডক্টর ফারুককে খুন করবার আগে নিঃসন্দেহে তারা জেনেছে যে তিনি তাঁর গবেষণায় সফল হয়েছেন বা হতে চলেছেন। তাঁর উদ্ভাবিত ফর্মুলাটা হাতে পাওয়ার জন্যই এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করা হয়। খুনিরা যেখানে পালাতে পারেনি, ধরে নিতে হয় ওগুলোও তা হলে পাচার করা সম্ভব হয়নি।

প্রশ্ন হলো, মূল কালপ্রিট কে?

কর্নেল যাদব কি অপরাধীকে আড়াল করবার চেষ্টা করছেন? অপরাধী বা অপরাধীরা তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করছে না তো? এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে–আপাতদৃষ্টিতে দেখা না গেলেও–তিনি হয়তো কারও হাতে জিম্মি হয়ে আছেন।

নাকি তিনিই মূল খলনায়ক?

শওকত জামিল, জাভেদ হাশমি, হারুন হাবিব, বিশালা কালমুনাই–এরকম বেশ কয়েকজনের প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব চোখে পড়ে। এদের মধ্যে কেউ তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্যাবটাজগুলো করে যাচ্ছে?

কিছুদূর পর্যন্ত মেলে, কিন্তু তারপর আর মেলে না। কর্নেল যাদব ইচ্ছা করলেই তো যে-কাউকে ক্যাম্প নেতাজি থেকে পালাবার সুযোগ করে দিতে পারেন–চুরি করা উপাদান আর ফর্মুলা সহ–সেক্ষেত্রে তো একের পর এক স্যাবটাজ চালাবার কোন দরকার পড়ে না।

এ-সব করা হচ্ছে নিজের দোষ আর কারও ঘাড়ে চাপাবার মতলবে? উদ্দেশ্য একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা, যাতে আসলে কী ঘটেছে তা যেন কেউ কোনদিন বুঝতে না পারে?

আবার পশ্চিমা দুনিয়ার সঙ্গে কর্নেল যাদব আর ইঞ্জিনিয়ার হাশমির ঘন ঘন যোগাযোগ সন্দেহ উদ্রেক করবার জন্য যথেষ্ট।

ঘুম যখন আসছেই না, বিছানা ছেড়ে আলো জ্বালল রানা, একটা সিগারেট

ধরিয়ে কর্নেল যাদবের পাঠানো ফাইলগুলোয় আরেকবার মন দিল।
প্রায় এক ঘণ্টা পড়ল রানা। শেষ সিগারেটটা মাত্র নিভিয়েছে, সীসার মত ভারী মনে হলো চোখ দুটোকে। শুয়ে চোখ বুজল ও। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

এগারো

নিশ্চয়ই খুব গভীরে চলে গিয়েছিল রানা, কারণ খকখক করে কাশছিল, অথচ ঘুমটা ভাঙছিল না–অন্তত সঙ্গে সঙ্গে নয়। তারপর যখন সজাগ হলো, দেখল অনবরত কাশছে। রীতিমত বিষম খাওয়ার অবস্থা। একই সঙ্গে ভয়ানক অসুস্থ বোধ করছে। বাতাসে ধোঁয়ার কটু একটা গন্ধ।
দেয়াল হাতড়ে আলোর সুইচ টিপল রানা। কিন্তু আলো জ্বলল না। হাতঘড়ির আলোকিত কাঁটায় চোখের সামনে তুলতে দেখা গেল তিনটে বাজে।
ডায়ালের এই আলোটুকুই শুধু দেখতে পাচ্ছে ও।
কোন সন্দেহ নেই যে কোথাও আগুন লেগেছে। অথচ ওর চোখে কোন শিখা ধরা পড়ছে না। তা ধরা না পড়ুক, ঘরটা যেহেতু কাঠের তৈরি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে পড়া দরকার।
অন্ধকারে হাতড়াতে শুরু করল। কিন্তু কাশির দমকে পিঠ কুঁজো হয়ে গেলে থামতে বাধ্য হচ্ছে। বিছানায় শোয়ার আগে কিছু কাপড় খুলে ফেলে দিয়েছিল, তার মধ্যে কয়েকটা খুঁজে পেল, সব নয়। মুশকিল হলো, ট্রাউজারটা পাওয়া যাচ্ছে না।
ট্রাউজার ছাড়া বরফের টানেলে বেরুবার কথা ভাবা যায় না। কাশির ঝোঁক একটু কমে এলে আবার হাতড়াতে শুরু করল রানা। হাতের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল দেশলাইটা। কী আশ্চর্য, ওটার কথা ওর মনেই পড়েনি! যাও বা ধরা দিল, হারিয়ে যেতেও সময় নিল না।
মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে দেশলাই খুঁজছে রানা। শারীরিক ভঙ্গি বদলে যাওয়ার কারণেই কিনা, আরও জোরে আর ঘন ঘন কাশি পাচ্ছে। বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে ও।
দেশলাইটা পাওয়া গেল। কাশতে কাশতে চেষ্টা করায় তিনটে কাঠির মাথা দুটোই ভেঙে গেল। ভেঙে তো গেলই, কাঠির মাথা থেকে বারুদও খসে পড়ে গেছে।
শেষ কাঠিটা জ্বলল। লালচে আলোয় ঘরের বাতাসে গাঢ় ধোঁয়া ভেসে থাকতে দেখল রানা।
ধোঁয়া যে আসছে, আগে থেকেই জানত ও, তাই তাকিয়ে থেকে সময় নষ্ট করল না। তাড়াতাড়ি ট্রাউজার, মোজা আর বুটজোড়া খুঁজে নিল। নিভে গেল কাঠিটা।
মাথার ভিতরটা হালকা লাগছে এখনও। চিন্তাশক্তি কমে আসছে দ্রুত।

কাপড় পরবার সময় খেয়াল করল, হাতের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই–কাজের গতি খুবই শ্লথ। ট্রাউজার পরল, তবে চেইন টানবার কথা মনে থাকল না। শার্টের সবগুলো বোতামও লাগায়নি।

সবশেষে যখন দরজার দিকে এগোবে, টলে উঠল শরীর, মনে হলো এক পা নড়বার শক্তিও ওর নেই।

এই প্রথম একটা ভয় জাগল মনে। ধোঁয়াটা কি বিষাক্ত? ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে ও। জানে পড়ে যাচ্ছে, পড়লও যেন অনেক সময় নিয়ে, অথচ কোনভাবেই পতনটা ঠেকাতে পারল না।

তবে ব্যথা পেয়েছে বলে মনে হলো না। অন্য একটা ভয় গ্রাস করে রেখেছে ওকে। এত অসুস্থ লাগছে, যেন যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

দেখতে না পেলেও আশপাশে কোথাও আগুন নিশ্চয়ই জ্বলছে। এই অবস্থায় কেউ যদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তার পরিণতি সহজেই অনুমেয়। আরেকটা দুঃসংবাদ, দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে ও। কামরায় চারটে দেয়াল আছে, কিন্তু ওর জানা নেই কোন দেয়ালটায় দরজা।

রানার হাত আর পা চুপসানো বেলুনের মত। ঘাড়ের উপর মাথা আছে বলে মনে হচ্ছে না। আত্মরক্ষার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আর ইচ্ছাশক্তির জোরে উঠে বসল রানা, তারপর হাঁটুর উপর সিধে হলো। বিছানার কিনারা ধরবার পর দিক-বিভ্রান্তি দূর হলো খানিকটা, এরপর রওনা হলো হাজার মাইল দূরের গন্তব্য দরজার দিকে।

কতটুকু এগিয়েছে কোন ধারণা নেই, কাশির দমকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। এবার নির্ঘাত অজ্ঞান হয়ে যাবে। ওর ইচ্ছে হলো–মেঝেতে ঢলে পড়ি, মরে যাই।

এইসময় সেই অতি পরিচিত কাঁচাপাকা ঘন ভুরুর ভিতর থেকে অন্তর্ভেদী একজোড়া চোখ তাকাল ওর দিকে। 'তুমি পরাজয় কাকে বলে জানো না। সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে শক্ত হও, রানা।' এই কণ্ঠস্বর ওর পরিচিত। কল্পনা নয়, যেন পরিষ্কারই বাজল কানে।

তারপর কীভাবে দরজার কাছে পৌঁছেছে রানা বলতে পারবে না। হাতলটাও মুঠোয় ভরেছে। ঘোরাল সেটা।

হাতল ঘুরল, কিন্তু দরজা খুলল না। মাথায় একটা শব্দ খেলে গেল–তালা! পরমুহূর্তে আরেক দফা কাশি, শরীরটা ধরে কেউ যেন ঘন ঘন ঝাঁকাচ্ছে। তারই মধ্যে কীভাবে যেন খুলে গেল দরজা। প্রায় হোঁচট খেয়ে নেমে এল দুই ধাপ নিচু বরফ মোড়া ট্রেঞ্চে।

অল্প একটু মহামূল্য অক্সিজেন ছিল ফুসফুসে, আছাড় খেয়ে পড়ে যাওয়ায় তাও বেরিয়ে এল–সম্ভবত দুই কি তিন সেকেন্ডের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ও।

শক্ত বরফে গড়াগড়ি খাচ্ছে রানা, কাশছে আর হাঁপাচ্ছে, তবে পরম স্বস্তির সঙ্গে অনুভব করল ঠাণ্ডা অক্সিজেনও ঢুকছে কাতর ফুসফুসে।

মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসছে, ফলে রানা বুঝতে পারল কেন ওর মনে হয়েছিল দরজায় তালা দেওয়া। এখানকার দরজাগুলো বাইরের দিকে খোলে,

কিন্তু ও যে-সব দরজা খুলে অভ্যস্ত সেগুলো বেশিরভাগ খোলে ভিতর দিকে।

ধীরে ধীরে সুস্থ বোধ করছে রানা; তবে মাথার ব্যথাটা যাচ্ছে না, ফুসফুস এখনও যেন রাবার, মুখের ভিতরটা শুকনো নিউজপ্রিন্ট।

এখনও রানা অন্ধকারে পড়ে আছে। বসবার সময় আবার ধোঁয়া ঢুকল নাকে। আরেক দফা খক্-খক্ করল। ধোঁয়া যখন ঘর থেকেই বেরুচ্ছে, দরজাটা বন্ধ করতে হবে ওকে।

দাঁড়াতে চেষ্টা করায় আরেকবার ঘুরে উঠল মাথা। বাধ্য হয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকতে হলো, শ্বাস নিচ্ছে সাবধানে। তারপর আবার চেষ্টা করল ।

এবার টলে উঠলেও, দাঁড়িয়ে থাকতে পারল রানা।

এক মুহূর্ত পর হাত দুটো নাক বরাবর সামনের দিকে লম্বা করে এগোল—এমন কিছু একটার স্পর্শ পেতে চায় যেটা ওকে দিক নির্দেশনা পেতে সাহায্য করবে।

বরফের দেয়াল কোন সাহায্যে আসবে না, তবে সেটার স্পর্শই পেল প্রথমে। পরেরটা আরেক প্রস্থ বরফের দেয়াল।

ঠাণ্ডা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করছে ওর হাটটা ডানদিকে না বামদিকে। যেদিকেই হোক, মাত্র কয়েক পা দূরে হওয়ার কথা। একটু চেষ্টা করতে পাওয়া গেল দরজাটা। নাকে ধোঁয়ার গন্ধ পেল, বন্ধ করল কবাট। কবাটের দিকে পিঠ থাকায় এখন রানা জানে ট্রেঞ্চের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে ও।

সেদিকে এগোবার জন্য পা বাড়িয়েছে, এই সময় ভাবল হাটের অন্যান্য কামরায় আরও অনেকে হয়তো ঘুমাচ্ছে। ধোঁয়ায় তাদের দম বন্ধ হয়ে আসতে পারে। তারপর মনে পড়ল, হাটে ওর পাশের কামরায় থাকতেন শওকত জামিল, তিনি এখন বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে। তাঁর কামরার পরে ছোট্ট রেস্ট রুম; সেটাকে অফিস কামরা হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। তারমানে হাটটা খালি।

স্বস্তি বোধ করল রানা। তারপর ভাবল, কিন্তু আরেকটা হাট? ট্রেঞ্চের শেষ মাথার দিকে রয়েছে যেটা? অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল ওখানে হয় মসজিদ আছে, কিংবা মন্দির। তারমানেই তো খালি।

তা ছাড়া, আগুনটা লেগেছে ওর হাটে, অন্য কোন হাটে নয়, কাজেই প্রথম কাজ হওয়া উচিত ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে গিয়ে অ্যালার্ম বাজানো।

জুতোর ফিতে বাঁধা হয়নি। হাঁটবার সময় হোঁচট খাচ্ছে রানা। সরল পথ থেকে একটু হয়তো সরে গেছে, ফলে দরজার বদলে দেয়ালের কোণ ঠেকল বাড়ানো হাতে। এরপর স্পর্শের সাহায্যে নিয়ে এগোল।

ও অন্ধকারে কেন?

চিন্তাটা ঝাঁকি দিল ওকে। ট্রেঞ্চের দরজা সাধারণত বন্ধ থাকে না। বাইরে মেইন স্ট্রিট, তার আলো ওর দেখতে পাওয়ার কথা।

তারপর জেনারেটর নিয়ে সমস্যার কথা মনে পড়ল রানার। হয়তো সাবধানতা অবলম্বনের কারণে মেইন স্ট্রিটের আলো নিভিয়ে রাখা হয়েছে। গভীর রাত, এই সময় বাইরে কারও কাজ থাকে না।

তবে রানার আঙুল যখন দরজাটা খুঁজে পেল, দেখা গেল সেটা বন্ধ।

দরজা ধরে টানাটানি করল রানা, ধাক্কা দিল, চিৎকার করে লোকজনকে ডাকল, কিন্তু বৃথাই। এত রাতে মানুষ ঘুমাচ্ছে, আর যারা ডিউটি করছে তারা উষ্ণ হাটের ভিতর বসে আছে।

হাতঘড়িতে তিনটে বিশ মিনিট। আরও অন্তত ঘণ্টা তিনেক অপেক্ষা করলে এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় ওর চেঁচামেচি শুনে কেউ থামতে পারে বলে আশা করা যায়।

ইতিমধ্যে বুটের ফিতে, শার্টের বোতাম, ট্রাউজারের চেইন ঠিকঠাক মত লাগিয়ে ঠাণ্ডা ঠেকানোর ব্যবস্থা করে ফেলেছে রানা। দরজা খুলতে ব্যর্থ হয়ে আবার সেই ধোঁয়া নিয়ে চিন্তা করছে ও।

ধোঁয়ার উৎস যে ওর হাট, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ কোন আগুন দেখা যায়নি–না লালচে আভা, না কমলা রঙের চঞ্চল ফুলকি, না কোনকিছুর ধিকিধিকি জ্বলা।

বিশ মিনিট খুব কম সময় নয়। আগুন কি কাঠের একটা হাটকে বিশ মিনিট টিকে থাকতে দেবে?

নাকি নিভে গেছে?

একবার দেখা দরকার। এখানে তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবারও তো কোন মানে হয় না।

নিজের হাটের দিকে ফিরছে রানা। অন্ধকার আগের মতই গাঢ়, তবে প্রথমবারের চেষ্টাতেই ঘরের দরজা পেয়ে গেল ও। ডোর নব ধরে ঘোরাল, চাপ দিল কবাটে।

দরজা খোলা মাত্র ভক্ ভক্ করে বেরিয়ে এসে ঝাঁঝাল ধোঁয়া চোখে-মুখে আঘাত করল। দম আটকানর সময় পাওয়া যায়নি, গলায় ধোঁয়া আটকে যাওয়ায় আবার কাশতে শুরু করল রানা। ফুসফুস যেন থেঁতলে যাচ্ছে, পা দিয়ে মাড়াচ্ছে কেউ। দড়াম করে আবার দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা।

হাত দিয়ে হাতড়ে পথ তৈরি করছে ও, কাঠের তৈরি দ্বিতীয় হাটে পৌঁছাতে চায়, ট্রেঞ্চের আরও ভিতর দিকে। ওটাও একটা ডরমিটারি হাট, তবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, ফলে ধোঁয়া থাকবার কথা নয়।

মাত্র তিন পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। নিজেকে তিরস্কার করল ও। ওর ঘরটা ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে আছে, এটা জানবার পরও ধোঁয়াবিহীন একটা হাটে ঘুমাবার জন্য যাচ্ছে ও?

আগুন ছাড়া ধোঁয়া হতে পারে না। আর যে-কোন আগুনই ক্যাম্প নেতাজির জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

তবু দ্বিতীয় হাটটার দরজা খোলা কিনা দেখতে গেল রানা। না, সেটাও বন্ধ।

চিন্তাটাকে মনের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিল ও, কিন্তু এখন আর ওটাকে বের না করে কোন উপায় দেখছে না। কী করতে হবে সেটা পরিষ্কার। পরিষ্কার আর ভীতিকর। কারণ এই ট্রেঞ্চ থেকে বাইরে বেরুবার একমাত্র যে পথটা খোলা আছে

সেটা হলো ইস্কেপ হ্যাচ। আর সেই ইস্কেপ হ্যাচ দিয়ে বেরুনো যায় শুধু আইসক্যাপে।

বারো

কাজটা করতে হবে রানাকে, তবু ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না ও। শেষবার–আসলে একবারই মাত্র–ইস্কেপ হ্যাচ গলে সারফেসে উঠবার অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর, কর্নেল যাদব দেখিয়েছিলেন মাংসের একটা টুকরোকে কীভাবে নিরেট বরফে পরিণত করতে হয়।

এবার রানা হতে পারে সেই বরফের টুকরো, যেমনটি কিনা হয়েছে রত্নে উপলচন্দ্রের কাজিন রত্নে গোপালচন্দ্র।

গোপালচন্দ্র এখনও বাইরে পড়ে আছে; জমাট মাংস। তার শরীরটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে বরফের এত গভীরে চলে গেছে যে কোনদিনই হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইতস্তত করবার সময়টায় চিন্তা করছে রানা। সারফেসে ইস্কেপ হ্যাচগুলোর একটা লাইন আছে, প্রায় সবগুলো ট্রেঞ্চের শেষ মাথায় ইস্কেপ হ্যাচও আছে একটা করে–আর লাইনটা হবে মেইন স্ট্রিটের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায়।

বেশ। কিন্তু রানা কি দেখতে পাবে ওগুলো? আজ রাতেই, কয়েক ঘণ্টা আগে বড়ে মিয়াকে নিয়ে নেতাজি ক্যাম্পে যখন ফিরল ও, আবহাওয়ার নামকাওয়াস্তে শান্ত থাকবার সাময়িক পালা তখন শেষ হতে যাচ্ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে উপরে কী অবস্থা চলছে কে জানে।

প্যাঁচানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে দৃঢ় ভঙ্গিতেই উঠে এল রানা। জানে ঝড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে। জানে হোয়াইট-আউট নেমে এলে বাঁচবার কোন আশা থাকবে না। কিন্তু এ-ও জানে যে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকাটা ওর সাজে না।

বাড়ানো হাত হ্যাচকাভার ছুঁলো। মুঠায় চলে এল ওয়াইন্ডিং হুইল। দু'তিনবার ঘুরাতেই খুলে গেল হ্যাচ। অন্তত খানিকটা আলো আছে বাইরে। তবে বেশি নয়–কারণ চাঁদ বা তারা থাকলেও তা পুরোপুরি চাপা পড়ে আছে; তবে জগৎ বলতে যেখানে শুধু সাদা বরফ বুঝায় সেখানে সবই পুরোপুরি কালো হতে পারে না।

হ্যাচ দিয়ে উপরে মাথা তুলবার সময় রানা উপলব্ধি করল এই আবছা আলোই একমাত্র বন্ধু ওর। বরফের মাঠে উন্মত্ত দানবের মত হুঙ্কার ছাড়ছে আর্কটিক বাতাস, তুষার কণাকে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তীরবেগে। আর অকথ্য ঠাণ্ডা।

হ্যাচ গলে বেরিয়ে এসে মুখের চারপাশে পারকা এঁটে দিল রানা, দাঁড়াল বাতাসের দিকে পিছন ফিরে। প্রথম কাজ হয় ল্যান্ডমার্ক খুঁজে পেতে হবে, কিংবা বের করতে হবে নিজেকে গাইড করবার কোন উপায়।

ও জানে, এখানে কোথাও গাইড লাইন আছে। রত্নে গোপালচন্দ্র মারা গেছে, কারণ সে ওই গাইড লাইন ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল।

কিন্তু রানা কোন গাইড লাইন দেখতে পাচ্ছে না।

উড়ন্ত তুষার কণা এমন একটা পরদা তৈরি করে রেখেছে যে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ঘুরে দাঁড়াল রানা, ডান কাঁধ তাক করল যেদিকে মেইন স্ট্রিট আছে বলে ওর ধারণা; তারপর সাবধানে পাঁচ কদম এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল।

খোলা হ্যাচ এখনও দেখা যাচ্ছে, তবে ওর পায়ের ছাপ এরইমধ্যে আবছা; হয় ছাপ মুছে গেছে, কিংবা ভরাট হয়ে গেছে।

আরও পাঁচ পা এগোল রানা। তারপর আরও পাঁচ। এখন পিছনে তাকিয়ে হ্যাচকাভার দেখতে পাচ্ছে না। অর্থাৎ মাত্র পনেরো পা হেঁটেই একা হয়ে গেছে ও। দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোন ল্যান্ডমার্ক নেই, নাগালের মধ্যে এমন কিছু নেই যা হাত দিয়ে ধরতে পারে।

সাবধানে আরও পাঁচ পা এগোল রানা। পিছনে তাকাতে দেখল পায়ের দাগ থেকে তুষার উড়ে যাচ্ছে।

একটা ঢোক গিলে আবার সামনে পা ফেলল রানা। ওর একটা হিসাব আছে—একজোড়া হ্যাচের মধ্যে ব্যবধান হবে ত্রিশ থেকে চল্লিশ গজ। তবে এই হিসাব ভুল হলে ওর পরিণতি হতে পারে গোপালচন্দ্রের মত।

পঞ্চাশ পা এগোবার পরও রানা কোন হ্যাচ দেখতে পাচ্ছে না। তবে, এতেও কিছু প্রমাণিত হয় না। কারণ সব ট্রেঞ্চেরই ইস্কেপ হ্যাচ নেই। কাজেই একটার সঙ্গে আরেকটার দূরত্ব ষাট থেকে আশি গজ হতে পারে। আর ভাগ্য যদি খারাপ হয়, দূরত্বটা একশো বিশ গজ হওয়াটা স্বাভাবিক।

রানা অনুভব করছে, ভাগ্যটা আজ বিশেষ সুবিধের নয়। নিশ্চিতভাবে শুধু একটা জিনিস জানে—মেইন স্ট্রিট, সারফেস থেকে অনেক নীচে, ওর ডানদিকে কোথাও হবে। এই জানাটা যে খুব স্বস্তিকর, তা নয়, কারণ মেইন স্ট্রিটে নামবার র‍্যাম্পটা কম করেও সিকি মাইল দূরে, কাজেই ওটাকে ওর খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। হেঁটে সিকি মাইল পেরুবার আগেই বাতাস ওকে আরেক দিকে সরিয়ে নিয়ে যাবে, কিংবা নিজেই দিকভ্রান্ত হয়ে পাশ কাটাবে সেটাকে।

এগোচ্ছে রানা, প্রতিবার পাঁচ পা করে। শেষ পাঁচের সঙ্গে নতুন পাঁচ এক লাইনে ফেলবার চেষ্টা করল। এভাবে সত্তর পা হেঁটে আসবার পর, তুষার থেকে বেরিয়ে আসা কিছু একটা দেখতে পেয়ে, পরম স্বস্তি বোধ করল।

কোন সন্দেহ নেই যে ওটা একটা ইস্কেপ হ্যাচ। তবে যেভাবে পেল, সেটাও বড় ভীতিকর, কারণ ওটাকে ওর ডান দিকে দেখা যাচ্ছে, অত্যন্ত অস্পষ্ট, দেখতে না পেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। সত্যি যদি মিস করত…মৃত্যুর দিকে হাঁটাটা হয়তো দীর্ঘ হত, তবে গন্তব্য বদলাত না।

চারপাশ থেকে তুষার সরিয়ে হ্যাচকাভার খুলল রানা। জানত আলো দেখতে পাবে, কিন্তু সেটা মিথ্যে হয়ে গেল। অন্ধকারেই সিঁড়ি বেয়ে নামল ও। হ্যাচকাভার খোলা রাখল, ক্ষীণ আলোর সামান্য আভাটুকু কাজে লাগছে।

ট্রেঞ্চের মেঝেতে নেমে এসেও আলোর দেখা পাওয়া গেল না। আবার সেই অন্ধের মত হাতড়ে পথ করে নিতে হচ্ছে। ট্রেঞ্চ দেয়ালের কাছাকাছি থাকল ও, সাবধানে পা ফেলে এগোচ্ছে, জানে না কী আছে সামনে। মেঝেতে ফেলে রাখা হতে পারে কোন মেশিন বা প্যাকিং কেস।

তারপর ঠিকই কিছু একটা ঠেকল পায়ে। বরফ নয়, পা পড়েছে কোন বাধায়। ঝুঁকে জিনিসটা অনুভব করছে রানা, সিদ্ধান্তের চেষ্টা করল, ওটাকে টপকাবে নাকি ঘুরে পাশ কাটাবে।

জিনিসটা যাই হোক, এক ধরনের কাপড়ে মোড়া; রানার হাতে গ্লাভ থাকায় ঠিক ধরতে পারল না কী হতে পারে। তবে ওটাকে ঘিরে একটা স্টিলের ফ্রেম আছে···সেটা প্রায় দুই গজ লম্বা···আর দুই ফুট চওড়া। ওহ্, গড! এ তো লাশ!

ওখান থেকে একটু তাড়াতাড়ি সরে আসতে গিয়ে আরেকটা স্টিল ফ্রেমের সঙ্গে পা বেঁধে যাওয়ায় হোঁচট খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল রানা। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, ফলে পা বাড়ালেই কোন না কোন লাশের সঙ্গে ধাক্কা লাগছে ওর।

সব মিলিয়ে ছটা লাশ, মনে পড়ল রানার। না, সাতটা। কারণ ডাক্তার আরিফ হাসানের লাশটাও–তাঁর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল–তুলে এনে এখানেই কোথাও রাখা হয়েছে।

তারপর রানার আরেকটা কথা মনে পড়ল। এই ট্রেঞ্চও তালা দেওয়া।

দ্রুত চারদিক তাকাল রানা। ট্রেঞ্চের শেষ মাথায়, অনেকটা পিছনে, ম্লান গোল একটা আভা জানান দিচ্ছে ওটা খোলা হ্যাচ।

হঠাৎ ভয় পেয়েছিল, তাই হাসি পাচ্ছে এখন। এই অন্ধকারে সাতটা লাশের সঙ্গে থাকতে পারবে ও, প্রয়োজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ওগুলো ওর কোন ক্ষতি করবে না। অনেক আগে মারা যাওয়ায় একেকটা লাশ শক্ত তক্তা হয়ে গেছে।

আবার অন্ধকারে এগোচ্ছে রানা। হোঁচট খেয়ে টলে উঠল, পড়ে যাচ্ছে। ধরবার মত কিছুই নেই, তাই তাল সামলানো গেল না।

অন্তত একটা লাশ তক্তার মত শক্ত নয়, উপলব্ধি করল রানা। যখন বুঝল পতনটা ঠেকান যাবে না, শরীরটাকে গড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিল ও। মেঝেতে পড়ে দিলও তাই। তারপর অনুভব করল একটা লাশের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে ও। তাড়াহুড়ো করে সরে আসতে গিয়ে লাশটার গায়ে হাত দিয়ে ফেলল।

বাকি সব লাশ যেখানে শক্ত, এটা হাতের চাপে এমন ডেবে গেল যে অকস্মাৎ অসুস্থ বোধ করল রানা। পেটে তীব্র একটা মোচড় অনুভব করল। ভাবল, এটা নিশ্চয়ই ডাক্তার আরিফ হাসানের লাশ–কিংবা তাঁর যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সযত্নে কাপড় দিয়ে মুড়ে রেখে দেওয়া হয়েছে।

সিধে হলো রানা, লাশগুলো পিছনে ফেলে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছাল, ধাপ বেয়ে উঠে বেরিয়ে এল বিক্ষুব্ধ আর্কটিক রাতে।

মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে বাতাসের প্রবল দাপাদাপি পরিণত হয়েছে উন্মত্ত ঝড়ে–হ্যান্ডরেইল ধরে থাকা রানাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

তবে রানাও এখন প্রকৃতির মত বেপরোয়া, কিছুই গ্রাহ্য করতে রাজি নয়।

আবার মেইন স্ট্রিটের দিকে কাঁধ তাক করল ও, এগোল নাক বরাবর সামনে।

এখন পিছনের পাঁচটা দাগ দেখতে পাওয়া তো দূরের কথা, দুটোকেই ঠিকমত চিনতে পারা যাচ্ছে না। সাবধানে পনেরো গজ এগোবার পর সন্দেহে ভরে উঠল মনটা–হারিয়ে গেছে ও। ক্যাপ আর পারকা দিয়ে কান ঢাকা থাকলেও, বজ্রপাতের কড়-কড়াৎ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা, সেই সব শব্দ আর বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পা ফেলতে বাধ্য করছে ওকে।

ত্রিশ কদম হাঁটবার পর থামল রানা, অবশ্য যদি ওগুলোকে কদম বলা যায়। হারিয়ে গেছে ও। এখন এমনকী নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় মেইন স্ট্রিট কোন দিকে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে পড়ে আইসক্যাপে মানুষ মারা গেছে, সন্দেহ নেই রানার ভাগ্যেও ঠিক তাই ঘটতে পারে। এখন আর কিছুই করবার নেই ওর, শুধু ঝড় মাথায় করে এলোমেলো পা ফেলে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া, যতক্ষণ গ্রিনল্যান্ড আইসক্যাপের একটা অংশে পরিণত না হয় ও।

আর মৃত্যুটা তাড়াতাড়িই আসবে, কারণ প্রতি মুহূর্তে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ঝড়টা।

অন্য কিছু নয়, এত থাকতে এই ঝড়ই প্রাণ বাঁচাল রানার। কানের পর্দা ফাটানো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বজ্রপাত হলো কোথাও, অকস্মাৎ চোখ ধাঁধানো আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল চারপাশ।

ওর কাছ থেকে মাত্র দশ গজ দূরে ওটা! আরেকটা হ্যাচ! স্বাভাবিক দৃষ্টিসীমা যেখানে ছয় ফুটের বেশি না, হ্যাচটার কাছ থেকে ত্রিশ ফুট দূরে রয়েছে ও।

ছুটল রানা। গ্লাভ পরা হাত দিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঢাকনি খুলল। ইস্পাতের ধাপে পা রাখবার পর ভাবল–এখন ও নিরাপদ–টানেলে তালা দেওয়া থাকলেও বাকি রাতটুকু দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেবে এখানে।

আলো দেখল রানা। মরীচিকা নয়, সত্যিকার উজ্জ্বলতা। টানেলের প্রবেশপথ আর রানার মাঝখানে একজোড়া হাটের কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। প্রবেশপথটা খোলা, ওটার সামনে মেইন স্ট্রিটের আলো পড়ে রয়েছে–লো ভোল্টেজের কারণে ম্লান।

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলিয়ে অবাক হলো রানা, এখনও চারটে বাজেনি। তারমানে ধোঁয়া ওর ঘুম ভাঙানোর পর এক ঘণ্টাও পেরোয়নি। তবে, কী একটা সময় কাটিয়েছে! লাশ ভর্তি হাটে ঢুকে পড়েছিল, তারপর দিকভ্রান্ত হয়ে আইসক্যাপে ঘুরে বেড়িয়েছে।

আলোটা দেখবার পর ভুলে যাওয়া কথাটা মনে পড়ল, আগুন লাগবার কথাটা জানাতে হবে সবাইকে।

মেইন স্ট্রিট খালি। ফায়ার ব্রিগেডের দায়িত্বে কে আছে? কোথায় পাওয়া যাবে ডিউটি অফিসারকে? জানা নেই ওর।

মেস হলের দিকে এগোল রানা। ওখানে সারারাত কফি পাওয়া যায়। কেউ না কেউ আছে ওখানে।

দেখা গেল একজন কুক ছাড়া আর কেউ নেই। পুরানো একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে। রানা কথা না বলা পর্যন্ত চোখই তুলল না সে।

'জি, সার? আগুন? অ্যালার্ম বাজিয়েছেন, সার?'

'সিরিয়াস কিছু নয়, বুঝলে। এক ঘণ্টা আগের ব্যাপার। এতক্ষণে কেউ যখন লক্ষ করেনি, তাহলে নিশ্চয়ই নিভে গেছে। আমি চাই না গোটা ক্যাম্প জেগে উঠুক। ডিউটি অফিসার কোথায় বলো।'

'চলুন, সার, আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।' রানাকে নিয়ে কমান্ড ট্রেঞ্চে চলে এল কুক। এখানে ডিউটি দিচ্ছে তরুণ একজন লেফটেন্যান্ট। 'আগুন' শব্দটা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াল মাইক্রোফোনের দিকে হাত বাড়াল সে।

'ধোঁয়াটা দেখা গেছে এক ঘণ্টা আগে,' বলল রানা। 'প্রথমে আরেকবার দেখা দরকার না?'

তাড়াতাড়ি পারকা পরে ওদের সঙ্গে রওনা হলো লেফটেন্যান্ট। 'এক ঘণ্টা আগের কথা–আমাদেরকে জানাননি কেন?'

'ট্রেঞ্চের দরজায় তালা দেয়া ছিল।'

'না, তো, সার! তালা দেয়ার তো কথা নয়।'

'ছিল।'

'তা হলে তো আমাকে চাবি আনতে হয়,' বলে ওদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখে কমান্ড হাটে ফিরে গেল লেফটেন্যান্ট।

একটু পরই চাবি নিয়ে ফিরল সে। কিন্তু ট্রেঞ্চে এসে ওরা দেখল তালা দেওয়া তো নয়ই, এমনকী দরজাটা বন্ধও নয়।

রানার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল লেফটেন্যান্ট। তারপর বলল, 'চলুন, সার, আগুনটা দেখি।'

সঙ্গে সঙ্গে রানা নড়ল না, ট্রেঞ্চটার এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাচ্ছে। ট্রেঞ্চের ভিতর আলোর কোন অভাব নেই, ওর হাটের দরজাটাও খোলা। ধোঁয়া? কীসের ধোঁয়া? কোথায়?

'সার?' রানার দিকে তাকিয়ে আছে লেফটেন্যান্ট।

তাকে সঙ্গে নিয়ে হাটের ভিতর ঢুকল রানা। হাটের আলোও জ্বলছে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে লেফটেন্যান্ট বলল, 'অ্যালার্ম না বাজিয়ে ভাল করেছেন, সার। ইস, কী কাণ্ড!'

রানার বিছানার পাশে একটা চেয়ার ফেলা। ওই চেয়ারেই রেখেছিল রানা সিগারেট আর দেশলাইয়ের প্যাকেট। পুড়েছে ওই চেয়ারের কুশনটাই। ইতিমধ্যে নিভেও গেছে। তবে কয়লায় পরিণত হওয়া প্ল্যাস্টিক ফোমে খুদে পাইপ আকৃতির ছাই পড়ে রয়েছে, একটা সিগারেটের অবশিষ্ট।

ওখানে দাঁড়িয়ে বিব্রত হচ্ছে রানা। তরুণ লেফটেন্যান্ট হাসি চেপে কমান্ড হাটে ফিরে গেল।

আগুনটা সত্যি নিভে গেছে কিনা দেখে নিয়ে শুয়ে পড়ল রানা। কিন্তু ঘুম এল না।

কোন সন্দেহ নেই, গোটা ব্যাপারটা কেউ সাজিয়েছে। দরজায় তালা ছিল না, আলো জ্বলছিল–এ স্রেফ সম্ভব নয়।

তবে লাশ রাখা ট্রেঞ্চের দরজা বন্ধ থাকবারই কথা, ছিলও তাই–কর্নেল

যাদবের কঠোর আদেশে।

কিন্তু আগুনটা? মনে করতে চাইছে রানা। মনে পড়ছেও। কনুইয়ে ভর দিয়ে ঝুঁকল ও, শেষ সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে রাখবে...রাখলও। শুধু তাই নয়, সব সময় যেভাবে নেভায় সেভাবে নেভালও– জ্বলন্ত প্রান্তটা অ্যাশট্রেতে চেপে ধরল জোরে।

তা হলে চেয়ারের সিগারেটটা এল কোত্থেকে?

বিছানা ছেড়ে উঠল রানা। দরজাটা বন্ধ করল। হ্যাঁ, এবার খানিকটা ঘুমাবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

সকাল ন'টায় দরজায় নক হওয়ার শব্দে ঘুম ভাঙল রানার। দরজা খুলে হারুন হাবিবকে দেখতে পেল ও। তরুণ ব্যাকটেরিয়লজিস্ট ওকে দেখে হাসল।

'কর্নেল যাদব পাঠালেন আমাকে, মিস্টার জয়,' বলল সে। 'বললেন, একবার দেখে আসুন ভদ্রলোকের মেজাজ ঠাণ্ডা হয়েছে কিনা।' হাসিটা আরও চওড়া হলো। 'আপনি নাকি বঙ্গবন্ধু ক্যাম্প থেকে তাঁকে হুমকি-টুমকি কী সব দিয়েছেন?'

হাবিবের হাসিটা সংক্রামক, তবে রানাকে সেটা স্পর্শ করতে না পারবার কারণ হলো, কর্নেল যাদবের প্রতি ওর অবিশ্বাস আর সন্দেহ এখনও নিরসন হয়নি। ভদ্রলোকের অযোগ্যতাও রীতিমত পীড়াদায়ক। 'তাঁর সঙ্গে আমার কথা আছে,' হাবিবকে বলল ও। 'গিয়ে বলুন ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসছি আমি।'

হাসিটা ধীরে ধীরে মুছে গেল হাবিবের মুখ থেকে। খানিক ইতস্তত করে বলল, 'জানি না কথাটা বলা ঠিক হচ্ছে কিনা। তবে বলাই বোধহয় উচিত। মিস্টার জয়, কর্নেলের মধ্যে আশ্চর্য একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কী রকম?'

'ছোটখাট বিষয় নিয়ে যাকে-তাকে ধমকাচ্ছেন, সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে কৌতুক করছেন...'

'হুম।'

রানা আর কিছু না বলায় যেন খানিকটা হতাশ হয়েই ফিরে গেল হাবিব।

শাওয়ার হাটে এসে গোসল করল রানা, দাড়ি কামাল, তারপর কাপড়চোপড় পরে মেস হলে এসে ব্রেকফাস্ট সারল।

মেস হল থেকে বেরিয়ে সোজা কমিউনিকেশন হাটে চলে এল রানা। কুমারাতুঙ্গাকে পাওয়া গেল ওখানে। তার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করল ও।

কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, বিশালা কালমুনাই শ্রীলঙ্কা থেকে খুব ঘন ঘন মেসেজ রিসিভ করছে। সেই হারে নিজেও পাঠাচ্ছে। বড়ে মিয়াকে নিয়ে রানা যখন ক্যাম্প নেতাজিতে ফিরল, কালমুনাই তখন এখানে বসে ক্যান্ডি শহরে জরুরি কী সব মেসেজ পাঠাচ্ছিল।

রানা বলল, 'ওই লোকের কাছে যে-সব মেসেজ এসেছে, আর যেগুলো সে পাঠিয়েছে–সব আমার এক কপি করে দরকার।'

'কিন্তু, সার, কর্নেলের অনুমতি ছাড়া...' কুমারাতুঙ্গা ইতস্তত করছে।

'কর্নেলের অনুমতি আমার নেয়া আছে, কুমারাতুঙ্গা। তোমার যদি সন্দেহ থাকে, তুমি তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

'না, সার, ছি–ঠিক আছে।'
তার কাছ থেকে এক গাদা কমপিউটার প্রিন্ট-আউট নিয়ে পকেটে ভরল রানা। তারপর তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এল কমান্ড হাটে।
কমান্ড হাটের আউটার আফিসে মেইল নার্স রফিক শিকদারকে পাওয়া গেল। রানাকে দেখে সালাম দিল সে।
'তুমি এখানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।
'জী, সার,' ম্লান হেসে বলল রফিক। 'কর্নেল ডেকেছিলেন··· আমার কাছ থেকে আবার মন প্রফুল্ল করার ওষুধ চাইলেন।'
'আবার?'
'হ্যাঁ, কাল রাতেও গোটা চারেক পিল দিয়েছিলাম।'
গম্ভীর হলো রানা। নানাজনের কাছ থেকে কর্নেল যাদব সম্পর্কে যে-সব মেসেজ পাচ্ছে ও, সেগুলোর মাজেজাটা কী?
নক করে চেম্বারে ঢুকে পড়ল রানা।
ডেস্কের পিছনে বসে একটা বলপয়েন্ট পেন নাড়াচাড়া করছেন ভীম সিং যাদব। রানাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। 'আজ সকালে শুনলাম বড়ে মিয়াকে নিয়ে কাল রাতে ফিরে এসেছেন আপনি,' হ্যান্ডশেক করবার সময় বললেন। 'ধন্যবাদ, রাতেই আপনি আমার খোঁজ করেননি বলে।'
'বুঝলাম না।'
'কেন, আপনি জানেন না, আমি মন ভালো রাখার চিকিৎসা নিচ্ছি? চারটে পিল খেয়ে সন্ধ্যারাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বুঝলেন। কিন্তু,' কপালটা আঙুল দিয়ে টিপে ধরলেন, 'সকালে মাইগ্রেন নিয়ে ঘুম থেকে উঠেছি।'
'ও।'
'বসুন, প্লিজ, মিস্টার জয়,' প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে নিজেও ধপ করে বসে পড়লেন কর্নেল যাদব। 'আমাকে যদি এখনই অ্যারেস্ট করার ইচ্ছে না থাকে, তা হলে একটা বিষয়ে আপনাকে আমি কিছু বলতে চাই।'
'হ্যাঁ, বলুন; তবে সংক্ষেপে,' বলল রানা। 'কারণ আপনার সঙ্গে সিরিয়াস আলাপ আছে আমার।'
বলপয়েন্ট কলমটা নাকের সামনে তুলে খুঁটিয়ে দেখলেন কর্নেল। 'ডিজাইনটা বড় বেশি নিখুঁত মনে হচ্ছে না আপনার, মিস্টার জয়?'
'কলমটার কথা বলছেন, মিস্টার যাদব?'
'শিওর। খুব কাজের জিনিস। রঙটাও ভারি সুন্দর, দেখুন। দাঁড়ান, এই বলপয়েন্ট সম্পর্কে আপনাকে একটা লেকচার দিই···'
'এ প্রসঙ্গে আমি কোন আগ্রহ বোধ করছি না, কর্নেল,' পঁচিশ সেকেন্ড পর বাধা দিয়ে বলল রানা। 'আপনি জানতে চেয়েছিলেন আপনার অপরাধের কী প্রমাণ আছে আমার কাছে, মনে পড়ে?'
'দেখুন, মিস্টার জয়, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথা না বলে সরাসরি প্রশ্ন করুন, আমিও সোজাসাপ্টা জবাব দিয়ে সময় বাঁচাই, ঠিক আছে? না, থামুন, তারও দরকার নেই–আমি আপনার প্রশ্নটা কী জানি, কাজেই উত্তরটা বলে দিই। কান

খুলে শুনুন, আমি ভিম সিং যাদব ডক্টর ওসমান ফারুককে খুন করিনি! পেয়েছেন আপনার প্রশ্নের জবাব?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আপনি ভুল করছেন, কর্নেল যাদব। আমি এ-প্রসঙ্গে কোন প্রশ্ন করতে চাইছি না। আমার প্রশ্ন হলো...'

'বিশালা কালমুনাই আর তার দল জুয়া খেলিয়ে লোকজনকে সর্বস্বান্ত করে আসছে, অথচ আমি কেন এত বড় একটা অন্যায়ের প্রতিকার করিনি—এটা কী?'

'হ্যাঁ। কী বলার আছে আপনার?'

'আমি জেনেইছি মাত্র গতকাল,' বললেন কর্নেল যাদব। 'যারা ভুক্তভোগী তারাই এতদিন ব্যাপারটাকে সযত্নে গোপন করে রেখেছিল। এখানে আমার কী করার ছিল বলুন?'

'সেক্ষেত্রে গতকালই বা জানলেন কীভাবে?'

'জেনেছি মুরালির সঙ্গে রেডিওতে আলাপ করে,' জানালেন কর্নেল। 'আমি আর কর্নেল শর্মা অভয় দেওয়ায় মুখ খুলতে রাজি হয় সে।'

'এখন তো জেনেছেন, কী করার কথা ভেবেছেন?'

'এখন তো সিকিউরিটির সব দায়িত্ব একা আপনার,' হেসে উঠে বললেন নেতাজি ক্যাম্পের কমান্ডার। 'যা করার আপনি করবেন, আমরা শুধু আপনাকে সাহায্য করব। একটা উদাহরণ দিই। ধরুন এই বলপয়েন্টটা হারিয়ে গেল, আর আমি বললাম জিনিসটা আসলে সোনার ছিল, নিশ্চয়ই কেউ চুরি করেছে। আপনি এক এক করে একশো পঞ্চাশজনকে অ্যারেস্ট করে বলবেন—কলম বের করো, তা না হলে চাবুক মেরে পাছার মাংস খসিয়ে আনব...'

'থামুন,' তাঁকে বাধা দিল রানা। 'আপনার প্রলাপ শোনার সময় নেই আমার। কী জিজ্ঞেস করছি ভালো করে শুনুন। কালমুনাইয়ের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন, পোলক্যাটের ট্যাংকে ফুয়েল কম ভরা হয়েছিল কেন?'

'কালমুনাই বলছে, অসম্ভব! সে নাকি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ট্যাংক ভর্তি করে ফুয়েল ভরতে দেখেছে। আরে বাদ দিন তো ও-সব! এই বলপয়েন্টটার কথা ভাবুন...'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। একটা কথাও না বলে বেরিয়ে এল চেম্বার ছেড়ে।

কমান্ড ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের হাটে ফিরল রানা। নিরিবিলিতে বসে পকেট থেকে কমপিউটার প্রিন্ট-আউটগুলো বের করল।

বিশালা কালমুনাই তার দেশ শ্রীলঙ্কা থেকে গত চব্বিশ ঘণ্টায় তেরোটা মেসেজ রিসিভ করেছে। সেগুলো কোড করা না হলেও, ভাষাটা ব্যবহার করা হয়েছে কৌশলে; বিশেষ করে শব্দচয়নে অত্যন্ত সতর্কতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। যেমন—'শনিবার সন্ধ্যায় ভিনদেশী পাগলা শেয়াল বাঘের পিছু নিয়েছিল।' কিংবা 'মাহিন্দার, নায়েক, সুখদেব, প্যাটেল আর নাতপাতা জানতে চাইছে তারা সাগর পাড়ি দেবে কিনা।'

বিদেশী পাগলা শেয়ালের অর্থ করল রানা—ফেউ, অর্থাৎ শ্রীলঙ্কান পুলিশ বা

রানা এজেন্সির এজেন্টরা ফিফটি পারসেন্টের পিছনে লেগেছে।

দ্বিতীয় মেসেজের নামগুলো কাল্পনিক বলেই ধরে নিতে হয়, জানতে চাওয়া হয়েছে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে কিনা। বাকি সব মেসেজে প্রশ্ন করা হয়েছে–বিশেষ এই পরিস্থিতি কেন তৈরি হলো, এখন তারা করবেই বা কী।

উত্তরে কালমুনাই জানতে চেয়েছে, ওই আকার-ইঙ্গিতেই, হঠাৎ ওরা কারা 'বন্ধুত্ব' করতে চাইছে? জামাইরা যেহেতু নিয়মিত যৌতুক নিচ্ছে, তারা কেন কিছু করতে বা বলতে পারছে না?

এখানে বন্ধুত্ব মানে শত্রুতা ধরে নিল রানা, আর জামাই মানে পুলিশ, রাজনৈতিক নেতা বা গডফাদার। প্রিন্ট-আউটগুলো পড়া শেষ করে এক মিনিট চিন্তা করল রানা, সিদ্ধান্তে পৌঁছাল শহীদুল আগে রিপোর্ট দিক ফিফটি পারসেন্টের অপতৎপরতা সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়েছে, তারপর কালমুনাই আর তার সহচরদের ধরবে সে।

রানা আশা করছে, ওদেরকে ইন্টারোগেট করলে অনেক ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন বেরিয়ে আসতে পারে–এমনকী কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসাও বিচিত্র কিছু নয়। ও ভোলেনি–বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটায় দু'জন শ্রীলঙ্কানও ছিল।

নিজের হাট থেকে বেরিয়ে এসে মেইন স্ট্রিট হয়ে কফি খাওয়ার জন্য মেস হলের দিকে যাচ্ছে রানা। মূল ট্রেঞ্চের আলো নিস্তেজ করে রাখা হয়েছে, বরফের দেওয়ালগুলো তাই সাদার বদলে ধূসর দেখাচ্ছে।

কয়েকজন লোক পাশ কাটাল রানাকে। সবাইকে বিষণ্ন আর অবদমিত মনে হলো ওর। মেস হলেও পরিবেশটা ভারী হয়ে আছে, লোকজন কথা বলছে নিচু স্বরে।

একজন সায়েন্টিফিক অফিসারের টেবিলে বসল রানা। ভদ্রলোকের নাম মামুন আব্বাস, প্রায় ষাট বছর বয়স, এক রাতে অফিসার্স ক্লাবে পরিচয় হয়েছিল।

কিছুক্ষণ এটা-সেটা নিয়ে আলাপ করল ওরা, তারপর রানা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, খেয়াল করেছেন, ক্যাম্পের পরিবেশ কেমন যেন নিরানন্দ হয়ে উঠছে? কী কারণ বলুন তো?'

'এটাকে আমরা আর্কটিক একঘেয়েমির সাইড এফেক্ট বলি, মিস্টার জয়,' সহাস্যে জবাব দিলেন আব্বাস। 'এই ব্যামোর প্রধান লক্ষণ হলো, ছোটখাট বিষয়কে বড় করে দেখা আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নগণ্য মনে করা। এটাও একসময় বন্ধ হয়, শুরু হয় বুট বা অন্য কিছুর দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকা। আগেই বলে রাখছি, আমি সাইকোলজিস্ট নই। তবে পাঁচ বছর এখানে থাকার পর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেটাও কম নয়।' নিজের মগে শেষ একটা চুমুক দিয়ে চেয়ার ছাড়লেন তিনি। 'কফি খান, হুইস্কি গিলুন, ব্লু ফিল্ম দেখুন, ঘুমান–সাব ঠিক হো জায়ে গা, মিস্টার জয়!' রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে মেস হল ছেড়ে চলে গেলেন তিনি।

মেস হল থেকে বেরিয়ে ওয়েদার হাটের দিকে যাওয়ার সময় রানার সন্দেহ হলো ও নিজেও মানসিক দিক থেকে পুরোপুরি সুস্থ নয়। অন্তত একটা লক্ষণ তো

স্পষ্টই–ওর চিন্তধারায় প্রায়ই ধারাবাহিকতা থাকছে না। তা ছাড়া, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ছোট করে দেখবার একটা প্রবণতাও লক্ষ করা যাচ্ছে।

পথে দেখা হয়ে গেল ডক্টর হারুন হাবিবের সঙ্গে। প্রশ্ন করতে জানা গেল, সে তার প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ওয়েদার অফিসে যাচ্ছে।

ওয়েদার অফিসের ইনচার্জ আবহাওয়াবিদ চাঙমা ভিকু। হাবিবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি, পরস্পরকে দেখে দু'জনের চেহারাই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রানার সঙ্গে অনেক আগেই পরিচয় হয়েছে। ভিকু জানতে চাইলেন, 'বলুন, মিস্টার জয়, আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি জানতে চাই, আপনারা এখানে রেকর্ড রাখেন তো?'

'সম্ভাব্য সব রকম ভাবে হিসেব রাখবার চেষ্টা করি আমরা, মিস্টার জয়। আপনি যা চান তা যদি না থাকে, আমরা তৈরি করে দিতে পারব।'

'না, অসম্ভব কিছু চাইছি না,' বলল রানা। 'আমার জানার বিষয় হলো, তাড়াতাড়ি কোন ব্রেক পাওয়া যাবে কিনা। জানি নিখুঁত ফোরকাস্ট করা সম্ভব নয়, তবু অতীতের রেকর্ড দেখে খানিকটা আভাস তো নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।' একটা ফাইলিং ক্যাবিনেটের সামনে দাঁড়িয়ে ফোল্ডার নামাতে শুরু করলেন চাঙমা ভিকু। 'আমাদের এখানে সারাক্ষণ উইন্ড গজ ঘুরছে, মার্কারি আর অ্যালকোহল থার্মোমিটার উঁচু-নিচু হচ্ছে, ব্যারোমিটার রিডিং পাচ্ছি, স্নোফল রেকর্ড পাচ্ছি।' ফিরে এসে টেবিলে একটা চার্ট মেলে ধরলেন তিনি।

'কী এটা?' জানতে চাইল রানা।

'গত পাঁচ বছরের প্লট, সার,' বললেন ভিকু। 'টেমপারেচার পাবেন। পাবেন উইন্ড ভেলোসিটি। এদিকে দেখুন, বাতাসের শুষ্কতার হিসেব দেয়া হয়েছে...'

ওই চার্ট নিয়ে বিশ মিনিট গবেষণা করে রানার প্রশ্নের একটা আনুমানিক জবাব পাওয়া গেল। আগামী সাতাশ দিনের মধ্যে দিন চারেক বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ত্রিশ বা তার কম থাকবে। আরও দু'দিন বাতাস ঘণ্টায় বিশ মাইলের উপরে উঠবে না।

'বেশ উৎসাহ বোধ করছি,' বলল রানা। 'একটু ভাল আবহাওয়া পেলে আইসক্যাপে ঘুরে বেড়ানোর খুব ইচ্ছে আমার।'

'তবে, মিস্টার জয়,' বলল হাবিব, মিটিমিটি হাসছে। 'ভিকুর কথায় খুব বেশি উৎসাহিত না হওয়াই ভাল।'

'কেন?'

'ভিকু এখনও আপনাকে যে-কথাটা বলেনি সেটা হলো, খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে হঠাৎ যেমন বিরতি দেখা যায়–যেটাকে স্লট বলা হয়–সে রকম ভাল আবহাওয়াও হঠাৎ করে খারাপ হয়ে যেতে পারে–দুই, চার বা ছয় ঘণ্টার জন্যে।'

'আগে থেকে ওয়ার্নিং পাবার কোন উপায় নেই?'

ভিকু জানালেন, 'আছে, মিস্টার জয়। রেডিও খোলা থাকলে থিউল থেকে স্যাটেলাইট রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারি।'

'ধন্যবাদ,' বলে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের কামরায় ফিরে এল রানা। এখন থেকে বিড়ালের মত অপেক্ষায় থাকতে হবে। ভাগ্য ভাল হলে

দু'একদিনের মধ্যে শিকে ছিঁড়লেও ছিঁড়তে পারে।

প্রথম সুযোগেই অকুস্থলটা দেখতে যাবে রানা, যেখানে হেলিকপ্টারটা বিধ্বস্ত হয়েছিল। তারপর যাবে সাইযমলজি হাটে; ওখান থেকে ফিরবার সময়ই নিখোঁজ হয়েছে শ্রীলঙ্কান রেডিও অপারেটর রত্নে গোপালচন্দ্র।

বিছানায় শুয়ে রিয়্যাক্টর ইঞ্জিনিয়ার জাভেদ হাশমির ফাইলটা আরেকবার খুলল রানা। প্রমাণিত না হলেও, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগটা গুরুতরই ছিল–তিনি নাকি উত্তর কোরিয়ার কাছে পারমাণবিক প্রযুক্তি বিক্রি করবার চেষ্টা করেছিলেন।

শুধু এই একটা অভিযোগ নয়। তাঁর সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে রীতিমত পিলে চমকানো একটা তথ্য পেয়েছে শহীদুল হক। ইসলামাবাদের একটা সরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করবার সময় মার্কিন দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারির তরুণী মেয়ে স্বর্ণকেশিনী লিন্ডা ক্লিফোর্ডের প্রেমে পড়েন ভদ্রলোক। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে যান। এরপর লিন্ডার সঙ্গে হাশমি দীর্ঘ চার বছর লিভ-টুগেদার করেছেন।

সেই লিন্ডা কিফোর্ড এখন ওয়াশিংটনে আছে, চাকরি করে পররাষ্ট্র দফতরে। হাশমি নিয়মিত তাকে চিঠি লেখেন।

নক হলো দরজায়। ভিতরে ডাকল রানা। হাতে এনভেলাপ নিয়ে একজন সিপাই। এনভেলপটা দিয়ে ফিরে গেল সে।

কর্নেলের চিরকুট। লিখেছেন: 'কেউ কেউ বলছে আমি নাকি আপনার সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছি। আশা করি দুঃখ প্রকাশ করার একটা সুযোগ থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না। আপনার অপেক্ষায় থাকলাম। কর্নেল যাদব।'

আবার কমান্ড হাটে চলে এল রানা। এবারও আউটার অফিসে মেইল নার্স রফিক শিকদারকে বসে থাকতে দেখল।

রানা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগে রফিক নিজেই বিব্রত একটা ভঙ্গিতে বলল, 'দেখুন না কী কাণ্ড, আবার ডেকে এনে বসিয়ে রেখেছেন, বলছেন আমার দেয়া ওষুধ খেয়ে মন ভাল হচ্ছে না কেন।'

'কর্নেল যাদব?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তবে আর কে!'

'হুম।' দরজায় নক করে চেম্বারে ঢুকল রানা।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন নেতাজি ক্যাম্পের কমান্ডার। 'হ্যালো, জয় বাংলা!' রানার হাতটা ধরে ঘন ঘন ঝাঁকাচ্ছেন।

'হ্যালো, কর্নেল।'

'আমি নাকি আপনার সঙ্গে হেঁয়ালি করেছি, মিস্টার জয়– কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, কিছুটা। কী ব্যাপার বলুন তো?'

'ঠিক কী ধরনের প্রলাপ?'

'একটা বলপয়েন্ট কলম দেখিয়ে সেটার ডিজাইন সম্পর্কে লেকচার দিয়েছেন।'

'কিন্তু আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না।' কর্নেল যাদবকে হতভম্ব দেখাচ্ছে

'কিছুই মনে পড়ছে না? কেন, মদ বেশি খাওয়া হয়েছিল?'

'আমাকে দেখে কি তাই মনে হয়েছিল? মদ খেয়েছি?'

'হ্যাঁ।'

কপালটা আঙুল দিয়ে ডললেন কর্নেল। 'সকালে ঘুম ভাঙে অভিশপ্ত মাইগ্রেন নিয়ে। যেদিকে তাকাই শুধু সাদা আলো দেখতে পাই। নেড়ি কুত্তার মত অসুস্থ বোধ করছিলাম। অত ভোরে কাকে পাব, নিজেই হসপিটাল গিয়ে কয়েকটা পিল নিয়ে আসি। এখন ভাবছি, পেইনকিলারের বদলে অন্য কিছু খেয়ে ফেলিনি তো?'

'রাতে যেন কী পিল খেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওই যে টেনশান ফ্রি থাকার জন্যে, নরজিন না কী যেন নাম। কেন?'

'চারটে নরজিন খেলেন কোন বুদ্ধিতে? স্বাভাবিক ডোজ তো একটা। তারপর ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই সকালবেলা খেলেন...জানেনও না কী খেয়েছেন। আপনার বিরুদ্ধে সত্যিই কমপ্লেন করা দরকার।'

চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল রানা। রিয়্যাক্টর শেডে যাবে ও, জাভেদ হাশমির সঙ্গে কথা বলাটা জরুরি।

হাটের দরজার দিকে হাঁটছে, এই সময় ওর পিছনে ফোনটা বাজতে শুরু করল। আউটার রুমের খালি ডেস্কে একা রফিক শিকদার বসে আছে, রিসিভারটা সেই তুলল। 'হ্যালো?' তাকে বলতে শুনল রানা। তারপর সে হাঁপিয়ে উঠল, 'ওহ্, খোদা!' হাতের রিসিভার তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখল সে।

দোরগোড়া থেকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কী ব্যাপার, রফিক?'

রফিক শিকদার রানার প্রশ্নের জবাব দিল না। হ্যাঁচকা টানে চেম্বারের দরজাটা খুলল সে। 'স্যার, কর্নেল! রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চে মারাত্মক বিপদ দেখা দিয়েছে। ওরা এইমাত্র ফোন করে জানাল, ইঞ্জিনিয়ার জাভেদ হাশমি উন্মাদ হয়ে গেছেন!'

তেরো

মেইল নার্স রফিক শিকদারের চিৎকার থামতে না থামতে ক্যাম্প কমান্ডারের চেম্বার থেকে ভারী কিছু পতনের আওয়াজ ভেসে এল। পরমুহূর্তে কামানের গোলার মত বাইরে বেরিয়ে এলেন প্রকাণ্ডদেহী কর্নেল ভীম সিং যাদব, তাঁর ধাক্কা খেয়ে একটা ডেস্কের উপর প্রায় ছিটকে পড়ল রফিক।

'কী বললে তুমি?' হুঙ্কার ছাড়লেন কর্নেল যাদব, রফিককে ভারসাম্য ফিরে পাওয়ারও সময় দিচ্ছেন না। 'রিয়্যাক্টর শেডে কী হয়েছে?'

ক্যাম্প কমান্ডারের ভয়াল মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেল রফিক। 'টেলিফোনে ওরা বলল, রিয়্যাক্টর ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার হাশমি নাকি পাগল হয়ে গেছেন।'

এক মুহূর্ত হতচকিত হয়ে তাকিয়ে থাকলেন কর্নেল, তারপরই রানার খোঁজ করলেন। 'মিস্টার জয় এই মাত্র না আমার চেম্বার থেকে বেরুলেন?' চরকির মত

দরজার দিকে ঘুরে গেলেন কর্নেল। 'কোনদিকে গেলেন তিনি?' উত্তরের অপেক্ষায় থাকলেন না, টানেল ধরে হনহন করে রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চের দিকে এগোলেন।

কমান্ড হাটে নিজের কাজে ফিরছিল মেজর লালু ভাই ফালকে, মারাত্মক কিছু একটা ঘটেছে ধরে নিয়ে সে-ও তাঁর পিছু নিল।

ইতিমধ্যে রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চে পৌঁছে গেছে রানা।

ওখানে জাভেদ হাশমির অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইঞ্জিনিয়ার তৌফিক আজিজকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। পরিচয় আছে, তবে ভদ্রলোকের সঙ্গে মাত্র একদিনই আলাপ হয়েছিল রানার। এই মুহূর্তে বিবর্ণ দেখাচ্ছে তাঁকে, কান আর নাকের মাঝামাঝি গালের চামড়া ছিঁড়ে যাওয়ায় টকটকে লাল হয়ে আছে জায়গাটা।

ছোটখাট একটা ঝড় তুলে ভিতরে ঢুকলেন ক্যাম্প কমান্ডার। 'কোথায় তিনি?'

'অফিসে।'

রানার পিছু নিয়ে অফিসে ঢুকলেন কর্নেল। একটা ক্যাম্প বেডে শুয়ে রয়েছেন পাকিস্তানি রিয়্যাক্টর ইঞ্জিনিয়ার জাভেদ হাশমি। বেডটা সম্ভবত ডিউটি অফিসার ব্যবহার করে। হাশমিকেও বিবর্ণ দেখাচ্ছে, তবে ঘামে ভিজে আছে তাঁর মুখ। বেডের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে তাঁকে, সেই বাঁধন খুলবার জন্য অনবরত নিজের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছেন ভদ্রলোক।

বিছানার পাশে হাঁটু গাড়লেন কর্নেল। 'কথা বলতে পারবেন, মিস্টার হাশমি?'

হাশমির মাথাটা একটু নড়ল। কর্নেলের দিকে তাকালেন তিনি, তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, চিনতে পারবার কোন লক্ষণই চেহারায় ফুটল না। স্ট্র্যাপ খুলবার জন্য আরও বেশি ট্যানা-হ্যাঁচড়া শুরু করায় পেশিগুলো ফুলে ফুলে উঠছে।

সিধে হয়ে দাঁড়ালেন কর্নেল, ঘাড় ফিরিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকালেন।

ইঞ্জিনিয়ার তৌফিক আজিজের দিকে ফিরল রানা। 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?'

'জিন্দেগি ভর অ্যায়সা কাভি নেহি দেখা, মিস্টার জয়,' বললেন আজিজ। 'ইয়া খুদা, উনোনে য্যায়সে...'

'আমি জানতে চাইছি, ঠিক কী হয়েছিল?'

'দুঃখিত, মিস্টার জয়। উনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এখানে, এই অফিসেই। রিয়্যাক্টরের ঢাকনি খোলা ছিল, দেখতেই পাচ্ছেন, হঠাৎ দরজা খুলে ভল্টে ঢুকে পড়লেন উনি, আর...কী আশ্চর্য! লাফ দিয়ে রিয়্যাক্টর কেটলিতে পড়তে চাইলেন!'

'লাফ দিয়ে ...ওহ্, গড!'

'আমি তাঁকে ধরে ফেলি, মিস্টার জয়। আমার সাহায্যে আরও দু'জন এগিয়ে আসে। তারপরও তাঁকে সামলান যায়নি, ধস্তাধস্তি করে নিজেকে প্রায় ছাড়িয়ে নিয়ে কেটলিতে উঠতে যাচ্ছিলেন। কোন রকমে আবার ধরে ফেলি আমরা বিশ্বাস করবেন না, ওঁর গায়ে যে কী প্রচণ্ড '

'কিছু বলেছেন?'

মাথা নাড়লেন আজিজ। 'একটা শব্দ পর্যন্ত করেননি।'

কর্নেলের দিকে তাকাল রানা। কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। তারপর দু'জন একযোগে ফিরল ইঞ্জিনিয়ার হাশমির দিকে। বোকার মত, কিন্তু মরিয়া হয়ে, নিজেকে মুক্ত করবার জন্য যুদ্ধ করছেন তিনি; সিলিঙে নিবদ্ধ চোখ জোড়া এত বেশি খোলা যেন মনে হচ্ছে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে।

'মেজর ফালকে,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন কর্নেল যাদব, 'আমাদের মেডিককে খবর দিন। বলবেন, মিস্টার হাশমিকে খুব কড়া ডোজের সেডাটিভ দিতে হবে।'

'ইয়েস, সার।'

ওরা অপেক্ষা করছে, এই ফাঁকে কর্নেল যাদব ইঞ্জিনিয়ার হাশমির পাশে হাঁটু গাড়লেন আবার, নরম সুরে কথা বলছেন, অভয় আর সান্ত্বনা দিচ্ছেন—সম্ভবত বৃথাই, কারণ তাঁর একটা শব্দও হাশমিকে স্পর্শ করল বলে মনে হলো না। নামকরা, প্রতিভাধর রিয়্যাক্টর বিজ্ঞানীকে সরু একটা বিছানায় কষে বেঁধে রাখা হয়েছে; শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে স্ট্র্যাপগুলো ঢিলে করবার চেষ্টা করছেন তিনি।

রানার মনে হলো, দৃশ্যটার মধ্যে বেমানান কী যেন একটা আছে। তারপর ভাবল, গোটা ব্যাপারটাই তো উদ্ভট আর অবাস্তব লাগবার কথা; সুস্থ-সবল একজন মানুষের এই আচরণ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

এরমধ্যে বানোয়াট কিছু নেই তো?

অভিনয়?

ঘুরে দাঁড়িয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকাল রানা। তৌফিক আজিজ আনমনে মুখের লাল ক্ষতটায় আলতোভাবে আঙুল বুলাচ্ছেন। খোলা দরজা দিয়ে এরপর রানার দৃষ্টি চলে গেল রিয়্যাক্টরের দিকে।

জাভেদ হাশমি অভিজ্ঞ একজন রিয়্যাক্টর ইঞ্জিনিয়ার। বিপদটা সম্পর্কে তাঁর চেয়ে ভালো ধারণা আর কারও নেই। এত উর্বর একটা মস্তিষ্কে কী ধরনের গোলযোগ দেখা দিলে কেটলির ভিতর ঝাঁপ দিতে চাইবেন তিনি?

রানার পিছন থেকে হঠাৎ বিস্ময়সূচক একটা আওয়াজ করল তৌফিক আজিজ, তারপরই একটা খসখসে আর দ্রুত দম আটকানোর শব্দ। ঝট করে ঘুরতেই রানা দেখল কর্নেল যাদব পিছু হটছেন, আর ঘুসি মারবার জন্য শক্ত মুঠোটা উপরে তুলছেন হাশমি। যেভাবেই হোক নিজের একটা হাত মুক্ত করে ফেলেছেন তিনি।

রানা আর তৌফিক আজিজ প্রায় একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাশমির উপর, তাঁর মুক্ত হাতটা ধরে বিছানার সঙ্গে চেপে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

ওরা দু'জনেই অত্যন্ত ক্ষিপ্র, তবে আরও বেশি ক্ষিপ্র জাভেদ হাশমি। এরইমধ্যে অপর হাতটাও স্ট্র্যাপ থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন তিনি। তাঁর আসুরিক শক্তি অবিশ্বাস্য। রানা তাঁর ডান হাত ধরেছে, প্রাণপণ চেষ্টা করছে ওটাকে নীচে নামাতে, কিন্তু মুহূর্তের জন্য ওর গোটা শরীরটাকে শূন্যে তুলে ফেললেন তিনি, তারপর হাতটাকে ছাড়িয়ে নিয়েই ধাঁ করে চোয়ালে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলেন।

ব্যথায় কাতরে উঠবার আওয়াজটা নিজের বলে রানা চিনতে পারল না। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি একটা ক্ষিপ্রতা এনে দিল, খপ্ করে হাশমির কবজিটা

চেপে ধরল ও, সেই সঙ্গে শরীরের সমস্ত ভার চাপিয়ে দিল তাঁর কাঁধে। দম বন্ধ করে প্রচণ্ড জোর খাটাচ্ছে, ফলে অনুভব করল ওর জোড়া ঠোঁট বেলুনের মত ফুলে উঠছে আর মুখের ক্ষত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

পুরোটা সময় অল্প একটু কোঁতানো ছাড়া আর কোন আওয়াজ করছেন না হাশমি। রানা তাঁর হাতটা চেপে ধরে রাখতে ব্যস্ত হয়ে আছে, আশা করছে তৌফিক আজিজও নিশ্চয়ই অপর হাতটা ধরে রেখেছেন। তা যদি না হয়...হাশমির শরীর ফুলছে, মোচড় খাচ্ছে, আছড়াচ্ছে...মেজর ফালকে রফিককে নিয়ে ফিরে আসতে এত দেরি করছে কেন?

এভাবে বেশিক্ষণ চলতে পারে না। বেমক্কা কোথাও লেগে গেলে মারাত্মকভাবে আহত হবেন হাশমি। কিংবা ওদের কেউ একজন আহত হয়ে মারাই না যায়। রানার হাত ঘামছে, ফলে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে ওর মুঠো। ভাবতে আশ্চর্য লাগছে, কিন্তু বাস্তবতা অস্বীকার করবার উপায় নেই, হাশমির একটা হাতকে নিজের দুই হাতের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী মনে হচ্ছে ওর।

মাথা ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল রানা, ছুটন্ত পদশব্দের জন্য অপেক্ষা করছে। আর, কাজটা করতে গিয়ে, মাথাটা নিশ্চয়ই নিচু করেছিল ও। আচমকা ভীতিকর একটা ব্যথা পেল মুখে, সেই সঙ্গে অনুভব করল হাশমির গরম নিশ্বাস; দাঁত দিয়ে ওর গাল কামড়ে ধরেছেন, টেরিয়ার কুকুরের মত টেনে মাংস ছিঁড়ে আনছেন।

প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা সরিয়ে আনল রানা, তবে তাঁকে ছাড়ল না, মরিয়া হয়ে ধরে রাখল শক্ত করে। এক মুহূর্ত পরই ভিতরে ঢুকল রফিক, প্রস্তুত হয়ে আসায় হাশমির প্রসারিত হাতের উল্টোপিঠে একটা ইঞ্জেকশন দিতেও বিশেষ সময় নিল না। তারপর রানা শুনতে পেল গুণছে সে।

রফিক দশ পর্যন্ত গোনার পর রানা অনুভব করল হাশমির হাতের শক্তি কমে আসছে। বিশে দেখা গেল নেতিয়ে পড়েছে ওটা। রানা সিধে হতে যাবে, রফিক সাবধান করে দিয়ে বলল, 'আরও দশ সেকেন্ড পর, সার।'

রানা দাঁড়াতে ওর গালের ক্ষতটা লিকুইড অ্যান্টিসেপটিক ভেজানো তুলো দিয়ে মুছল রফিক, তারপর প্লাস্টার লাগিয়ে ঢেকে দিল।

তার হাতের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন কর্নেল যাদব, তারপর রানার কাঁধ চাপড়ে দিলেন। 'বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন, মিস্টার জয়। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড দেরি হলেই আপনার গালের অর্ধেক মাংস তুলে নিতেন উনি।'

'জানি। কেন পারলেন না?'

'মুখে শক্ত একটা ঘুসি পড়ায়।'

'আপনি?'

'আমি। ভগবান, ওঁর দিকে একবার তাকাবেন!'

তাকাল রানা। বিছানা থেকে আড়ষ্টভঙ্গিতে নামছেন তৌফিক আজিজ: ঘামছেন, তবে কোথাও আঘাত পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না। হাশমি নিথর পড়ে আছেন, জ্ঞান নেই: থেঁতলানো ঠোঁট আর নাকের একটা ফুটো থেকে রক্ত

গড়াচ্ছে।

'কর্নেল যাদব, সার?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রফিক।

তার দিকে ঘুরলেন ক্যাম্প কমান্ডার। 'ঠিক আছে, জানি আমি। আমার উত্তর হলো—ইয়েস। আমাদের যদি স্ট্রেইটজ্যাকেট থেকে থাকে, মিস্টার হাশমিকে সেটার ভেতর অবশ্যই ঢোকাতে হবে। আছে?'

'জী, সার, আছে।'

'ব্যাটাচ্ছেলে প্ল্যানাররা বাদ দেয়নি কিছু!' তিক্তকণ্ঠে বললেন কর্নেল। 'কিন্তু ওঁর পা দুটোর কী হবে?'

'আমরা...ইয়ে, সার...আমাদের হসপিটাল ইকুইপমেন্টের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ।'

'আর যে ইঞ্জেকশনটা দিলে? সেটা কতক্ষণ শান্ত রাখবে ওঁকে?'

'প্রায় আট ঘণ্টা, কর্নেল। তবে ইচ্ছে করলে, ঘুমের আরও ইঞ্জেকশন দিয়ে...'

কর্নেল যাদব তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'নেহি বেটা, তুম কোঈ ডক্টর তো নেহি হো না!'

'না, সার, ডাক্তার নই ঠিকই, কিন্তু আমি পুরোদস্তুর ট্রেনিং পাওয়া একজন...

'এক মিনিট, এক মিনিট।' এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করলেন ক্যাম্প কমান্ডার। 'ঠিক আছে, মন দিয়ে শুনুন। আপনাকে বলছি, মিস্টার আজিজ। আপনার লোকদের জানিয়ে দিন, এই ব্যাপারটা প্রাইভেট, কেমন? যারা জেনেছি, জেনেছি ; কিন্তু এই ঘটনার কথা রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চের বাইরে আর কেউ ঘুণাক্ষরেও যেন টের না পায়। কেউ মুখ খুললে আমি তাকে দেখে নেব।'

'মিস্টার যাদব,' তিনি থামতেই বলল রানা, 'মিস্টার হাশমিকে হসপিটালে পাঠানো উচিত না?'

'কী?' ভুরু কোঁচকালেন কর্নেল, বিরূপদৃষ্টিতে দেখলেন রানাকে, তারপর কী ভেবে কে জানে তাড়াতাড়ি চেহারাটা স্বাভাবিক করে নিয়ে বললেন, 'ও, হ্যাঁ, ভালো কথা মনে করেছেন, মিস্টার জয়। রফিক, এখনই ব্যবস্থা করো। আর মনে রেখো, বেচারি ইঞ্জিনিয়ারকে অচল করে ফেলে রাখতে হবে।'

'অচল করে ফেলে রেখে লাভ কি, ভদ্রলোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন না?' প্রতিবাদের সুরে বলল রানা, মনে মনে ভাবল—এ লোকের বুদ্ধিসুদ্ধি বোধহয় পঞ্চাশ শতাংশ নয়, আরও বেশি মাত্রায় কমেছে।

চোখে-মুখে অসহিষ্ণু একটা ভাব ফুটে উঠতে যাচ্ছে, মাঝপথে সেটাকে গায়েব করে দিয়ে কর্নেল বললেন, 'ধন্যবাদ, মিস্টার জয়; আমাকে আমার দায়িত্বের কথা না মনে করিয়ে দিলেও চলবে, প্লিজ।' তারপর আবার রফিকের দিকে ফিরলেন। 'শোনো, হে, মেডিক। মিস্টার হাশমিকে তুমি একটু পর হসপিটালে নিয়ে যাও। তার আগে রেডিও রুমে ছোটো, বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পের ডাক্তারদের সব কথা জানিয়ে জিজ্ঞেস করো এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত।

'রেডিওর মাধ্যমে ডাইগনোসিস আমি পছন্দ করি না, তবে আর কোন বিকল্পও নেই। রেডিও রুমের ওদেরকে বলবে, কিছু যেন ফাঁস না হয়, ঠিক

আছে? ফেরার সময় জ্যাকেটটা আনতে ভুলো না, কেমন?'

রফিক চলে যাওয়ার পর দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন কর্নেল। 'শুনুন। গোপন করে কোন লাভ নেই। এটা সত্যি মারাত্মক দুঃসংবাদ। আমরা সবাই ভয়ানক চাপের মধ্যে আছি...সব্বাই। এই চাপ যদি মিস্টার হাশমিকে কাবু করতে পারে, তাহলে যে-কোন মুহূর্তে আমরা যে-কেউ পাগলামি শুরু করে দিতে পারি...'

হাত তুলে তাঁকে থামাতে চাইল রানা, কিছু বলতে চায়।

ট্রাফিক পুলিশের মত পাল্টা হাত তুলে ওকে ধৈর্য ধরবার ইঙ্গিত করলেন কর্নেল। 'কাজেই, আমরা মুখে কুলুপ এঁটে রাখব। এক সময় ব্যাপারটা জানাজানি হবেই, তবে অন্তত কয়েক ঘণ্টা পর। এই কয়েক ঘণ্টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেন?

'মেইনটেন্যান্স ক্রুরা তিনটের মধ্যে দুটো জেনারেটর মেরামতের জন্যে খুলে ফেলেছে। তৃতীয়টা কোন কাজে আসবে না, মেরামতের অযোগ্য: এই মুহূর্তে ওটার পার্টস খুলে বাকি দুটোয় লাগে কিনা দেখা হচ্ছে। আমাদের সমস্ত কাজ এখন চলছে, মিস্টার জয়, বঙ্গবন্ধু ক্যাম্প থেকে আপনার নিয়ে আসা পোর্টেবল মেশিনটার সাহায্যে।

'ছোট্ট এই তথ্যটাও গোপনীয়। একেবারে কেউ জানে না তা নয়, বেশিক্ষণ হয়তো চেপেও রাখা যাবে না, তবু। ভাগ্য ভালো হলে, বড় জেনারেটরগুলোর মেরামতের কাজ আজ রাতের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে—অন্তত একটার তো বটেই। যে-কোন দুটো জেনারেটর চালু থাকলে রিয়্যাক্টর নিয়ে খুব একটা দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে আমাদের। কিন্তু ওই কয়েক ঘণ্টা সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

'তাই আমি চাইছি, মিস্টার জয়ের নেতৃত্বে হসপিটালে ইঞ্জিনিয়ার হাশমিকে পাহারা দেবে মেজর ফালকে আর মেডিক রফিক। যদি নিরাপদ বলে বিবেচিত হয়, ঘুমের ইঞ্জেকশন চালিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তা না হলে, আর মিস্টার হাশমি আবার যদি হাত খুলে ফেলেন, আপনারা তিনজন নিশ্চয়ই তাঁকে কাবু করতে পারবেন। ঠিক আছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, ঠিক নেই।' ওকে একটা দায়িত্ব দিয়ে এক জায়গায় বসিয়ে রাখবার ধারণাটা ভালো ঠেকছে না ওর।

'আমি জানতাম এ-ধরনের কিছু একটা বলবেন আপনি।' আরও গম্ভীর হলেন নেতাজি ক্যাম্পের কমান্ডার। 'কী ঠিক নেই বলবেন, প্লিজ?'

'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন যে আপনাদের ক্যাম্পে আমি একটা কেস নিয়ে এসেছি,' বলল রানা। 'আমাকে সারাক্ষণ ঘোরাঘুরির মধ্যে থাকতে হবে।'

'ভুলিনি, মিস্টার জয়। আপনার ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা আমি খর্বও করতে চাইছি না। ইচ্ছে মত টহল দিন, তবে মাঝে মধ্যে হসপিটালে ঢুঁ মেরে যাবেন—ব্যস, এটুকুই চাওয়া হয়েছে আপনার কাছে। আর কী ঠিক নেই, বলুন?'

'সম্ভবত আপনার ডাইগনোসিস,' বলল রানা।

'মানে?'

'টেনশানের কারণে মিস্টার হাশমি পাগলামি শুরু করেছেন, আপনার এই কথার সঙ্গে আমি একমত নই।'

'তা হলে? তাঁর এই উন্মত্ততাকেও আপনি স্যাবটাজ বলতে চাইছেন নাকি?'

'আপাতত শুধু এটুকু জেনে রাখুন, মিস্টার যাদব, সে সম্ভাবনা আমি একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না।'

'অ্যায় ভাগওয়ান!' চট করে একবার সিলিঙের দিকে তাকালেন কর্নেল। 'হাম সব লোগকো বাচা লে তু।'

'আরেকটা কথা, মিস্টার যাদব, আজ সকালের দিকে আপনার প্রলাপ বকা আর সাময়িক স্মৃতি লোপের ঘটনাটাও কিন্তু স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারছি না আমি। ওটাও, আমার ধারণা, স্যাবটাজই।'

'ত্যব তো জিনাহি মুশকিল হো যায়ে গা...'

'হ্যাঁ,' সায় দিয়ে বলল রানা। 'বেঁচে থাকা সত্যি মুশকিল হয়ে উঠছে।'

চোদ্দ

আধ ঘণ্টা পর দেখা গেল হসপিটালের ভিতর, ডাক্তারের চেম্বারে, ডেস্কে একা বসে রয়েছে মেজর ফালকে। স্লেজে তুলে রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চ থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে জাভেদ হাশমিকে। কেউ যদি দেখেও থাকে, কাকে আনা হলো বুঝতে পারেনি তারা, কারণ মুখটা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল।

এই মুহূর্তে একটা ক্যাবিনের স্টিল কটে শুয়ে আছেন তিনি; শরীরের উপরের অংশ স্ট্রেইটজ্যাকেটের ভিতর, গলা থেকে পা পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। অ্যানেসথেটিক তাঁকে গভীর নিদ্রায় বেঁধে রেখেছে।

হঠাৎ শহীদুল হকের কাছ থেকে জরুরি একটা রেডিও মেসেজ পাওয়ার পর দশ মিনিটা হলো গায়েব হয়ে গেছে রানা। মেজর ফালকের মত অনেকেই জানে না এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছে ও।

মেসেজটা পাওয়ার পর কর্নেল যাদবের সঙ্গে নিভৃতে মিনিট পাঁচেক আলাপ করেছে রানা। 'আমি চাই পুত্তালাম বর্ধনকে আপনি অ্যারেস্ট করুন,' এভাবে শুরু করেছে ও।

পরমুহূর্তে কর্নেল যাদবকে আকাশ থেকে পড়তে দেখা গেল। 'পুত্তালাম বর্ধন আবার কে?' জানতে চাইলেন তিনি।

অগত্যা তখন ব্যাখ্যা করে বলতে হয়েছে ওটাই বিশালা কালমুনাইয়ের আসল নাম। তা ছাড়াও বিস্তারিত জানাতে হয়েছে নেতাজি ক্যাম্পে আর শ্রীলঙ্কায় কী ধরনের অপরাধ করে বেড়াচ্ছে সে আর তার বাহিনী।

সব শুনে চেহারাটা গম্ভীর করে ফেললেন কর্নেল, যেন রানার উপর সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। ভারী গলায় প্রশ্ন করলেন, 'এই যে এত সব স্যাবটাজ ঘটছে বলে সন্দেহ করছেন আপনি, এগুলোর জন্যে কি কালমুনাইকে দায়ী করা চলে? তার বিরুদ্ধে সেরকম প্রমাণ আপনার হাতে আছে?'

সত্যি কথাই বলল রানা। 'না, এখনও আমি নিশ্চিত নই এ-সবের পিছনে

তার হাত আছে কি না।'

'আপনি যে মেসেজ পেয়েছেন তাতে বলা হয়েছে শ্রীলঙ্কায় কালমুনাইয়ের শিষ্যরা প্রায় সবাই অ্যারেস্ট হয়েছে, নয়তো পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে মারা গেছে। বেশ, অত্যন্ত ভালো খবর। কিন্তু কালমুনাই আর তার পাঁচ সহকারীকে অ্যারেস্ট করতে চাইছেন কেন?'

'দেশে তার বাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, এ-খবর পাবার পর ভয়ঙ্কর কিছু একটা করে বসতে পারে তারা। তাদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়বে শ্রীলঙ্কান টেকনিশিয়ানদের ওপর।'

'আপনি তো আপনার কথা বললেন, এবার আমার সমস্যার কথাটা দয়া করে একটু শুনুন। কালমুনাই আর তার ওই পাঁচ সহকারী না থাকলে ট্র্যাক্টর শেড, অর্থাৎ পরিবহন ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়বে, কারণ ওরা ছয়জন ছাড়া দক্ষ মেকানিক বা হেভি ভেহিকেল চালাবার মত এক্সপার্ট ড্রাইভার আর কেউ নেই আমাদের। মুরালি ছিল, কিন্তু তাকে তো আপনি বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে রেখে এসেছেন।'

'তারমানে ওদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে না?'

কর্নেল পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আমাকে ক্যাম্পটা অচল করে দিতে বলেন?'

'ক্যাম্প যাতে অচল না হয় তার বিকল্প ব্যবস্থা নেই?'

'না থাকলে করতে হবে, কিন্তু তার জন্যে আপনি আমাকে সময় দেবেন না?'

'কী রকম সময় চান আপনি?' জানতে চাইল রানা।

'সেটা এখনই বলা খুব কঠিন, মিস্টার জয়। ওদের বদলে বঙ্গবন্ধু ক্যাম্প থেকে অন্য লোকজন আনাতে হবে। আর তা আনাতে হলে আবহাওয়ার সম্মতি দরকার...'

'ঠিক আছে, এ-ব্যাপারে আমি আপনাকে বাধ্য করতে চাই না। তবে খারাপ কিছু ঘটলে তার দায়-দায়িত্ব কিন্তু আপনাকেই বহন করতে হবে।'

কালমুনাই আর তার পাঁচ সঙ্গীকে অ্যারেস্ট করা যাচ্ছে না, অগত্যা বাধ্য হয়ে বিকল্প পথটাই বেছে নিল রানা। মনটা খুঁতখুঁত করছে ওর, কর্নেল যাদবের আচরণ মোটেও স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। ভদ্রলোক কি কালমুনাইকে রক্ষা করবার চেষ্টায় আছেন?

ট্র্যাক্টর শেডে একটা কাজে যাচ্ছি বলে রানা আসলে মেইন স্ট্রিট ধরে চলে এসেছে রেডিও রুমে। আইসক্যাপে হারিয়ে যাওয়া রেডিও অপারেটর রত্নে গোপালচন্দ্রের কাজিন রত্নে উপলচন্দ্রকে ডিউটিতে পেল ও। আরেক রেডিও অপারেটর কুমারাতুঙ্গাও কাছেপিঠে ছিল।

দু'জনকেই আড়ালে ডেকে আনল রানা, তারপর উপলচন্দ্রের হাতে বিশজন শ্রীলঙ্কান ড্রাইভার আর টেকনিশিয়ানের নাম লেখা একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে ব্যাখ্যা করল কী করতে হবে। তালিকাটায় কুমারাতুঙ্গা আর উপলচন্দ্রের নামও আছে, তারাও বিশালা কালমুনাইয়ের চক্করে পড়ে দেশের সম্পত্তি প্রায় সবই খুইয়ে বসেছে।

বাকি আঠারজনকে জানাতে হবে, শ্রীলঙ্কায় ক্রাইম সিন্ডিকেট ফিফটি

পারসেন্টের যে-সব সদস্য শ্রীলঙ্কায় তাদের আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখিয়ে টাকা-পয়সা আর সয়-সম্পত্তি দখল করে নিচ্ছিল তারা হয় পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে মারা গেছে, নয়তো অ্যারেস্ট হয়েছে। অর্থাৎ, বিশালা কালমুনাই বা তার পাঁচ গুণ্ডার দিন শেষ হয়ে এসেছে। তবে এখনই তাদের বিরুদ্ধে কেউ যেন কিছু করতে না যায়, কারণ কোণঠাসা বিড়াল বাঘের চেয়ে কম হিংস্র নয়।

এদেরকে একটা জরুরি কাজ দিল রানা। প্রথম কথা, শান্ত থাকতে হবে তাদের, যেন কিছুই ঘটেনি; এবং চুপিসারে কালমুনাই ওরফে পুত্তানাম বর্ধন আর তার পাঁচ সঙ্গীর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে কুমারা বা উপলকে জানাবে তারা, আর ওরা দু'জন রিপোর্ট করবে রানাকে।

কী ঘটে গেছে উপলব্ধি করবার পর উপলচন্দ্র আর কুমারাতুঙ্গার মধ্যে চাপা আনন্দ আর উল্লাস দেখা গেল।

ওদেরকে প্রাসঙ্গিক কয়েকটা প্রশ্ন করে রানা জেনে নিল, কালমুনাই আর তার পাঁচ শিষ্যের সার্ভিস পাওয়া না গেলেও নেতাজি ক্যাম্পের পরিবহন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়বে না।

এরপর উপল বলল, তার একটা সন্দেহের কথা রানাকে জানাতে চায় সে।

গোপাল রেডিও অপারেটর ছিল। উপলের ধারণা, হয়তো সেটাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। কালমুনাই তো তার মাধ্যমেই শ্রীলঙ্কায় গোপন মেসেজ পাঠাত, তাই না? এমন হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক যে গোপাল হয়তো মেসেজগুলোর সারমর্ম বুঝে ফেলে, আর তার আচরণে সেটা গোপনও থাকেনি। এমনকী কালমুনাইকে সে হয়তো হুমকিও দিয়েছিল–সব কথা কর্নেলকে বলে দেবে। ফলে কালমুনাই সিদ্ধান্ত নিল, গোপালকে খুন করবে সে। যেভাবেই হোক একটা সুযোগ তৈরি করে নিয়ে আইসক্যাপে উঠে গোপালকে সেই মেরে ফেলেছে। তার একটা দল আছে, কাজেই কাজটা তার পক্ষে সম্ভব।

রানা ওদের দু'জনকে নির্দেশ দিল, এখন থেকে দুর্বোধ্য বা সাংকেতিক কোন মেসেজ এলে তা যেন কালমুনাইকে দেয়া না হয়।

রানাকে হসপিটাল চেম্বারে ঢুকতে দেখে একটা সিগারেট ধরাল মেজর ফালকে। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'আমি বরং মিস্টার হাশমির পাশে গিয়ে বসি।'

'চলুন, দু'জনেই যাই,' বলল রানা।

মেজর ইতস্তত করছে। 'ভদ্রলোককে আসলে শান্তিতে ঘুমাতে দেয়া উচিত। দু'জন হলে কথা বলব আমরা।'

হাসি পেলেও রানা হাসল না। 'আমি অতটা ছেলেমানুষ নই। চলুন।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে পাশের ক্যাবিনটায় ঢুকে পড়ল মেজর ফালকে। তার পিছু নিতে যাবে রানা, চেম্বারের দরজায় মেডিককে দেখা গেল।

দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে রফিক। থিউল বা বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।

ক্যাবিনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জাভেদ হাশমিকে একবার দেখল সে,

তারপর ছোট্ট যে লাইব্রেরিটায় নিহত ডাক্তার আরিফ হাসান তাঁর ডাক্তারি বই-পত্র রাখতেন সেটায় তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালাল প্রায় এক ঘণ্টা ধরে।

রানা বা মেজর ফালকে তার কোন সাহায্যে আসবে না, ওরা শুধু মাঝে মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে গেল তাকে।

এরকম একবার উঁকি দেওয়ার সময় রানা শুনল, 'শালার ভাগ্য!' বলে নিজেকে গাল দিল রফিক, হাতের বইটা সশব্দে রেখে দিল শেলফে। তারপর রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাত দুটো দুর্বলভঙ্গিতে দু'পাশে ঝুলে পড়তে দিল, বলল, 'বলতে পারেন, সার, এখন আমি কি করব?'

'প্রথমে,' বলল রানা, 'বেশ কড়া এক মগ কফি খাবে। আর যদি অভ্যেস থাকে তো একটা সিগারেট।'

'ওটা ছেড়ে দিয়েছি।'

'তা হলে শুধু কফি। তারপর শান্ত হয়ে বসতে হবে তোমাকে। আরেকটা কথা, রফিক–তুমি আমাকে সার বলবে না। ইচ্ছে হলে হাসান ভাই বলতে পার।'

মগে কফি ঢালবার সময় দেখা গেল রফিকের হাত কাঁপছে।

রানা নরম সুরে বলল, 'দোষটা তোমার নয়। তুমি তো আর সাইকিয়াট্রিস্ট নও। কাজেই যা জানো না তা জানো না, ওটা ভুলে গিয়ে চিন্তা করো এরপর কি করার আছে। বলেছ ইঞ্জেকশনটা মিস্টার হাশমিকে আট ঘণ্টা ঘুম পাড়িয়ে রাখবে। ওটা কি রিপিট করা যাবে?'

মাথা নাড়ল রফিক। 'না। ওঁকে আমি জেনারেল অ্যানেসথেটিক-এর ফুল ডোজ দিয়েছি।'

'তা হলে এরপর কী?' হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল রানা।

'একটা সেডাটিভ,' বলল রফিক।

'তারপর?'

চোখের পাতা খুব জোরে বন্ধ করে রফিক যেন ভাবাবেগ দমন করবার চেষ্টা করল। তারপর অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। 'ওঁর যে কী হয়েছে তাই তো আমি জানি না, সার... হাসান ভাই। মিস্টার হাশমির এই অসুস্থতা শারীরিকও হতে পারে। কে জানে, নিউমোনিয়া বা অন্য কিছু হয়তো ধরতে যাচ্ছে, এ-সব তারই আগাম আভাস। সেক্ষেত্রে আমি যা করছি...'

বাধা দিল রানা। 'তুমি তোমার জ্ঞান, বিবেচনা আর সাধ্যমত করছ। সিদ্ধান্ত নেয়ার দরকার হবে আরও অনেক পরে, ভাগ্য ভালো হলে তার আগেই রেডিও থেকে ডাক্তারদের পরামর্শ পেয়ে যাবে তুমি।'

'হ্যাঁ, ভাগ্য ভালো হলে! কিন্তু তাঁদেরকে আমি বলবটা কী, হাসান ভাই? ভদ্রলোক স্রেফ উন্মাদ হয়ে গেছেন। তাঁর মাথার ভেতর কিছু একটা ঘটেছে। আর...ব্যাপারটা আমি শুনেছি মাত্র, নিজের চোখে কিছু দেখিওনি। শুধু এটুকু দিয়ে ডাইয়াগনোস করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তুমি তাঁর ব্লাড প্রেশার, টেম্পারেচার, পালস রেট নিতে পার। এ-সব শুনে বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পের সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক ওষুধের নাম বলে দেবেন...'

ঝট করে রানার দিকে তাকাল রফিক, তার চোখে একাধারে ভয় আর

হতাশা। 'এরপর যখন আরেকজন পাগলামি শুরু করবে, তখন?'

'আরেকজন... মানে?'

'কারও অভ্যেসই তো ভাল নয়, হাসান ভাই। ছাইপাঁশ গিলে ভেতরটা তো প্রায় পচিয়ে ফেলেছেন...' বেশি কথা বলা হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে হঠাৎ চুপ করে গেল রফিক, মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল।

পাঁচ সেকেন্ড কেউ কথা বলল না বা নড়ল না। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাবিনের আধ খোলা দরজার দিকে একবার তাকাল রানা।

ডাক্তারের এই চেম্বার থেকে খোলা দরজার ভিতর হসপিটাল ক্যাবিনের বেডটার অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে, বেডের সামনে দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে রয়েছে মেজর ফালকে। 'তুমি আমাকে সব কথা খুলে বলো, রফিক,' ওর গলার আওয়াজ খাদে নামানো।

'বিশ্বাস করুন, হাসান ভাই, আমি কারও দুর্নাম করতে চাইছি না...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'তা আমি জানি। আমরা কথা বলছিলাম, আরেকজন যদি পাগলামি শুরু করে তা হলে কী হবে। এরকম সন্দেহ তোমার মনে এল কেন?'

'এটা আমার ধারণা বলতে পারেন, হাসান ভাই।' একটা ঢোক গিলল রফিক। 'তবে...'

রানা অপেক্ষা করল, কিন্তু রফিক কথাটা শেষ করছে না। 'তবে কী?'

'ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা কঠিন, হাসান ভাই। মনের অবস্থা সবারই খুব খারাপ। কঠিন চাপের মধ্যে আছেন সবাই। একের পর এক অনেক কিছু ঘটে গেছে। এটা আরেকটা নতুন কেস।' ইঙ্গিতে ওয়ার্ড আর ইঞ্জিনিয়ার হাশমির বেডটা দেখাল। 'এরপর কার পালা কে জানে!'

'মিস্টার হাশমি রাতদিন কাজ করছিলেন,' বলল রানা। 'খুব বেশি ধকল যাচ্ছিল তাঁর ওপর দিয়ে...'

'জী। কিন্তু কেন ধকল যাচ্ছিল? কারণ সব কিছু ভেঙে পড়ছে। সেজন্যে লোকজনের মনে একটা ভয়, একটা অজানা আশঙ্কা–আবার না কিছু ঘটে!'

'কী বলাবলি করছে তারা?'

'বলছে তো অনেক কথাই।'

'যেমন?'

'বলছে বিজ্ঞানী ডক্টর ওসমান ফারুক নাকি বাংলাদেশের সঙ্গে বেঈমানী করেছেন...'

'মানে?' বিষম খাওয়ার অবস্থা হলো রানার।

'নিজের গোপন ল্যাবে বসে তিনি নাকি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আবিষ্কার করেছিলেন,' বলে চলেছে রফিক। 'সেই আবিষ্কারের নমুনা আর থিউরি বিদেশী কোন ক্রেতার কাছে বেচতে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর পাতা ফাঁদকে ফাঁকি দেয়া কি এতই সোজা?'

'সবার তা হলে ধারণা ওটা আল্লাহর মার, হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করাটা?'

'সবার না হলেও, অনেকেরই,' বলল রফিক। 'আমারও তাই ধারণা, হাসান ভাই।'

'কোন প্রমাণ ছাড়া শ্রদ্ধেয় একজন মানুষ সম্পর্কে এরকম ধারণা তো ভালো কথা নয়, রফিক।' রানা গম্ভীর আর বিরক্ত।

'যেখানে রহস্য বা গোপনীয়তা সেখানেই ভুল ধারণার সৃষ্টি, এটা মানবেন তো, হাসান ভাই?' যুক্তি দেখাল রফিক। 'ক্যাম্পের একটা লোকও কি জানত ডক্টর ওসমান ফারুক সারাক্ষণ ল্যাবে বসে কি করতেন? ভেবে দেখুন না, তিনি ওভাবে মারা যাবার পর অদ্ভুত সব গুজব ছড়ানোটাই তো স্বাভাবিক।'

'কিন্তু ডক্টর ফারুক তো মারাই গেছেন, তা হলে এত সব ক্ষতিকর কাণ্ড ঘটছে কেন? কে দায়ী?'

'কে দায়ী, নির্দিষ্ট করে সে-কথা বলার সময় এখনও বোধহয় আসেনি। আর যদি বলেন কেন ঘটছে...হাসান ভাই, এখানে একজনের কাছে জেমস বন্ডের একটা বই আছে...'

জোর করে একটু হাসল রানা। 'কিন্তু সে তো আর এখানে নেই।'

'তা হয়তো নেই,' সরু এক চিলতে হাসি দেখা গেল রফিকের ঠোঁটেও। 'প্রসঙ্গ অবশ্য জেমস বন্ড নয়। বইটা খুললে আল কাপোন-এর একটা উদ্ধৃতি আছে, হাসান ভাই–"ওয়ান্স ইজ হ্যাপেনস্ট্যান্স, সেকেন্ড টাইম কোইন্সিডেন্স। থার্ড টাইম ইট'স এনিমি অ্যাকশন।"'

আসল বা মূল প্রসঙ্গ তুলবার আগে ক্যাম্পের পরিস্থিতি সম্পর্কে যতটা সম্ভব পরিষ্কার একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করছে রানা। 'কিন্তু এখানে এনিমি, মানে শত্রুটা কে?' জিজ্ঞেস করল ও। 'আর অ্যাকশনটাই বা কীসের?'

শ্রাগ করল রফিক। 'কে জানে?'

ছেলেটা কি কিছু চেপে যাচ্ছে? অনেকদিন হলো নেতাজি ক্যাম্পে আছে সে, খুঁটিনাটি বহু তথ্য তার জানা। 'এবার বলো, কারও অভ্যেসই ভালো ছিল না কথাটার মানে কী?'

'মুখ ফসকে কথাটা যখন বেরিয়ে গেছে তখনই বুঝতে পেরেছি, আপনি আমাকে ছাড়বেন না।' ম্লান দেখাল রফিককে। 'হাসান ভাই, কথাটা আপনি আমার মুখ থেকে শুনেছেন এটা যদি জানাজানি হয়ে যায় তা হলে কিন্তু আমার...'

'কথা দিলাম, কেউ জানবে না। তুমি নির্ভয়ে বলো।'

'ওঁরা, হাসান ভাই, প্রায় সবাই অ্যাডিক্টেড।'

'মদ?'

মাথা নাড়ল রফিক। 'না, হাসান ভাই।'

'তা হলে?'

'ফেনসিডিল, গাঁজা, চরস, হেরোইন–কোনটাই বাদ নেই।'

বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল রানা। 'তুমি যখন জানো, কর্নেল যাদবও নিশ্চয় জানেন। তিনি কিছু বলেন না?'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকবার পর রফিক বলল, 'তাঁর কি

কাউকে কিছু বলার মুখ আছে? তিনি নিজেই যেখানে অভ্যস্ত?'

'ওহ্, গড!'

'ডাক্তার হাসান ফেনসিডিল খেতেন। ইঞ্জিনিয়ার হাশমি খান চরস। কর্নেল যাদবকে আমি নিজের চোখে হেরোইন খেতে দেখেছি...'

'এ-সব ড্রাগস আসে কোত্থেকে? কীভাবে আসে? কে আনায়?'

'তা আমার জানা নেই, হাসান ভাই।' খানিক ইতস্তত করল রফিক, তারপর শিরদাঁড়া একটু খাড়া করে আবার বলল, 'তবে আরেকটা তথ্য দিই আপনাকে, দেখুন আন্দাজ করতে সুবিধে হয় কিনা।'

'কী তথ্য?'

'অফিসার আর সার্জেন্টদের ক্লাবে তাস খেলা হয়, এ তো আপনি জানেনই। ট্র্যাক্টর শেডেও খেলা হয়। কিন্তু এ-কথা কি জানেন যে কর্নেল যাদবের হাটে হাই স্টেকে জুয়া খেলা চলে? গভীর রাতে, গোপনে?'

'কাদের সঙ্গে খেলেন তিনি?'

'একজন বাদে সবাই তারা অফিসার,' বলল রফিক।

রানা ভাবল, সেই একজন কি কালমুনাই? 'কে সে?' জানতে চাইল রানা।

'লোকটা ট্র্যাক্টর শেডের ইনচার্জ, হাসান ভাই,' বলল রফিক। 'নাম বিশালা কালমুনাই।'

'গভীর রাতে তাকে তুমি কর্নেলের হাটে ঢুকতে দেখেছ?'

'হ্যাঁ, গভীর রাতে,' জোর দিয়ে বলল রফিক। 'বহুদিন।'

এত সব অবাক করা তথ্য হজম করতে সময় লাগছে রানার। ওর মনে পড়ল, কর্নেল যাদব ওকে বলেছেন কালমুনাই যে কৌশলে জুয়া খেলিয়ে লোকজনের সর্বনাশ করছে এটা এতদিন তাঁর জানা ছিল না। অথচ দেখা যাচ্ছে কালমুনাইকে নিয়ে নিজেই তিনি জুয়ার আসর বসান! 'এ সম্পর্কে আর কী জানো তুমি, রফিক? কে হারে বা কে জেতে? খেলাটা প্রতিদিন হয় কি না?'

মাথা নাড়ল রফিক। 'এত কিছু আমার জানা নেই, হাসান ভাই।'

তথ্য পাওয়ার আশায় আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল রানা। 'শত্রু সনাক্ত করাটা জরুরি, রফিক। কে হতে পারে সে?'

আবার সরু এক চিলতে হাসি দেখা গেল রফিকের ঠোঁটে। 'ক্যাম্পের যে-কেউ হতে পারে, হাসান ভাই।'

'আমিও?'

'ইয়ে, হ্যাঁ, আপনিও!'

'কিংবা তুমিও?'

'অবশ্যই।'

রানা বলল, 'হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করার বা গোপাল নিখোঁজ হবার সময় আমি এখানে ছিলাম না। তোমার তালিকা থেকে আমাকে বাদ দেয়া উচিত না? তবে তুমি তখন ছিলে।'

রফিক বলল, 'দূর, না, আমি নই।'

'তা হলে কে?'

'দেড়শোর ওপর লোক, হাসান ভাই। তাদের মধ্যে যে-কেউ হতে পারে।'

'বিশেষ কেউ নেই?'

'না, হাসান ভাই।'

'সন্দেহের একটা তালিকা করে, ধীরে ধীরে সেটাকে ছোট করে আনা যায় না?'

প্রথমে মাথা নাড়ল রফিক, তারপর প্রবল হতাশায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আপনাকে, হাসান ভাই, ব্যাপারটা আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। 'প্রথমেই আপনার জানা দরকার, আইসক্যাপে বদলি হয়ে আসাটাকে সবাই একটা অভিশাপ বলে মনে করে। আসার আগে অনেকে মনে করে অ্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছি, তারপর এক কি দেড় মাস কাটতে যা দেরি, পালাবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে সবাই। কিন্তু একবার চলে এলে এখান থেকে বেরুনো অত্যন্ত কঠিন।'

'তারমানে কি মোহ কেটে গেছে এমন কারও কাজ এ-সব?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'গোটা ফ্যাসিলিটি স্যাবটাজ করছে, যাতে তার পালাবার সুযোগ হয়?'

মাথা ঝাঁকাল রফিক। 'নিশ্চয়ই এরকম কিছু একটা হবে। মানুষের মাথার ভেতর কী চলছে আমরা কেউ জানি?'

'কিন্তু তোমার এই পাগলটা যে বিপদ সবার জন্যে ডেকে আনছে, সেটা তো তারও বিপদ হয়ে দেখা দেবে, তাই না? এই ক্যাম্প অচল হয়ে পড়ার কারণে সবাইকে যদি চলে যেতে হয়, তাকে হয়তো সবার শেষে বেরুতে হবে, সবার আগে নয়। আর যদি ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে মানুষ মারা যাচ্ছে, তা হলে আর সবার মত তারও তো মরার আশঙ্কা দেখা দেবে।'

'এটা আপনার মত আমিও ভেবেছি। কিন্তু সে কি ভেবেছে? এমন হতে পারে যে আমরা সম্ভবত একজন সাইকোটিককে নিয়ে আলাপ করছি। সে হয়তো এই জায়গা আর এখানকার লোকজনকে ঘৃণা করে–এমনকী সম্ভবত নিজেকেও–আর আঘাত বা ক্ষতি করা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করার ক্ষমতাই হয়তো নেই তার।'

'লোকটা যদি উন্মাদ হয়, শ্বেতভালুক এসে ফুয়েল ট্যাংক ছিঁড়ে দিয়ে যাবার ব্যাপারটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এ হলো সেয়ানা পাগল। বিচিত্র সব উপায়ে আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে মজা পেতে চাইছে। তবে, হাসান ভাই, খুব বড় একটা অসঙ্গতি আমার চোখেও ধরা পড়েছে।'

সাবধানে জিজ্ঞেস করল রানা,'কী?'

'ডাক্তার হাসানের লাশ কোথায় পড়েছিল? মেইন টানেল এন্ট্রান্সে, ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কিন্তু ডাক্তার হাসান ভুলেও কখনও টানেল এন্ট্রান্সে যেতেন না,' বলল রফিক। 'বলতে পারেন এই ব্যাপারটা তাঁর কাছে একটা ফোবিয়ার মত ছিল। হসপিটাল, মেস হল আর অফিসার্স ক্লাব, নেতাজি ক্যাম্পে এই তিনটে জায়গা নিয়ে আমার জগৎ–কথাটা প্রায়ই বলতেন তিনি। এখানে আসার পর একবারও তিনি সারফেসে ওঠেননি। বলতেন, সেই ফেরার সময় আরেকবার উঠব।'

'কথাটা ঠিক বিশ্বাস করার মত নয়।'

'কিন্তু তাঁকে আমি কয়েকবার বলতে শুনেছি।'

'তবু, মেনে নেয়া যায় না,' বলল রানা। 'যেদিন ভালুকটা এল, এন্ট্রান্সের পাশে আমার সঙ্গে ছিলেন তিনি। ভালুকটা কী করেছে দেখাবার জন্যে তাঁকে নিয়ে ফুয়েল স্টোরেজে যাই আমি।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রফিক, সামান্য একটু অপ্রতিভও দেখাল তাকে। 'কিন্তু আমি যেটাকে সত্যি বলে জানি সেটাকে তো অস্বীকার করতে পারব না। ডাক্তার হাসান একদিন আমাকে বললেন–ক্যাম্পে আসার পর থেকে একদিকে অফিসার্স ক্লাব ট্রেঞ্চ, আরেকদিকে রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চ, এ-দুটোকে ছাড়িয়ে এক পা-ও কোথাও যাননি তিনি। এই কথাটা আমি নিজের কানে তাঁর মুখ থেকে শুনেছি।'

'আচ্ছা, বেশ...

'তারপর,' বলে চলেছে রফিক, 'এক রাতে ওখানে তিনি গেলেন–মনে রাখবেন রাতে, কারণ সন্ধের পর ক্লাব ছাড়া অন্য কোথাও তাঁকে পাওয়া যেত না–এবং মারা গেলেন। তুষার তাঁর লাশ ঢেকে দিল, তারপর একটা বুলডোজার সেটাকে বানাল মাংসের কিমা। বলা হচ্ছে থ্রমবোসিস না কীসে যেন আক্রান্ত হন, তাই না? হেঁটে ওখানে গেলেন, যেখানে ভুলেও কখনও যান না, আর যেতেই থ্রমবোসিস ধরে বসল তাঁকে? পড়ে গিয়ে মরলেনও এমন জায়গায় যেখানে তুষার লাশটা ঢেকে দেয়ার আর বুলডোজারটা থেঁতো করার সুযোগ পায়?'

রানার উদ্দেশ্য ছিল রফিকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পাওয়াও গেছে তার কাছ থেকে। সেই সূত্রে জানা গেল, কিছু কিছু ব্যাপারে ভুল ধারণা পোষণ করে সে। ইচ্ছে করলেই তার ভুল ধারণাগুলো ভেঙে দিতে পারে রানা। কিন্তু তা ভাঙতে হলে ওর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা সহ গোপন কিছু তথ্য প্রকাশ করতে হয়। সেটা একদমই উচিত হবে না।

ডাক্তার হাসানের অবর্তমানে রফিকের গুরুত্ব এখন অনেক বেড়ে গেছে। বন্ধু-বান্ধব ছাড়াও বহু লোকের সঙ্গে কথা হবে তার। রানার কাছ থেকে যাই সে জানবে, গোটা ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়তে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি লাগবে বলে মনে হয় না।

ক্যাবিন থেকে মেজর ফালকে বেরিয়ে আসতে আলাপটা শেষ করতে সুবিধে হলো রানার। ডাক্তারের লাইব্রেরি থেকে একটা থ্রিলার নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হাশমির স্টিল কটের পাশে এসে বসল।

অ্যানেসথেটিকের কল্যাণে, কৃত্রিম ঘুমের মধ্যে, মুখ খুলে সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছেন হাশমি। তবে আর যাই হোক, আরাম পাচ্ছেন বলে মনে হলো। এই মুহূর্তে তাঁকে দেখে কল্পনা করা কঠিন যে খানিক আগে স্রেফ একটা হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হয়েছিলেন। রানার গালে যেখানে কামড় দিয়েছেন, এখনও ব্যথা করছে জায়গাটা। রানার মনে আবার সেই প্রশ্নটা ফিরে এল–ভদ্রলোকের মাথায় কী এমন গোলযোগ দেখা দিল যে রিয়্যাক্টরের কেটলিতে লাফিয়ে পড়তে চাইলেন?

ইঞ্জিনিয়ার হাশমিকে পাহারা দেওয়ার কাজটা মেজর ফালকের সঙ্গে স্বেচ্ছায় ভাগ করে নিয়েছে রানা। অজ্ঞান মানুষের মত অসহায় আর কেউ নেই, তাঁর নিরাপত্তার দিকে একটা চোখ না রাখাটা বোকামি হয়ে যেতে পারে।

দেড় ঘণ্টা পর আবার মেজর ফালকের পালা শুরু হতে হসপিটাল থেকে বেরিয়ে এল রানা, কমান্ড হাটের দিকে যাচ্ছে। কর্নেল যাদবের সঙ্গে বসবে ও। জানতে হবে তাঁর বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ শোনা যাচ্ছে সেগুলো কতটুকু সত্যি।

***

সুমেরুর ডাক-২

প্রথম প্রকাশঃ ২০০৪

এক

কমান্ড হাট থেকে বেরিয়ে আসবেন ক্যাম্প কমান্ডার কর্নেল যাদব, এই সময় রানাকে ঢুকতে দেখে স্থির হয়ে গেলেন। 'আপনাকে আমার ভগ্নদূত বলে মনে হচ্ছে, মিস্টার জয়,' বললেন তিনি। 'আবার কোনও দুঃসংবাদ নিয়ে আসেননি তো?'

'দুঃখিত,' বলে চুপ করে থাকল রানা।

'দুঃখিত কেন?' চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকালেন কর্নেল।

'এইজন্যে যে এগুলো শুধু আপনার জন্যেই দুঃসংবাদ।'

এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে রানার চোখের ভাষা পড়ে ফেললেন কর্নেল যাদব। পিছু হটে নিজের চেম্বারে ঢুকলেন আবার, উদার ভঙ্গিতে হাত তুলে ডেস্কের সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে অমায়িক হাসলেন। 'ইউ আর ওয়েলকাম, মিস্টার জয়বাংলা। দুঃসংবাদকে ভীম সিং যাদব ভয় পায় না।'

শিরদাঁড়া খাড়া করে চেয়ারটায় বসল রানা। 'আপনি বোধহয় মান-সম্মান হারাতেও ভয় পান না। তা পেলে কী আর কালমুনাইয়ের সঙ্গে জুয়া খেলতে বসেন!'

রানার দিকে তাকিয়ে অটল দাঁড়িয়ে থাকলেন কর্নেল। তারপর খুব স্মার্ট একটা ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকালেন। 'কথাটা যেই আপনাকে বলে থাকুক, ভুল বলেছে। সে আসলে সবটুকু জানে না।'

'আপনি জানাবেন সেই আশায় অপেক্ষা করছি আমি।'

হঠাৎ হেসে উঠলেন কর্নেল যাদব। 'জানাবার আসলে তেমন কিছু নেই। শুনলে আপনার বোধহয় হাসি পাবে।'

'বিশ্বাস করুন, হাসতেই আমি চাই।'

'কয়েকজন অফিসার আমার হাটে বসে তিন তাস খেলেছেন। যেহেতু টাকা দিয়ে খেলেছেন, সেটাকে জুয়াই বলতে হবে। হ্যাঁ, ওঁদের সঙ্গে আমিও মাঝে মধ্যে বসেছি। তবে এই ব্যাপারটা একান্তই আমাদের ব্যক্তিগত, তাই কাউকে কোন ব্যাখ্যা দিতে রাজি নই।

'প্রসঙ্গ হলো, ওখানে কালমুনাইয়ের উপস্থিতি। প্রথমে তাকে আমরা ডেকে পাঠাই ওই খেলাটা শেখার জন্যে।' মুখের কাছে হাত তুলে খুক করে একবার কাশলেন কর্নেল। 'আমরা কেউ জানতাম না তিন তাস কীভাবে খেলতে হয়।'

'একটা খেলা শিখতে এক কী দু'দিন লাগতে পারে,' বলল রানা। 'কিন্তু কালমুনাইকে রাতের পর রাত আপনার হাটে ঢুকতে দেখা গেছে।'

মুচকি একটু হাসলেন কর্নেল যাদব। 'সন্দেহ নেই, যাকে বলে বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট, তাই করা হয়েছে আপনাকে।'

'ব্যাখ্যাটা এখনও আমি পাইনি,' মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল রানা।

'কালমুনাই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের খেলার আসরে আসত। আসলে…দুটো। প্রথমে ভেবেছিল আমরা তাকে খেলতে নেব। তা যখন নিলাম না, সে আমাদেরকে ইঙ্গিত দিল আমরা তার কাছ থেকে সুদের বিনিময়ে টাকা ধার নিতে পারি।

'পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে প্রতিদিনই আসত সে, কিন্তু তার সুদের হার এত বেশি যে আমাদের কারও সাহস হোত না তার কাছ থেকে ধার করার। যখন বুঝতে পারল যে কোনভাবেই সুবিধে করতে পারবে না, নিজে থেকেই আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিল।' রানার দিকে একটু বাঁকা চোখে তাকালেন কর্নেল। 'সন্তুষ্ট, মিস্টার জয়?'

'হ্যাঁ, এই ব্যাপারটায়, আপাতত,' বলল রানা। 'এবার আপনাদের অ্যাডিকশান সম্পর্কে বলি।'

'জী, কাহিয়ে জনাব, বান্দা হাজির,' সকৌতুকে বললেন কর্নেল যাদব, মোটেও নার্ভাস নন।

'এ-কথা কি সত্যি যে ডাক্তার হাসান ফেনসিডিল খেতেন? আর ইঞ্জিনিয়ার হাশমি চরস খান?'

'সত্যি…মাঝে মধ্যে, নেহাতই কৌতূহলবশত।'

'আর আপনি হেরোইনে অভ্যস্ত?'

এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন নেতাজি ক্যাম্পের কমান্ডার। তারপর বললেন, 'বহুত খুব, মিস্টার জয়, বহুত খুব!'

'আপনি কি অভিযোগটা অস্বীকার করছেন, মিস্টার যাদব?' ভারী গলায় জানতে চাইল রানা।

'তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে কেউ যদি শখ করে দুই কি তিনবার হেরোইন নিয়েই থাকে, তাকে কি আপনি অভ্যস্ত বলবেন?'

'কী বলব সেটা পরে শুনবেন,' বলল রানা। 'আপনারা, মানে অফিসাররা, শখ করে বা যে কোন কারণেই ওসব খান, একথা কি অস্বীকার করতে পারবেন যে তাতে স্মাগলারদের উৎসাহিত করা হচ্ছে না?'

'স্মাগ…' বাকিটা উচ্চারণ করতে না পেরে রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন কর্নেল।

'কারা তারা, মিস্টার যাদব?' রানার কণ্ঠস্বর কঠিন আর কর্কশ।

হঠাৎ হাত দিয়ে কপালটা চেপে ধরলেন কর্নেল। 'মাথাটা আবার ধরেছে। চিন্তা করার জন্যে আমাকে একটু সময় দিন, প্লিজ, মিস্টার জয়।'

কথা না বলে চেয়ারে হেলান দিল রানা। অপেক্ষা করছে।

'আপনার মুখে স্মাগলার শব্দটা শোনার পর রীতিমত একটা ধাক্কা খেলাম,' খানিক পর বললেন ভারতীয় কর্নেল। 'কারণ ব্যাপারটা নিয়ে ঠিক এভাবে কখনও ভাবিনি আমি। তা না ভাবার যুক্তিও আছে।'

'যুক্তি আছে, শখ করে নেশা করার মধ্যে?' রানার গলায় শ্লেষ। 'হাসালেন দেখছি!'

'থিউলে প্রকাশ্যেই এ-সব বেচাকেনা হয়, লোকে বলাবলি করে

আইসক্যাপের মত ঠাণ্ডা একঘেয়েমিতে ড্রাগই একমাত্র ভরসা।'

'ক্যাম্পে আসে কীভাবে? কে বা কারা আনে?'

'থিউল থেকে যে-ই ক্যাম্পে আসুক, দেখা যাবে তার কাছে হয় গাঁজা নয়তো চরস কিংবা হেরোইন, কিছু একটা আছেই। তাদেরকে কখনোই স্মাগলার বলে মনে হয়নি আমার...'

'প্রশ্ন হলো, আপনার কী মনে হয়েছে সেটার গুরুত্ব বেশি, নাকি রিপোর্ট পাওয়ার পর দিল্লির কী মনে হবে সেটার?'

নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় নিলেন কর্নেল। 'কী করে রিপোর্ট পাঠাবেন? রেডিও কাজ করছে না। আবহাওয়ার যে অবস্থা...'

হাসল রানা। 'আপনাদের ওটা মান্ধাতার আমলের রেডিও, আমার কাছে ছোট্ট অথচ অত্যন্ত শক্তিশালী একটা রেডিও আছে। ফ্রিকোয়েন্সি এমনভাবে সেট করা, নির্দিষ্ট কয়েকটা সেটে অনায়াসে মেসেজ পাঠানো যাবে।'

গুম হয়ে তিন সেকেন্ড বসে থাকলেন ভীম সিং যাদব। তারপর মুখ তুলে রানার দিকে চোখ সরু করে তাকালেন। 'দিল্লিতে রিপোর্ট করে আপনি আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবেন না। সেটা আপনিও খুব ভালো করে জানেন। আসলে আমার কাছ থেকে কিছু পেতে চাইছেন আপনি। কী সেটা?'

রানা আশা করেনি কর্নেল এত তাড়াতাড়ি ফণা নামাবেন। 'মিস্টার যাদব, আপনি ভুল বুঝছেন। আপনার ক্ষতি করা আমার উদ্দেশ্য হতে যাবে কেন? আর আমি আপনার কাছ থেকে কিছু পেতেও চাইছি না। তবে...' এ পর্যন্ত বলে চুপ করে গেল রানা।

'তবে কী?'

'আমার ওই রিপোর্টে পুত্তানাম বর্ধন প্রসঙ্গটাও থাকবে,' বলল রানা। 'কার কথা বলছি বুঝতে পারছেন তো? আপনি যাকে বিশালা কালমুনাই বলে চেনেন। আশা করি নিশ্চয় আপনার মনে আছে যে পাঁচ সঙ্গী সহ তাকে অ্যারেস্ট করতে বলেছিলাম আমি?'

এই সময় নক হলো কমান্ড হাটের সামনের দরজায়।

কর্নেল যাদব হাঁক ছাড়লেন। 'কাম ইন।'

হাতে একটা কমপিউটার সিডি নিয়ে ভিতরে ঢুকল ডক্টর হারুন হাবিব। বেশ একটু উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। বোধহয় দৌড়ে আসায় সামান্য হাঁপাচ্ছেও।

'কী ব্যাপার, মিস্টার হারুন?' দ্রুত জানতে চাইলেন কর্নেল। 'এনিথিং রঙ?'

'না, কর্নেল, সব ঠিক আছে,' দম নিতে নিতে বলল হারুন।

'তা হলে কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার দিকে তাকাল ডক্টর হারুন। 'আমি আসলে আপনাকে খুঁজছিলাম, মিস্টার জয়। হাটে না পেয়ে অফিসার্স ক্লাবে গেলাম, শুনলাম হসপিটালে আছেন। ওখানে যেতে মেজর ফালকে জানালেন আপনি এখানে এসেছেন।'

'কী ব্যাপার বলুন তো?' কারণটা এখনও জানা নেই, অথচ উত্তেজনা বোধ করছে রানা।

'সারের গোপন ফর্মুলার খোঁজে কোথাও তো আর তল্লাশি চালাতে বাকি

রাখিনি আমরা, তাই না?' সার বলতে ডক্টর ওসমান ফারুকের কথা বোঝাচ্ছে ডক্টর হারুন।

'হ্যাঁ। তা কী হয়েছে?'

ঠোঁটের উপর ঘামের চকচকে ভাব আর ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার ধরন বলে দিচ্ছে উত্তেজনা চেপে রাখতে কষ্ট হচ্ছে ডক্টর হারুনের। 'কিন্তু আমার মন খালি খুঁত-খুঁত করছিল, মনে হচ্ছিল একটা জায়গায় আরও ভালো করে দেখা দরকার। সেটা হলো সারের পিসি।'

'ডক্টর ফারুকের পিসিটা আমি কিন্তু ভালো করেই দেখেছি,' বলল রানা।

'সে তো আমিও দেখেছি, মিস্টার জয়। দু'জনের কেউই কিছু পাইনি আমরা।' কাঁপা কাঁপা একটু হাসি দেখা গেল হারুনের ঠোঁটে। 'কিন্তু আজ কী হলো শুনুন। পিসিটা নিয়ে বসেছি, প্রায় আধ ঘণ্টা এটা-সেটা নাড়াচাড়া করার পর হঠাৎ দেখি একটা ফোল্ডার খুলছে না, বলছে পাসওয়ার্ড লাগবে।'

'তারপর?' রানার উত্তেজনা বাড়ছে।

'পাসওয়ার্ড জানতেন একা শুধু সার, কারণ নিশ্চয় তিনিই ওটা কমপিউটারকে দিয়েছেন, আমি কোথায় পাব! তবু আন্দাজে এটা টিপি ওটা টিপি। তারপর, বিশ্বাস করুন মিস্টার জয়, স্রেফ খেয়ালের বশে নিজের নামটা টাইপ করলাম...'

'আর অমনি ফোল্ডারটা খুলে গেল?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল।

রানাও রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল, 'ওটাই কি পাসওয়ার্ড?'

'আরে না! এতই যদি সহজ হত! তারপর কী হলো শুনুন। আমার নাম টাইপ করতে কমপিউটার জানাল—"এবার দ্বিতীয় পাসওয়ার্ড দাও"। কথাটার পাশে ফুটবলের মত গোল একটা মুখ হাসছে।'

'ঝড়ে না হয় একবার বক পড়েছে...' শুরু করলেন কর্নেল।

'আমিও ঠিক সে-কথাই ভাবছিলাম। লেখাটা, আমার নাম আর হাসিভরা মুখটার দিকে বোকার মত তাকিয়ে আছি। হাহা,' হঠাৎ হাসল হারুন। একবার রানা, একবার কর্নেলের দিকে তাকাচ্ছে, যেন বুঝতে চাইছে কী প্রতিক্রিয়া হয় ওদের।

রানার শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। 'হাহা...হাহা? স-ত্যি?'

অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে রানার দিকে একটু মাথা নোয়াল হারুন। 'জী, মিস্টার জয়, আপনি ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন—সত্যি।'

'কী সত্যি?' ওদের কথাবার্তা আর হাবভাব দুর্বোধ্য লাগায় আবার চেঁচিয়ে উঠলেন কর্নেল যাদব।

'দ্বিতীয় পাসওয়ার্ড,' বলল রানা। 'গোল মুখটার হাসি দেখে বুদ্ধি করে নিজের নামের আদ্যাক্ষর ব্যবহার করেছেন উনি, হারুনের হা আর হাবিবের হা—অর্থাৎ হাহা। ব্যস, তাতেই কাজ হয়েছে। নাকি?'

'জী!' হারুন হাবিবের মুখ আহ্লাদে আটখানা হওয়ার অবস্থা।

'গড অলমাইটি! বহুত খুব, বহুত খুব! ইয়ে তো স্রিফ মিরাকল হ্যায়!'

'জী, হ্যাঁ, মিরাকলই বলতে হবে।' মাথা ঝাঁকাল ডক্টর হারুন।

'তারপর?' প্রশ্ন করল রানা।
'ফোল্ডার ওপেন হতে দেখলাম হেডিংটা সার ইংরেজিতেই লিখেছেন...'
'কী সেটা?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল রানা।
'ভি-টোয়েনটিনাইন, ডিটেলস ফর্মুলা...'
চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'এটাই তো। এটা নিয়েই ডক্টর ফারুক রিসার্চ করছিলেন। শুধু হেডিংটা ইংরেজিতে? আর বাকিটা?'
'বাকিটা সাংকেতিক ভাষায় লেখা, মিস্টার জয়,' ম্লান হেসে বলল হারুন। 'একশো আশি পাতা, প্রতি পাতায় বাষট্টিটা করে লাইন। হাতা-মাথা কিচ্ছু বোঝা যায় না।'
'এক্সপার্টদের হাতে পড়লে পানি হয়ে যাবে সব,' বলল রানা। 'আপনার হাতে সিডি দেখছি, কপি করে এনেছেন বুঝি?'
হেসে ফেলল হারুন। 'জী। ভাবলাম, সাবধানের মার নেই, একটা কপি করে মিস্টার জয়কে দিয়ে আসি।'
'খুব ভাল করেছেন,' বলল রানা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, ডক্টর হারুন। ল্যাব কম্পিউটারেও নিশ্চয় আরও কয়েকটা কপি রেখেছেন?'
হাসছে ডক্টর হারুন। 'আরও চার জায়গায় কপি করে রেখেছি, মিস্টার জয়।'
'আমার তো ধৈর্যে কুলাচ্ছে না,' হঠাৎ অভিযোগের সুরে বললেন কর্নেল। 'আপনারা শুধু কথাই বলবেন, নাকি সিডিটা একবার কমপিউটারে ঢুকিয়ে দেখাবেন ভেতরে ছাই-পাঁশ কী আছে?'
'হ্যাঁ, ঠিক কথা,' বলল হারুন, ঘাড় ফিরিয়ে কর্নেলের পিসিটার দিকে তাকাল। 'এখানেই আপনি দেখে নিতে পারেন, মিস্টার জয়।'
'ঠিক আছে, দেখছি। তার আগে আমাদের আলাপটা শেষ করা উচিত নয়, মিস্টার যাদব?' জিজ্ঞেস করল রানা।
'ও, হ্যাঁ, আসুন, ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলি। আপনি কি এখনও মনে করেন, সত্যি ওদেরকে অ্যারেস্ট করাটা খুব জরুরি?'
কথাটা শুনে হকচকিয়ে গেল হারুন। তবে সম্ভবত অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে ভেবে চুপ করে থাকল।
'এটা আপনি কী ধরনের প্রশ্ন করছেন?' কোন রকমে রাগ চেপে রাখছে রানা। 'লোকগুলো ক্রিমিনাল জানার পরও তাদেরকে আপনি আটক করবেন না?'
'তাদের সার্ভিস না পেলে কি ধরনের সমস্যা হবে জানেন তো?'
'ওটা আসলে কোন সমস্যাই নয়,' বলল রানা। 'সিংহলীদের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, তারা আমাকে বলেছে ঠেকার কাজ চালিয়ে নিতে কোন অসুবিধে হবে না।'
'তা না হয় হলো, কিন্তু অন্যদিকে আরও সমস্যা আছে,' বললেন কর্নেল। 'আমাদের যে সেল তাতে অত লোককে জায়গা দেয়া মুশকিল। তা ছাড়া ওদেরকে সেখানে একসঙ্গে রাখাটাও বোধহয় ঠিক হবে না।'
'এত বড় ক্যাম্প, নিরাপদ একটা জায়গা খুঁজে বের করুন,' বলল রানা. কর্নেলের আচরণে খুশি হতে পারছে না।

'জানি না নাক গলানো হয়ে যাচ্ছে কিনা,' মাঝখান থেকে হঠাৎ বলল ডক্টর হারুন। 'তবে ক্রিমিনাল, অ্যারেস্ট, সেল ইত্যাদি শুনে কৌতূহল বোধ করছি। আপনাদের বোধহয় নিরাপদ আর দুর্ভেদ্য কোন জায়গা দরকার?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'সেরকম জায়গা আপনি চেনেন নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল হারুন। 'গোটা ক্যাম্পে আমাদের ল্যাব টানেলটাই সবচেয়ে নিরাপদ, স্টিল ডোর আর লকিং সিস্টেম শুধু ওই একটা টানেলে পাবেন। কিন্তু...'

কর্নেল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'বাহ্, এই তো ভালো একটা জায়গা পাওয়া গেছে...'

'কিন্তু আমার কথা তো শেষ হয়নি,' প্রতিবাদের সুরে বলল ডক্টর হারুন। 'ওখানে কোথায় আপনি বন্দিদের আটকে রাখবেন? ছয়টা কামরা নিয়ে ল্যাব ছাড়া আর তো কিছু নেই ওখানে।'

'ওগুলোরই একটায় ওদেরকে আটকে রাখা যায়,' কর্নেল বললেন, 'বাইরে থেকে তালা দিয়ে।'

'কিন্তু ল্যাবে মারাত্মক সব জীবাণু রয়েছে না!' ডক্টর হারুন প্রতিবাদের সুরে বলল।

'সে তো মাত্র দুটো কামরায়। বাকিগুলো খালি পড়ে আছে।'

'আইডিয়াটা কিন্তু মন্দ নয়,' বলল রানা। 'ঘরের দরজা কোন রকমে যদি খুলতেও পারে, স্টিলের ওই দরজা ভেঙে কারও পক্ষে পালানো সম্ভব নয়।'

হঠাৎ হেসে উঠলেন কর্নেল। তারপর বললেন, 'আপনার বুঝি ধারণা দরজা ভাঙতে পারলেই পালানো সম্ভব? ভুল, মিস্টার জয়। বাইরে ওটা আইসক্যাপ, সার, আপনাকে ধরার জন্যে ওত পেতে আছে। কেউ কোনদিন পালাতে পারেনি, কেউ কোনদিন পারবেও না...'

'কর্নেল,' বাধা দিয়ে বলল হারুন, 'মিস্টার জয় সম্ভবত বলতে চেয়েছেন, ওই টানেল থেকে কেউ বেরিয়ে আসতে পারবে না।'

এবার সবজান্তার মত মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। 'হ্যাঁ, তা ঠিক। তা হলে তাই হোক, মিস্টার জয়। এখনই আমি সার্জেন্ট মোলায়েম সিংকে ডেকে কালু আর তার পাঁচ শিষ্যকে অ্যারেস্ট করার নির্দেশ দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার যাদব,' বলল রানা। 'এবার আমরা আপনার কমপিউটারে সিডিটা চালিয়ে দেখব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিলেন কর্নেল। 'কৌন? সার্জেন্ট মোলায়েম সিং? এক ডাজান সিপাই লে কার মোটার শেড পে চালে যাও, জালদি! কালু আওর...'

কমান্ড হাটের কমপিউটার খুলে ভিতরে ঢুকানো হলো সিডিটা, রানা আর ক্যাম্প কমান্ডার দু'জনেই লক্ষ করলেন উত্তেজনা আর প্রত্যাশার কারণে ডক্টর হারুনের আচরণে একটা ব্যস্ততা ফুটে উঠেছে। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল সে। তারপর একটা ঢোক গিলে বলল, 'আপনি যদি কোড ভাঙতে পারেন তা হলে এখনই লেখাটার অর্থ বের করা যাবে...'

রানার ঠোঁটেও টান টান হাসি। 'না, তা বোধহয় সম্ভব হবে না। ডক্টর ফারুক নিশ্চয়ই অত্যন্ত কঠিন কোন কোড ব্যবহার করেছেন। আমি তো লেম্যান, ভাঙতে হলে অবশ্যই একজন এক্সপার্টের সাহায্য লাগবে।'

অবশেষে সিডির লেখাটা কমপিউটার মনিটরের পরদায় ফুটে উঠল।

লেখা নয়, বলা উচিত সাঙ্কেতিক চিহ্নের মিছিল, একশো আশি পাতা জুড়ে। দু'সেকেন্ড চোখ বুলিয়েই চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা। মাথা নেড়ে বলল, 'এ-ধরনের কোড আগে কখনও দেখিনি আমি। এক্সপার্ট ছাড়া এতে কেউ দাঁত বসাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'তা হলে প্রথম সুযোগেই সিডিটা দেশে পাঠিয়ে দিতে হয়,' বলল হারুন। 'কিন্তু ভাবছি কীভাবে পাঠানো যায়। ইন্টারনেট লাইন থাকলে খুব সুবিধে হত…'

'না, ইন্টারনেট না থাকলেও অসুবিধে নেই,' বলল রানা। 'ক্যাম্পে নিশ্চয়ই টেলেক্স মেশিন আছে। আবার আপনাকে ধন্যবাদ, ডক্টর হারুন। আপনি যদি ওভাবে চেষ্টা না করতেন, ডক্টর ফারুকের এই ফর্মুলা বোধহয় কখনোই আমাদের হাতে আসত না। আই কংগ্রাচুলেট ইউ।'

তরুণ বিজ্ঞানী, ব্যাকটেরিয়লজিস্ট ডক্টর হারুন হাবিবের মুখ লালচে হয়ে উঠল। 'আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন, মিস্টার জয়। তবে সত্যি যদি এতে দেশের কোন উপকার হয়ে থাকে, সেটা নিশ্চয়ই আমার প্রতি আল্লাহর অসীম রহমত।'

'সিডিটা তা হলে আমার কাছে থাক?' কমপিউটার থেকে ওটা বের করল রানা।

'হ্যাঁ, অবশ্যই। ওটা তো আপনাকে দেব বলেই এনেছি।'

রানা বিদায় নেওয়ার জন্য ক্যাম্প কমান্ডারের দিকে ফিরল।

ইন্টারকমের রিসিভার নামিয়ে রেখে কর্নেল বললেন, 'সার্জেন্ট মোলায়েম সিং একটু কৌশলে, একজন একজন করে অ্যারেস্ট করছে ওদেরকে। তাতে সময় একটু বেশি লাগবে ঠিকই, তবে অনেক দিক থেকে সেটাই নিরাপদ।'

'বেশ,' বলল রানা। 'মিস্টার যাদব, আমার একটা উপকার করতে হয় যে।'

'আপকে লিয়ে বান্দা হাজির।'

'টেলেক্স মেশিন কোন রুমে দেখিয়ে দেবেন, প্লিজ?'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন কর্নেল। 'না, দেখিয়ে দেব না। কারণ, তাতে আপনার কোন উপকার করা হবে না। বিলিভ ইট অর নট, সবগুলো টেলেক্স মেশিনই নষ্ট হয়ে পড়ে আছে।'

'নষ্ট হয়ে পড়ে আছে?' রানার চোখ-মুখ থমথমে হয়ে উঠল। 'কবে থেকে?'

'ঠিক কবে থেকে বলা মুশকিল। এই খানিক আগে থিউলে একটা রিপোর্ট পাঠাব বলে অন করতে গিয়ে দেখি দুটো মেশিনের একটাও কাজ করছে না। কে বলবে, এক হপ্তা আগেও নষ্ট হয়ে থাকতে পারে।'

'আপনার ধারণা নষ্ট হয়েছে, স্যাবটাজ নয়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকলেন কর্নেল।

'সার্জেন্ট মোলায়েম সিং কতটুকু কী করতে পারল, দয়া করে জানাবেন

আমাকে,' বলে তাঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল রানা।

কমান্ড হাট থেকে নিজের ক্যাবিন হয়ে জাভেদ হাশমি কেমন আছেন দেখবার জন্য সোজা হসপিটালে চলে এল রানা। ওকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেজর ফালকে।

'বসে থাকতে থাকতে হাত-পায়ে একেবারে মরচে ধরে গেল,' বলল সে। 'প্লিজ, মিস্টার জয়, আপনি যদি একটু বসতেন, আমি খানিক হেঁটে আসতে পারতাম। দেরি হচ্ছে মনে করলে কমান্ড হাটে যোগাযোগ করলেই পাবেন আমাকে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। জানতে চাইল, 'রফিক কোথায়?'

'সেই যে তখন গেল, তারপর তো আর ফেরেনি সে।' হসপিটাল ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে গেল মেজর ফালকে।

বেডের পাশে চেয়ারটায় বসেছে রানা পাঁচ মিনিটও হয়নি, বিড়বিড় করে কী যেন বললেন হাশমি। ঝট করে তাঁর দিকে তাকাল রানা, এক পলকেই সতর্ক আর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ও।

ভদ্রলোকের চোখ বন্ধ, ভুরু জোড়া সামান্য কুঁচকে আছে, তবে তাঁর বেঢপ আকৃতির শরীরটা ভারী ক্যানভাসের নীচে স্থিরভাবে পড়ে আছে।

মাথা ঘুরিয়ে একবার ইন্টারকমের দিকে তাকাল রানা। যদি দেখে হাশমি স্বপ্নের মধ্যে কথা বলছেন না, ঘুমটা ভেঙে যাচ্ছে, তা হলে নার্স বা অন্য কারও সাহায্য লাগবে ওর।

আবার ফিসফিস করলেন হাশমি। এবার পরিষ্কার শোনা গেল, 'আল্লাহ!'

'এখন আপনি আছেন কেমন?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা।

শব্দটা আবার উচ্চারণ করলেন হাশমি; এখনও আচ্ছন্নতার গভীরে তলিয়ে আছেন, তবে ধীরে ধীরে হলেও চেতনা ফিরে পাচ্ছেন। 'কেমন?' বললেন তিনি। 'কেমন?'

অপেক্ষা করছে রানা। সম্ভবত এক মিনিট পার হয়েছে। হাশমি আবার বললেন, 'কী সর্বনাশ! ওগুলো...'

এখনও পুরোপুরি শান্ত ভদ্রলোক, কারণটা বোধহয় নামেমাত্র হুঁশ ফিরে এসেছে।

একটা সিগারেট ধরাল রানা, ইচ্ছে করেই টুকটাক আওয়াজ তুলে নীরবতা ভাঙছে।

সিগারেটটা শেষ হওয়ার আগেই আবার কথা বললেন হাশমি; ইতিমধ্যে তাঁর হাত আর পা ও এক-আধটু নড়তে শুরু করেছে।

তারপর হঠাৎ করেই খুব বড় করে তাকালেন হাশমি, আলো সহ্য করতে না পেরে চোখ মিটমিট করলেন, মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন রানাকে। বললেন, 'আমি নড়তে পারছি না।'

'চিন্তা করবেন না। আপনি ভালো আছেন।'

আরও কয়েকবার চোখ মিটমিট করলেন তিনি, চেষ্টা করছেন পুরোপুরি

সচেতন হতে। এক সময় জানতে চাইলেন, 'আমি কি অ্যাক্সিডেন্ট করেছি?'

'হুঁ, এক অর্থে।' রানা খুব সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করছে ভদ্রলোক হিংস্র হয়ে ওঠেন কিনা।

'রেডিয়েশন নাকি?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন হাশমি। 'সত্যি কথা বলুন, আমাকে রেডিয়েশনের ঝাপটা লেগেছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না।'

'তা হলে? কী হয়েছে আমার?'

রানা ভাবল, ভদ্রলোকের মাথাটা অন্তত ঠিকমত কাজ করছে। জানেন অজ্ঞান ছিলেন, সেটার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে ভাবছেন। মৃদু হাসির সঙ্গে বলল ও, 'বলা যায় এক ধরনের কলাপস্ করেছিলেন। শরীরের ওপর দিয়ে খুব ধকল যাচ্ছিল তো।'

হঠাৎ উদ্বিগ্ন দেখাল হাশমিকে। 'হার্ট? আমার কি…অ্যাটাক করেছিল?'

'না।'

হাশমির পেশিতে ঢিল পড়ল। 'আল্লাহ্ মেহেরবান। এক-আধবার আমাকে বলা হয়েছে বটে যে ওজন কমান…কিন্তু, আমি নড়তে পারছি না কেন?' ভুরু জোড়া আবার কুঁচকে উঠল, ভয়ের ছায়া পড়ল চোখে-মুখে, রানার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন।

নিজেকে তিরস্কার করল রানা, অযথা দেরি করা উচিত হয়নি। চেয়ার ছেড়ে ইন্টারকমের রিসিভার তুলে যোগাযোগ করল কমান্ড হাটের সঙ্গে, কর্নেল যাদবকে না পেয়ে ডিউটি সার্জেন্টকে জানাল রিয়্যাক্টর ইঞ্জিনিয়ারের ঘুম ভেঙেছে।

একটু পরই রফিককে নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেল মেজর ফালকে। কর্নেল যাদব ঠিক কোথায় আছেন তারাও বলতে পারল না।

পিছু হটে ওদেরকে জায়গা ছেড়ে দিল রানা। হাশমিকে দ্রুত একটা সেডাটিভ ইঞ্জেকশন দেয়া হলো। হাশমিও সব দেখলেন—স্ট্রেইটজ্যাকেটের ফ্ল্যাপ গুটিয়ে পিছিয়ে নেওয়া হলো, তারপর হাইপডারমিক সিরিঞ্জের সুইটা বিঁধানো হলো হাতে।

'ইয়ে কিয়া…কিঁউ…ওহ্ গড!' বিস্ময়ের ধাক্কায় বেশিক্ষণ ভুগলেন না, তার আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন আবার।

রানার দিকে তাকাল মেজর ফালকে। 'বেশ সুস্থই তো মনে হলো।'

'হুঁ,' বলল রানা।

'স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন?'

'কী করে বুঝব কোনটা স্বাভাবিক অবস্থা?'

'তা বটে।'

আবার কমান্ড হাটে ফোন করে কর্নেলকে পাওয়া যায় কিনা দেখছে রানা। বিশালা কালমুনাই আর তার অনুচরদের অ্যারেস্ট করা হলো কিনা জানা দরকার।

এবারও তাঁকে পাওয়া গেল না, তবে কমান্ড হাটের নতুন ডিউটি অফিসার ওর পরিচয় জানবার পর একটা তথ্য দিল—কর্নেলকে এই মুহূর্তে মোটর শেডে পাওয়া যাবে।

মোটর শেডের নম্বরে ডায়াল করল রানা। অপরপ্রান্তে যে রিসিভার তুলল তার গলার স্বর চেনা চেনা লাগল কানে। 'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আমি রত্নে উপলচন্দ্র,' কেমন যেন ধরা গলায় বলল সে। 'আপনি?'

'আমি ইন্সপেক্টর জয়,' বলল রানা। 'ওখানে কর্নেল থাকলে দিন তাঁকে...'

ওর নামটা শুনেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল উপল।

'কী হয়েছে, উপল, আপনি কাঁদছেন কেন?' রানা শঙ্কিত, না জানি আবার কী দুঃসংবাদ শুনতে হয়।

'এখানে মারাত্মক...আপনি কর্নেল যাদবের সঙ্গে কথা বলুন, প্লিজ,' কোন রকমে বলল উপল। দেরি হচ্ছে দেখে বোঝা যাচ্ছে টেলিফোনের রিসিভার হাতবদল হচ্ছে।

তারপরই কর্নেলের অস্বাভাবিক ভারী কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা। 'মিস্টার জয়? আমি কর্নেল যাদব। কয়েকজন সিপাই রওনা হয়ে গেছে, মেডিককে বলবেন চারটে স্ট্রেচার লাগবে ওদের। আর...'

'চারটে স্ট্রেচার? কেন, কী হয়েছে?'

'ম্যাসাকার, মিস্টার জয়! ট্র্যাক্টর ট্রেঞ্চে রক্তগঙ্গা বইছে!'

'মানে?'

কর্নেল যাদব যেন প্রলাপ বকছেন। 'আমরা সার্জেন্ট মোলায়েম সিংকে হারিয়েছি, মিস্টার জয়। হি ইজ ডেড... মার্ডারড্!'

দুই

'ওহ্, নো!' আঁতকে উঠল রানা। 'কীভাবে?'

সঙ্গে সঙ্গে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কর্নেল বললেন, 'ওরা যে অ্যারেস্ট করতে যেতে পারে, এই সন্দেহটা যেভাবেই হোক কালমুনাইয়ের মনে আগেই জেগেছিল। মোটর শেডে একটা ট্র্যাক্টর নিয়ে তৈরি হয়ে ছিল সে, যদি দেখে ব্যাপারটা সত্যি ঘটতে যাচ্ছে তা হলে ক্যাম্প ছেড়ে পালাবে। পালানো যে সম্ভব নয়, এই সহজ কথাটা তার মত অভিজ্ঞ লোকের মগজেও খেলল না।'

ধীরে ধীরে মর্মান্তিক ঘটনাটা বর্ণনা করলেন কর্নেল যাদব। কালমুনাইকে অ্যারেস্ট করার জন্য সার্জেন্ট মোলায়েম সিং-এর নেতৃত্বে পাঁচজন সিপাই রওনা হয়েছিল। সিপাইদের বাকি সাতজনকে পাঠানো হয় শ্রীলঙ্কান ড্রাইভার আর মেকানিকদের লিভিং কোয়ার্টারে, কালমুনাইয়ের অনুচরদের অ্যারেস্ট করার জন্য।

বলাই বাহুল্য যে তাদের কারও কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না, সবার হাতে শুধু একটা করে ছোট লাঠি বা ব্যাটন।

সার্জেন্ট মোলায়েম আর সিপাইদের দেখামাত্র ট্র্যাক্টর নিয়ে ছুটে আসে কালমুনাই। সিপাই পাঁচজন কোন রকমে লাফ দিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

সার্জেন্ট মোলায়েমও লাফ দেয়, কিন্তু সরাসরি পিছু নিয়ে তার নাগাল পেয়ে যায় কালমুনাই, তারপর সোজা তার উপর দিয়ে বুলডোজার চালিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আক্ষরিক অর্থেই চিঁড়ের মত চ্যাপ্টা হয়ে গেছে সার্জেন্ট, খুলি ফেটে সবটুকু মগজ বেরিয়ে এসেছে।

সার্জেন্টের এই অবস্থা দেখে ট্র্যাক্টর শেডের অন্যান্য ড্রাইভার আর মেকানিকরা সিপাইদের সাহায্যে এগিয়ে এল। প্রাণের উপর ঝুঁকি নিয়ে পিছন আর দু'পাশ থেকে বুলডোজারের উপরে উঠে পড়ল তারা।

কালমুনাই একা, পাঁচ সিপাই আর বাকি সবাই মিলে আঠারজন, কিন্তু তারপরও তাকে কাবু করতে হিমশিম খেতে হয়েছে। অবিশ্বাস্যই বলতে হবে যে ঝাড়া পঁয়ত্রিশ মিনিটের এই অসম যুদ্ধে কালমুনাই মারা যায়নি, কিন্তু তার প্রতিপক্ষরা প্রায় সবাই কমবেশি আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর।

অবস্থা বেগতিক দেখে বুলডোজার থেকে নেমে দৌড় দিল কালমুনাই, বাকি সবাই ধাওয়া করে একটা ট্রেঞ্চে কোণঠাসা করে ফেলল তাকে।

এই সময় ক্যাম্পের চারদিক থেকে ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, টেকনিশিয়ান আর প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ঢুকে পড়েন ওই ট্রেঞ্চে। তারপরও ধরা দেয়নি কালমুনাই, এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে একটা লোহার রড নিয়ে একাই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

এক সময় রডটা তার হাত থেকে কেড়ে নেয়া হয়। এক ঝাঁক মৌমাছির মত ছেঁকে ধরল তাকে সবাই। গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে কম চেষ্টা করেনি দৈত্যটা, তবে ইতিমধ্যে সিপাইদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়ায় সুবিধে করতে পারল না। গণপিটুনি খেয়ে এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

ভুক্তভোগী, জুলুমের শিকার শ্রীলঙ্কানরা প্রায় সবাই ওখানেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল বিশালা কালমুনাই ওরফে পুত্তানাম বর্ধনকে। কিন্তু সিপাইরা কাউকে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে দেয়নি। তারা কমান্ড হাটে ফোন করে ব্যাপারটা কর্নেল যাদবকে রিপোর্ট করে।

বর্ধন সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, এটা সত্যি হলেও কর্নেল তার গায়ে হাত দিতে নিষেধ করলেন সবাইকে। এই সময় ডক্টর হারুন হাবিব তাঁকে মনে করিয়ে দেন, মিস্টার জয় তাকে জেরা করতে চাইবেন।

অকুস্থলে পৌঁছে সিপাইদের নির্দেশ দিলেন কর্নেল, কালমুনাইকে আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্যাসিলিটির একেবারে শেষ মাথায় নিয়ে চলো, তাকে রেড জোনের একটা কামরায় ভরে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হবে।

রেড জোন মানে ডক্টর ওসমান ফারুকের ল্যাবরেটরি। সিপাইরা কর্নেলের নির্দেশ মত কালমুনাইকে সেখানে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বাঁধবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এই সময় মিনিট কয়েকের জন্য তার জ্ঞান ফিরে আসে। উপস্থিত সবার মধ্যে আবার একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল, তবে ভাগ্যক্রমে খারাপ কিছু ঘটেনি। একটু পর আবার জ্ঞান হারাতে হাত-পা বাঁধবার কাজটা শেষ করা হয়।

কর্নেল শেষ খবর পেয়েছেন পাঁচ মিনিট আগে, তখনও কালমুনাইয়ের জ্ঞান ফেরেনি।

সব শুনে প্রথমেই জানতে চাইল রানা, 'গণপিটুনি খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে, কালমুনাই বাঁচবে তো?' ফোনের রিসিভারটা হাতবদল করে আরেক কানে চেপে ধরল।

'ওদের কৈ মাছের জান, মশাই,' জবাবে বললেন কর্নেল। 'এত সহজে মরে না।'

'তার চিকিৎসার দরকার নেই?' জানতে চাইল রানা। 'কোন ব্যবস্থা নেননি?' ক্যাবিনের খোলা দরজা দিয়ে খানিক আগে কয়েকজন সিপাইকে হসপিটাল ওয়ার্ডে ঢুকতে দেখেছিল ও, এই মুহূর্তে তাদেরকে চারটে স্ট্রেচার নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখছে।

'কে চিকিৎসা করবে, ডাক্তার কোথায়? একজন মাত্র মেডিক, তাকে কত দিক দেখতে বলা যায়, বলুন? তা ছাড়া, জ্ঞান ফিরে এলে কালুকে সামলাতে পাঁচ-সাতজন সিপাই লাগবে, এটা জানার পর কীভাবে আমি তাকে হসপিটালে পাঠাই?'

'হ্যাঁ, সবই বুঝলাম,' বলল রানা, 'কিন্তু লোকটা বিনা চিকিৎসায় মারা যাক এটাও নিশ্চয় কেউ চাই না আমরা। তার জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন আমাকে, কেমন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'তার সহকারী পাঁচজন সম্পর্কে বলুন।'

'সবগুলোকেই ধরা হয়েছে,' জানালেন ক্যাম্প কমান্ডার। 'এক-আধটু বাধা দিলেও, কেউই কালুর মত ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠেনি।'

'প্রথমে আমি ওদেরকে জেরা করতে চাই, মিস্টার যাদব। কোথায় যেন রাখা হয়েছে ওদেরকে?'

'প্রিজন সেলে, সবাইকে একসঙ্গে।'

'গুড,' বলল রানা। 'আপনার সিপাইদের এখনই জানিয়ে রাখুন, যে-কোন সময় ওখানে যেতে পারি আমি।'

'বহুত খুব।'

সারপ্রাইজ ভিজিটে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ভালো কাজ হয়, কালমুনাইয়ের পাঁচ সহকারীকে জেরা করার জন্য সেই সুযোগটাই নিতে চাইছে রানা। কর্নেলের সঙ্গে কথা বলে আর দেরি করল না, হসপিটাল থেকে বেরিয়ে সোজা প্রিজন সেলে চলে এল।

একজন সার্জেন্টের সঙ্গে তিনজন সিপাই রয়েছে অফিস রুমে। রানা কেন এসেছে শুনে ইতস্তত করতে দেখা গেল তাদেরকে, কারণ এখনও তারা কর্নেলের কাছ থেকে কোন নির্দেশ পায়নি।

'তাঁর সঙ্গে ইন্টারকমে যোগাযোগ করুন,' বলে খোলা দ্বিতীয় দরজা দিয়ে একটা সিঁড়ির মাথায় চলে এল রানা। 'সিপাইদের একজন আমার সঙ্গে এসো।' ধাপ বেয়ে তরতর করে নীচে নেমে এল।

আয়োজনটা করা হলো খালি একটা কামরায় দেয়াল ঘেঁষে ফেলা নিঃসঙ্গ

চেয়ারটায় বসে আছে রানা। পাশের সেল থেকে একজন বন্দিকে বের করে এনে ওর সামনে দাঁড় করাল সিপাই।

বন্দির হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। লোকটা কালো আর মোটা, কালমুনাইয়ের সঙ্গে তার চেহারার খানিকটা মিল খুঁজে পেল রানা। 'নাম কী? পুত্তানাম বর্ধন কে হয় তোমার?' জানতে চাইল ও।

'আমি উৎপল বর্ধন, সে আমার চাচাতো ভাই,' তামিল ভাষায় জবাব দিল বন্দি।

শুরুতেই উৎপলকে বুঝিয়ে দেয়া হলো, নেতাজি ক্যাম্পে বা শ্রীলঙ্কায় ফিফটি পারসেন্ট নামে যে ক্রাইম সিন্ডিকেটটা ছিল সেটার এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। আরেকটা কথা হলো, অপরাধ স্বীকার করে কেউ যদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে তাহলে শ্রীলঙ্কা সরকারের কাছে সুপারিশ করা হবে তাকে যেন রাজসাক্ষি করা হয়।

জেরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা প্রসঙ্গের উপরই জোর দিল রানা। প্রসঙ্গ একটা হলেও, প্রশ্ন অসংখ্য।

হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করাবার জন্য কে দায়ী?

রত্নে গোপালচন্দ্র কি সত্যি পথ হারিয়ে নিখোঁজ হয়েছে, নাকি খুন করে তুষারে পুঁতে রাখা হয়েছে তার লাশ?

ক্যারাবু প্লেন ল্যান্ড করার সময় রানওয়ের আলো কে নিভিয়েছিল?

টানেল এন্ট্রান্সের মুখে ভালুকের পায়ের ছাপ কাকে দিয়ে তৈরি করানো হয়?

ফুয়েল ট্যাংক কীভাবে ছেঁড়া হলো?

ডাক্তার আরিফ হাসানকে খুন করল কে?

রিয়্যাক্টরের কেটলিতে কয়েন ফেলবার জন্য কাকে দায়িত্ব দেয়া হয়?

পানির পাইপ দূষিত হলো কীভাবে?

পোলক্যাটের ফুয়েল গজে কারিগরি ফলাবার জন্য কে দায়ী?

ক্যাবিনে যে ধোঁয়া তৈরি করা হয় তার পিছনে রহস্যটা কী?

ইঞ্জিনিয়ার হাশমির আসলে কী হয়েছে?

ডক্টর ওসমান ফারুক যে জিনিস আবিষ্কার করেছেন সেটার নমুনা আর ফর্মুলা কোথায়?

সর্বশেষ প্রশ্ন, বিশালা কালমুনাই ওরফে পুত্তানাম বর্ধন কোন দেশ বা সংস্থার হয়ে কাজ করছে? তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগের মাধ্যম কি?

একটানা দু'ঘণ্টা বিশ মিনিট পণ্ডশ্রমই হলো বলা যায়। রানার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে কালমুনাইয়ের পাঁচ সহকারীই শুধু মাথা নাড়ল আর বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। যদি অভিনয় হয়ে থাকে, খুব উঁচুদরের বলে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আর যদি নির্ভেজাল অজ্ঞতা হয়ে থাকে, ধরে নিতে হবে কালমুনাই অসম্ভব সতর্ক, ঘনিষ্ঠ অনুচরদেরও কিছু টের পেতে দেয়নি।

হসপিটালে ফিরে এল রানা, বুঝতে পারছে তথ্য পেতে হলে পালের গোদাটার জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ওকে।

হসপিটালে খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে রফিক। তাকে সাহায্য করছে কয়েকজন

সিপাই। আহত লোকগুলোর ক্ষত পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়েছে, পেইনকিলার ইঞ্জেকশন দেওয়ায় এখন তারা তিনজনই ঘুমাচ্ছে।

কমান্ড হাটে ফোন করল রানা। না, এখনও কালমুনাইয়ের জ্ঞান ফেরেনি।

মেজর ফালকেকে ছুটি দিয়ে হাশমির বেডের পাশে বসল রানা।

দু'ঘণ্টা পর কিছুক্ষণের জন্য ফিরে এল ফালকে। কী একটা জরুরি প্রশাসনিক কাজ ফেলে এসেছে সে, তাই তার হয়ে অল্প কিছু সময়ের জন্য পাহারায় থাকল ডক্টর হারুন আর চাঙমা ভিকু।

রাত প্রায় এগারোটার দিকে রানার একটা মেসেজ পেয়ে অবশেষে ইঞ্জিনিয়ার হাশমিকে দেখতে এলেন ক্যাম্প কমান্ডার ভীম সিং যাদব। ফোনে তাঁকে জানান হয়েছে, হাশমির জ্ঞান ফিরে আসছে।

ক্যাবিনে ঢুকে বেডের পাশে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন কর্নেল, করুণ দৃষ্টিতে হাশমিকে দেখছেন। ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত লাগছে তাঁকে, হঠাৎ করেই যেন বয়েস অনেক বেড়ে গেছে।

হাশমি নড়াচড়া করছেন ঘোরের মধ্যে, ক্যানভাস জ্যাকেট আর পায়ে জড়ানো স্ট্র্যাপ যতটুকু তাঁকে সুযোগ দিচ্ছে আর কী।

'এরকম করছেন কতক্ষণ হলো? এর আগেই বা কেমন ছিলেন?' রানাকে জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল।

'জ্ঞান ফিরেছে বেশিক্ষণ হয়নি, তবে এখনও তলিয়ে আছেন,' বলল রানা। 'এর আগে আমি যতটুকু দেখেছি, বেশ স্বাভাবিকই তো লাগছিল।'

পারকা আর ক্যাপ খুলে একটা চেয়ারে বসলেন কর্নেল। 'বেশ স্বাভাবিক যথেষ্ট নয়, ওতে কাজ হবে না। কী ব্যাপার বলছি। রিয়্যাক্টরটার ডিজাইন করা হয়েছে এখানকার পরিবেশের উপযোগী করে। তবে এখনও ওটা এক্সপেরিমেন্টাল। পাকিস্তান আণবিক কমিশন আমাদেরকে ব্যবহার করতে দিয়েছে বিশেষ কয়েকটা শর্তে।'

দুটো মগে কফি ঢেলে ওদেরকে পরিবেশন করল হারুন।

'তার মধ্যে একটা শর্ত হলো,' আবার শুরু করলেন কর্নেল, 'রিয়্যাক্টরের যে-কোন বড় ধরনের কাজ একজন এক্সপার্টের তত্ত্বাবধানে করতে হবে। এর অর্থ হলো আমরা যদি ওটা বন্ধ করতে চাই, কিংবা রিফুয়েলিং-এর প্রয়োজন হয় বা হয়তো গো ক্রিটিক্যাল পর্যায় শুরু হতে যাচ্ছে, তখন গোটা ব্যাপারটা সুপারভাইজিং ইঞ্জিনিয়ারের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। চুক্তির শর্ত অনুসারে এ-সব কাজ আমরা নিজেরা করতে পারব না।'

'কিন্তু, বিশেষ পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই...'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে কর্নেল বললেন, 'চুক্তিতে বলা হয়েছে কোন পরিস্থিতিতেই এই শর্ত লঙ্ঘন করা যাবে না। প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা আছে, সুপারভাইজিং ইঞ্জিনিয়ার আহত হলে বা অসুস্থ হয়ে পড়লে রিয়্যাক্টরের কাজ বন্ধ রাখতে হবে, যতদিন না একজন ডাক্তার তাকে পুরোপুরি সুস্থ বলে সার্টিফিকেট দেন, কিংবা তার বদলে নতুন কোন লোক না আসে।'

রানা বলল, 'তারমানে, মিস্টার হাশমি সুস্থ হয়ে উঠলেও...'

'আমি বা নেতাজি ক্যাম্পের সবাই যদি বলে যে মিস্টার হাশমি সুস্থ, তাতেও কোন কাজ হবে না। তাঁকে পরীক্ষা করে একজন ডাক্তারকে লিখিত দিতে হবে যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। আর তা না হলে বঙ্গবন্ধু ক্যাম্প থেকে একজনকে প্লেনে করে আনাতে হবে।'

'আর আবহাওয়া?'

'যতটা খারাপ হতে পারে,' তিক্তকণ্ঠে বললেন কর্নেল। 'ফেজ থ্রি চলছে বাইরে, সেই সঙ্গে রেডিও ব্ল্যাকআউট।'

'পাওয়ার?' ক্যাম্পের পরিস্থিতিটা বুঝতে চাইছে রানা।

'এখনও আমরা আপনার নিয়ে আসা মেশিনের সাহায্যে চলছি,' বললেন কর্নেল। 'বলতে পারেন ছুরির ওপর দিয়ে হাঁটছি সবাই।' হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ দুটো রগড়ে ইঞ্জিনিয়ার হাশমির দিকে তাকালেন। 'কই, আর তো ওঁকে নড়াচড়া করতে দেখছি না।'

'ওষুধের ঘুম, ভাঙতে দেরি হচ্ছে,' বলল রানা। 'যে চুক্তিটার কথা বললেন, কর্নেল। আমার কাছে অদ্ভুত লাগল। একজন লোকের কারণে সব যদি অচল হয়ে পড়ে, সেখানে তাঁর মত যোগ্য আরও লোক রাখা উচিত ছিল না?'

'তৌফিক আজিজ আর তাঁর সহকারী যথেষ্ট যোগ্য, দু'জনেরই নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিঙে মাস্টার্স করা আছে। কিন্তু মিস্টার হাশমির ব্যাপারটা আলাদা। যে কোম্পানি এই রিয়্যাক্টরটা বানিয়েছে সেখানে তিনি চাকরি করতেন, এবং ওটার ডিজাইন তৈরিতে তাঁর অবদান আছে। এটাই হলো আসল কথা। তা ছাড়া, আগেই বলেছি, ওটা এখনও এক্সপেরিমেন্টাল।'

রানা বলল, 'কী আসে যায় চুক্তির শর্ত আপনি যদি না মানেন? অকুস্থলে দায়িত্ব প্রাপ্ত কমান্ডার হিসেবে? জানি কঠিন সিদ্ধান্ত, কিন্তু যদি গোটা ক্যাম্পের সবার স্বার্থে নেয়া হয়?'

কর্নেলের ঠোঁটে ম্লান হাসি। 'রিয়্যাক্টরের ব্যাপারে আমার কর্তৃত্ব শুধু এটুকু—আমি ওটা বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারি। তাও কোয়ালিফায়েড অ্যাডভাইস পেলে। এখন আমি যদি ওদেরকে বলি ক্রিটিক্যাল পর্যায়ে যাবার জন্যে রিয়্যাক্টর গরম করো, বলুন তো ওরা কী করবে?'

রানা অপেক্ষা করছে।

'প্রথমত আমার নির্দেশ মানবে না, কারণ শর্তগুলো ওরাও জানে। তারপর, লগবুকে আমাকে দিয়ে নির্দেশটা লিখিয়ে নেবে, নিজেদের প্রত্যাখ্যানের কথাটাও লিখতে ভুলবে না। ভেবে দেখুন ওদের লগ যখন ফেরত যাবে, প্রথম কোপটা কার ঘাড়ে পড়বে?'

হাশমির মধ্যে নড়াচড়ার কোন লক্ষণই নেই, তাই আর অপেক্ষা করতে রাজি হলেন না ক্যাম্প কমান্ডার, কারণ তাঁকে এখন আহত সিপাইদের দেখতে যেতে হবে।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি, দু'ঢোকে মগের কফিটুকু শেষ করলেন, তারপর ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

পিছন থেকে ডাকল রানা। 'মিস্টার যাদব, কালমুনাই কি এখনও অজ্ঞান?'

আবার ঘুরে রানার মুখোমুখি হলেন কর্নেল। 'দুঃখিত, মিস্টার জয়, খবরটা আপনাকে জানাতে একদম ভুলে গেছি। ঘণ্টাখানেক আগে হারামজাদাটার জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু তাকে জেরা করতে হলে অন্তত একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে।'

'কেন?'

'দুটো কারণে। মার খেয়ে তার দাঁত ভেঙেছে, চোখ আর ঠোঁট ফুলে গেছে, জিভও কেটে গেছে–মানে, সে কথা বলতে পারবে না।'

'আপনি ঠিক জানেন, কোন কথাই বলতে পারবে না?

'ঠিক জানি।'

'আর?'

'এই অবস্থায়ও কালু ভয়ানক মারমুখো হয়ে আছে। দু'জন সিপাই পাশের কামরায় ছিল, ইন্টারকমে নির্দেশ দিলাম তার জ্ঞান ফিরেছে কিনা দেখো। দশ মিনিট পর রিপোর্ট পেলাম দরজার তালা খুলতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দানবটা।'

'কীভাবে? আপনি না আমাকে বলেছিলেন কালমুনাইকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে?'

'তা তো হয়েইছিল,' বললেন কর্নেল। 'নিশ্চয় কোনভাবে খুলে ফেলেছে।'

'তারপর?' জানতে চাইল রানা, গম্ভীর আর অসন্তুষ্ট।

'কোন রকমে দরজাটা আবার বন্ধ করে জান বাঁচিয়েছে তারা,' বললেন কর্নেল। 'আমি বলেছি, মরুক শালা! চিকিৎসারও দরকার নেই, খাওয়ানোরও দরকার নেই। সিপাইদের ডেকে নিয়েছি আমি।'

'তারমানে এখন তাকে কেউ পাহারা দিচ্ছে না?' জিজ্ঞেস করল রানা, বিস্মিত।

'পাহারা দেয়ার কোন দরকারই তো নেই। তালা দেয়া ঘরের ভেতর আছে সে। ঘরটা যে টানেলে, সেটার স্টিলের দরজাতেও বাইরে থেকে তালা দেয়া।'

'চাবি?'

পারকার একটা পকেটে হাত চাপড়ালেন কর্নেল। 'দুটো দরজার সবগুলো চাবি এখন আমার কাছে। এমনকী ডক্টর হাবিবের রিঙ থেকেও ওই দুটো তালার চাবি খুলে নিয়েছি।'

'কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না,' বলল রানা। 'কি করা যায় কিছু ভেবেছেন?'

'সকালের আগে কিছু করার উপায় নেই, মিস্টার জয়।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'প্রথমে তাকে শক্ত করে বাঁধতে হবে, সেজন্যে অন্তত পাঁচ-সাতজন লোক দরকার। তারপর ফার্স্ট এইড দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, দেখতে হবে কিছু খাওয়ানো যায় কিনা। মেডিক নিশ্চয়ই ইঞ্জেকশন দিয়ে তাকে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাইবে।'

'আমি তা হলে তার সঙ্গে কখন কথা বলব?' বিরক্ত হয়ে জানতে চাইল

রানা।

'আপনি তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবেন···অন্তত কাল বিকেলের আগে নয়।'

'হুম।' রানা গম্ভীর।

'গুড নাইট, মিস্টার জয়।' ক্যাবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ক্যাম্প কমান্ডার।

মাঝরাতের দিকে তৌফিক আজিজ হসপিটালে এসে ক্যাবিনে উঁকি দিলেন, দেখলেন হাশমি তখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছেন।

পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা একজন টেকনিশিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে রোগীর পাশে থাকবার কথা তাঁর। রানা আর মেজর ফালকের এবার খানিক ঘুম দরকার।

নিজের হাটে ফিরে স্লিপিং গাউন পরে বিছানায় উঠল রানা। আলো নিভিয়ে শুতে যাবে, সিগারেটের প্যাকেটটা দেখে মনে পড়ে গেল প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আগে এই কামরায় ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে বসেছিল ও।

বিছানা থেকে নেমে পোড়া চেয়ারটা ভালো করে দেখল রানা। কাল রাতে এতেই রাখা ছিল অ্যাশট্রেটা। অতি সাধারণ কাঠের একটা চেয়ার, বসবার জায়গায় প্লাস্টিক শিটে মোড়া ফোম রাবার বা প্লাস্টিক ফোম ব্যবহার করা হয়েছে।

প্লাস্টিক শিটে তৈরি গর্তটার আদল ঠিক যেন একটা সিগারেট, ইঞ্চি দুয়েক লম্বা, সেটার পাশে পোড়া তামাকের টিউব আকৃতির ছাই পড়ে আছে এখনও।

এরকম পোড়া প্রায় সবারই দেখবার সুযোগ হয়, অবহেলা করে সিগারেটের অবশিষ্টাংশ না নেভানোর পরিণতি। সেগুলোর মত এটাতেও অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা রানাকে ধাঁধায় ফেলে দিচ্ছে।

কেউ যদি সিগারেট খেতে অভ্যস্ত হয়, সেটা নেভানোর জন্য নির্দিষ্ট একটা ধরন থাকে তার।

রানার অভ্যাস হলো, গোড়াটা ভাঁজ করে জোরে চেপে ধরা, আগুন সহ মাথাটা যাতে গুঁড়িয়ে যায়। এভাবে নেভালে ফুলকি ছোটে না। ও যে অ্যাশট্রে ব্যবহার করে সেগুলোয় চ্যাপ্টা, গুলতি আকৃতির অবশিষ্টাংশ দেখা যায়।

তা হলে এটা সোজা কেন? হয়তো নেভায়নি ও। এটাই পরিষ্কার উত্তর। না নিভিয়ে গোটা সিগারেটটাই অ্যাশট্রেতে রেখে দিয়েছিল, তারপর যেভাবেই হোক গড়িয়ে চেয়ারে পড়ে যায়। হতে পারে, অসম্ভব নয়।

কিন্তু এভাবে কখনও না নিভিয়ে অ্যাশট্রেতে সিগারেট রাখবে না রানা। অন্তত কখনও রেখেছে বলে মনে করতে পারছে না।

কাল রাতের স্মৃতিও পরিষ্কার বলছে, ঘুমাবার আগে সিগারেটটা নিভিয়েছিল ও। শুধু যে নিভিয়েছে, তাই নয়, নেভানোর কাজটা অ্যাশট্রের ঠিক মাঝখানে করেছিল। স্পষ্ট মনে পড়ছে, প্রতিবারের মত গোড়াটা ভাঁজ করে চাপ দিয়েছে।

হুম্‌ম্‌।

ঝুঁকে ফুঁ দিয়ে ছাইটুকু উড়িয়ে দিল রানা, চেয়ারটা আরও ভালো করে দেখতে চায়।

দুই ইঞ্চি লম্বা গর্তের ভিতর প্লাস্টিক ফোম বেশ ভালোভাবেই পুড়েছে। ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে আন্দাজ পাওয়ার চেষ্টা করল কতটা। খুব বেশি নয়। আগুনটা পিভিসি কাভার পুড়িয়ে ভিতরে ঢুকেছে, তারপর সরাসরি কয়েক কিউবিক ইঞ্চি গভীর পর্যন্ত ছাই করে ফেলেছে ফোম।

গর্তটা থেকে আঙুলগুলো বের করে আনার পর দেখা গেল কালো, ধুলোটে দাগ লেগে রয়েছে। মুছে ফেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা, কারণ ছাইটা আসলে ভেজা।

ভেজা?

এক জোড়া আঙুল পরস্পরের সঙ্গে ঘষল রানা। মিহি ছাইয়ে জলীয় পদার্থ থাকায় দুই আঙুলের মাঝখানে পাতলা আর কালো পেস্ট তৈরি হয়েছে। আশ্চর্য তো! এই ছাইয়ে পানি এল কোত্থেকে?

উত্তর খুঁজতে গিয়ে বহুকাল আগে আংশিক হজম করা রসায়ন বিদ্যা স্মরণ করতে চাইল রানা। কার্বন কি অ্যাটমসফিয়ার থেকে জলীয় পদার্থ শোষণ করে? বোধহয় করে। মনে রাখতে হবে এই কামরাটা গরম। তা হলে কী প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা?

শিখার সময় ফাঁকি দেওয়া হয়েছে, কাজেই উত্তরটা জানা নেই ওর। তবে একটা জিনিস নির্ভুল জানে–পানি আগুন নেভায়।

ঠিক আছে, আবার নতুন করে দেখা যাক। ও যখন অস্থির হয়ে হাট থেকে বেরিয়ে যায় তখন এখানে ধোঁয়া আর বাষ্প ছিল। ততক্ষণে সম্ভবত চেয়ারের ফোম যতটুকু পোড়ার পুড়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন কমান্ড হাটে ডিউটিতে থাকা তরুণ লেফটেন্যান্টকে নিয়ে ফিরে এল, ততক্ষণে আগুনটা নিভে গেছে। আর এখন জায়গাটা ভেজা ভেজা।

আরও ব্যাপার আছে। টানেলের দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু লেফটেন্যান্টকে নিয়ে ফিরে এসে দেখে খোলা।

তা হলে?

তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় পরে হাট থেকে বেরিয়ে এল রানা। মেইন স্ট্রিটের আলো খুবই নিস্তেজ করে রাখা হয়েছে, জেনারেটরে যাতে চাপ কম পড়ে।

কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, রাস্তার পুরোটা দৈর্ঘ্য খালি পড়ে আছে।

কমান্ড ট্রেঞ্চে চলে এল রানা। সামনের হাটে পাওয়া গেল সেদিনের সেই তরুণ লেফটেন্যান্টকে, মেজর লালু ভাই ফালকের ডেস্কে বসে রয়েছে।

'আমি একটা কাজে এসেছি,' বলল রানা।

একটা হিন্দি সিনে ম্যাগাজিন থেকে মুখ তুলে রানাকে দেখে হাসল লেফটেন্যান্ট, তারপর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, 'জী-সার, বলুন।'

'আচ্ছা,' রানা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের এখানে কি কোন ফায়ার ম্যানুয়্যাল আছে?'

নিঃশব্দে হাসল লেফটেন্যান্ট। 'জী, আছে,' বলে ডেস্কের পিছনের র‍্যাক থেকে ভারী একটা আর্মি-ইস্যু বই নামিয়ে এনে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

'ধন্যবাদ,' প্লাস্টিক মোড়া বইটা তার হাত থেকে নিয়ে বলল রানা 'আমি

কি এটা পড়তে নিতে পারি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

নিজের হাটে ফিরে এল রানা। বিছানায় শুয়ে সাতশো পাতার বইটা খুলল, হাজার হাজার ফায়ার রেগুলেশন-এর ভিতর দিয়ে এগোচ্ছে।

অবশেষে যা খুঁজছিল পেয়ে গেল—প্লাস্টিকে আগুন লাগলে কী প্রতিক্রিয়া হয় তার উপর পুরো আলাদা একটা চ্যাপ্টার।

রানা শিখল, অগ্নিদগ্ধ হওয়ার সময় পিভিসি নানা ধরনের বিষাক্ত গ্যাস তৈরি করে, সেগুলোর মধ্যে দুটো হলো ফসজিন আর বেনজিন। তবে ওর মাথাব্যথার কারণ পিভিসি নয়। চেয়ারটার সিট কাভারটা শুধু পিভিসি, ভিতরে তো ফোম।

এরপর পলিইউরোথেন-এর উপর লেখাটা পড়ল রানা। একবার নয়, দু'বার।

তিক্ত হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। সারা দুনিয়ার লোকজন নরম চেয়ারে হেলান দিয়ে কত রঙিন স্বপ্ন দেখে, কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন জানে কিসের উপর বসে আছে তারা?

সামান্য একটু পলিইউরোথেন পুড়লে তা থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন মনোক্সাইড আর হাইড্রোজেন সায়ানাইড তৈরি হয়। ইউরোপ-আমেরিকার যে-সব লোক একজস্ট থেকে মোটরগাড়ির ভিতর হোস পাইপ টেনে এনে আত্মহত্যা করে, তারা আসলে হাতের কাছে পেয়ে কার্বন মনোক্সাইডই কাজে লাগায়।

তবে হাইড্রোসায়ানিক গ্যাসের সঙ্গে তুলনা করলে কার্বন মনোক্সাইডকে অনেক নরম বলতে হবে। আমেরিকায় হাইড্রোজেন সায়ানাইড ব্যবহার করা হয় গ্যাস চেম্বারে, খুনিদের খুন করার জন্য। কেননা গ্যাসের মধ্যে এটাই সবচেয়ে দ্রুত কাজ করে।

আর এই গ্যাস যে জিনিস থেকে বেরোয় সেই পলিইউরোথেন নিঃশব্দে পুড়ছিল রানার নাক থেকে মাত্র এক ফুট দূরে!

এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে কেউ ওকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।

তিন

বিশালা কালমুনাইয়ের সারা শরীর ব্যথায় দপ দপ করছে। গণপিটুনি খেয়ে নাক-মুখ ফেটে গেছে তার, হাড় ভেঙেছে পাঁজরের, খামচে তুলে নেওয়া হয়েছে পিঠ আর নিতম্বের কয়েক জায়গার মাংস।

কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে। গোঙাচ্ছে সে, মাঝে মধ্যে ফুঁপিয়ে উঠছে। আর ভাবছে, ওভাবে মারমুখো হয়ে সিপাইগুলোকে ভাগিয়ে দেওয়া কি উচিত হয়েছে তার? চুপচাপ পড়ে থাকলে চিকিৎসা পেত, রেহাই পেত ব্যথা থেকে, পেটেও হয়তো কিছু দানা-পানি পড়ত।

তবে না, সিপাইদের ভাগিয়ে না দিয়ে উপায় ছিল না কালমুনাইয়ের।

রেড জোন, অর্থাৎ ডক্টর ওসমান ফারুকের ল্যাব ট্রেঞ্চের এই ঘরে নিয়ে এসে

হাত-পা বাঁধা চলছে, এই সময় প্রথমবার তার জ্ঞান ফিরে আসে। তখন তাকে ঘিরে কামরার ভিতর দাঁড়িয়েছিল কমকরেও বার কি তেরজন লোক, ক্যাম্প কমান্ডার সহ। সে সময় শরীরে এত যন্ত্রণা, তার মরে যেতে ইচ্ছে করছিল।

কিন্তু ওই অবস্থায়ও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো ভদ্রলোক তার মনোযোগ কেড়ে নেন। ভদ্রলোক মানে, তাঁর দৃষ্টি আর ঠোঁট। তিনি তাঁর দৃষ্টি আর ঠোঁটের সাহায্যে তাকে যেন বলতে চাইছিলেন–চিন্তা করো না, আমি তোমাকে সাহায্য করব!

সঙ্গে সঙ্গে কালমুনাইয়ের মাথায় প্রশ্ন জাগে–তা হলে কি ইনিই তিনি, যিনি গোটা নেতাজি ক্যাম্পে আতঙ্ক ছড়িয়ে রেখেছেন? ভগবান, তা কী করে সম্ভব! তার মত পাষণ্ডও শিউরে উঠল ভয়ে। দু'জনের অপরাধ তুলনা করে ওঁর সামনে নিজেকে তার দুগ্ধপোষ্য শিশু বলে মনে হলো।

কিন্তু, ভয়ানক বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এখন তিনি তার সঙ্গে হাত মেলাতে চাইছেন!

মহাসাগরে পড়ে মানুষ যদি খড়কুটোও দেখতে পায়, সেটা ধরেই বাঁচতে চেষ্টা করে। কালমুনাইয়ের এখন সেই অবস্থা। ইনিই তিনি কি না, সেটা নিয়ে পরে ভাববে সে। এখন তার যে অবস্থা, খোদ শয়তানের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করতে রাজি সে।

শ্রীলঙ্কায় তার সংগঠন ফিফটি পারসেন্টকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। তার বাহিনীর সদস্যরা বেশিরভাগ গুলি খেয়ে মারা গেছে, নয়তো পুলিশ হাসপাতালে শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

এখানে, নেতাজি ক্যাম্পেও, মহা বিপদে পড়েছে সে। কদিন থেকেই আঁচ করতে পারছিল, তার বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠেছে নেতাজি ক্যাম্পে আসা নতুন ওই বাঙ্গালী ডিআইজি। লোকটা যে প্রচণ্ড ক্ষমতাধর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা না হলে কী আইসক্যাপে বসে কলকাঠি নাড়লে শ্রীলঙ্কায় গজব পড়ে!

নিজেকে কোণঠাসা ইঁদুরের মত লাগছিল কালমুনাইয়ের। সেজন্যই তো যখন খবর পেল যে সিপাইরা তাকে অ্যারেস্ট করতে আসছে, মোটর ট্রেঞ্চে গিয়ে একটা বুলডোজারে উঠে বসে, বোকার মত ভাবছিল সারফেসে উঠে পালিয়ে যাবে। তা যে সম্ভব নয়, এ-কথা একবারও মনে হয়নি তার।

তারপর যখন মোটর ট্রেঞ্চে সিপাইদের ঢুকতে দেখল, মাথাটা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেল কালমুনাইয়ের। নিজের পায়ে কুড়াল মারল সে, সোজা তাদেরকে লক্ষ্য করে বুলডোজার চালিয়ে দিল।

লোকগুলোর নেহাতই ভাগ্য বলতে হবে যে মাত্র একজন মারা গেছে।

যাই হোক, নিজের এরকম চরম বিপদের মধ্যে খড়কুটো দেখতে পেয়েছে কালমুনাই। এক ভদ্রবেশী পিশাচ যেচে পড়ে যখন তাকে সাহায্য করতে চাইছেন, দেখা দরকার কতটুকু কী পারেন তিনি। তাই সিপাইদের ভাগিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য।

কেন তিনি সাহায্য করতে চান, কী তাঁর স্বার্থ, বিনিময়ে কিছু চাইবেন কি না, এ-সব নিয়েও ভাবতে হবে, তবে এখনই নয়। আগে তার ধারণা যে মিথ্যে নয় সেটা প্রমাণিত হোক, তিনি যোগাযোগ করুন।

এমনও তো হতে পারে যে গোটা ব্যাপারটাই তার উদ্ভট কল্পনা মাত্র?

শুধু যে শরীরে, তা নয়, কালমুনাইয়ের মনেও দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। নির্জন কামরার মেঝেতে শুয়ে আপনমনে বিড়বিড় করছে সে, 'আমি হলাম গিয়ে শ্রীলঙ্কার টপ টেরর বিশালা কালমুনাই ওরফে পুত্তানাম বর্ধন, সেই আমি কিনা কোথাকার এক বাঙালীর কাছে গো হারা হেরে গেলাম! ছি-ছি, ছি!'

ওহ্, দু'জন মিলে ডিআইজি লোকটাকে যদি জবাই করতে পারতাম!

হঠাৎ পিপ্-পিপ্ আওয়াজ হলো। অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে, তা সত্ত্বেও নিজের ধারণা সত্যি হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে উল্লাস অনুভব করল কালমুনাই। অনেক কষ্টে দাঁড়াল সে, দেয়াল ধরে ধীরে ধীরে এগোল ডেস্কের দিকে।

আবার বাজল টেলিফোনটা।

ডেস্কের পিছনে এসে ধপাস করে চেয়ারটার উপর ঢলে পড়ল কালমুনাই। পাঁজরের ভাঙা হাড় মাংসে খোঁচা মারতে ব্যথায় তার প্রাণটা যেন বেরিয়ে যাওয়ার যোগাড় হলো। কয়েক মুহূর্ত পর হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে কানের কাছে নিয়ে এল সে।

'তুমহারা সাথ কোঈ হ্যায়, কালু?' ভাষাটা হিন্দি, তবে কণ্ঠস্বর ভোঁতা; যেন নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য রিসিভারে রুমাল জড়িয়ে রেখেছে।

'জী-না, সার,' জবাব দিল কালমুনাই।

'তুম মুঝকো পেহচানা, কালু? পাতা হ্যায় ম্যায় কৌন হুঁ?'

'জী, সার, চিনেছি,' বলল কালমুনাই। 'জানি আপনি কে।'

'অসম্ভব! চেনার প্রশ্নই তো ওঠে না। শুনি তো কী করে চিনলে?' প্রতিপক্ষের কথার সুরে চ্যালেঞ্জ আছে, তার সঙ্গে খানিকটা কৌতূহলও।

'আমার যখন প্রথম জ্ঞান ফিরল, দেখি ওরা আমাকে বাঁধছে, তখন ওখানে আপনি ছিলেন। চোখ ইশারায় আর ঠোঁট নেড়ে আপনি আমাকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করছিলেন...'

'মার খেয়ে তোমার মাথা দেখছি পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে,' হতাশ সুরে বলল কালমুনাইয়ের প্রতিপক্ষ। 'আমি ওখানে ছিলাম ঠিকই, কিন্তু ...' হাসি চাপতে পারল না, '...কিন্তু চোখ বা ঠোঁট দিয়ে আমি কাউকে কোন ইশারা-ইঙ্গিত দিইনি। তুমি ভুল করছ; কালু। আমি সে লোক নই।'

খুব তেষ্টা পাচ্ছে কালমুনাইয়ের, একটা ঢোক গিলল সে। 'আপনি তাহলে কে?' মনে মনে ভাবল, নয়-ছয় বোঝালেই আমি বুঝব? আপনাকে আমি ঠিকই চিনেছি।

'এই ব্যাপারটা আপাতত গোপন থাকুক, তাতে আমাদের দু'জনেরই সুবিধে।'

'বুঝলাম না, সার।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি। তার আগে বলো, এটা জানো তো যে খুব বড় বিপদে পড়েছ তুমি?'

'জানি, সার।'

'এই বিপদ থেকে বাঁচার কোন উপায় তোমার জানা আছে?'

'না, সার,' স্বীকার করল কালমুনাই। 'কী বলব···আমি চোখে অন্ধকার দেখছি, সার।'

'চিন্তা কোরো না, বিপদটা থেকে আমি তোমাকে বাঁচাব,' দৃঢ়কণ্ঠে আশ্বাস দিল লোকটা। 'তবে তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও।'

'জী, সার, বলুন।'

'তোমার জখম কি সিরিয়াস? হাঁটাচলা করতে পারবে না?'

'জী, সার, সিরিয়াস। তবে চেষ্টা করলে হাঁটাচলা করতে পারব,' বলল কালমুনাই।

'শুধু হাঁটাচলা নয়, দৌড়াতেও পারতে হবে। আরও একটু খোলসা করে বলি?'

'জী, সার!'

'ধরো তোমার সামনে একটা ষাঁড়কে ছেড়ে দেয়া হলো। তোমার হাতে একটা বড় ছোরা আছে, তুমি কি ষাঁড়টাকে একার চেষ্টায় জবাই করতে পারবে?'

এবার জবাব দেওয়ার আগে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হলো কালমুনাইকে। 'স্যার, ব্যাপারটা নির্ভর করে বিনিময়ে আমি কী পাব তার ওপর।'

'ধরো তুমি প্রাণভিক্ষা পাবে।'

ষাঁড় নয়, ভাবল কালমুনাই, মানুষ খুন করার কথা বলা হচ্ছে তাকে। 'নতুন জীবন পেলে এ-ধরনের কাজ করা এখনও আমার পক্ষে সম্ভব।'

'বহুত খুব, বহুত খুব! শুনে সত্যি খুশি হলাম, কালু।'

'সার, আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচাবেন বলেছেন···'

'বিনিময়ে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে তোমাকে। কী কাজ, শোনার পর সেটা তুমি না-ও করতে চাইতে পারো, তাই আমার পরিচয় তোমাকে এখন জানাচ্ছি না। পরিচয় জানলে, অথচ কাজটা করতে রাজি হলে না, পরিস্থিতি এরকম দাঁড়ালে তোমাকে খুন না করে আমার উপায় থাকবে না।'

কালমুনাই ভাবল, তা হলে তো কাজটা আমি করে দিলেও আমাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে না! অন্তত সরল যুক্তি তো তাই বলে। 'আপনি আমাকে কীভাবে বাঁচাবেন, সার?' সরাসরি জানতে চাইল কালমুনাই। 'মানে, তা কি সত্যি সম্ভব?'

'শুধু আমার পক্ষেই সম্ভব,' অপরাধীর কথায় গর্বের সঙ্গে আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ল। 'শতকরা একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, এখান থেকে মুক্ত করা হবে তোমাকে, তারপর বহাল তবিয়তে পৌঁছে দেয়া হবে তোমার পছন্দমত যে-কোন দেশের যে-কোনও শহরে। রাজি?'

'কিন্তু কিসের বিনিময়ে, সার?' কালমুনাইয়ের বিস্ময় ক্রমশ বাড়ছে, সেই সঙ্গে মনের ভিতর ডাল-পালা মেলছে একটা সন্দেহ। 'আমার কাছে কাউকে দেয়ার মত কিছু তো নেই।'

'নিজেকে এত ছোট ভাবো তুমি? ছি, কালু। শোনো, হে –তুমি বন্দি, তোমার পক্ষে কারও কোন ক্ষতি করা সম্ভব নয়, এই বাস্তবতাই একটা মূল্যবান পণ্য হয়ে উঠেছে। ওই পণ্য বেচে নিজের প্রাণ রক্ষা করবে তুমি।'

কালমুনাই সরাসরি প্রসঙ্গে আসতে চাইল। 'আমাকে কি করতে হবে তাই

বলুন।'

'আমি জানি, কালু, আক্রোশে কাঁপছ তুমি। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তোমার মনটা ছটফট করছে।'

'হ্যাঁ...'

'কাজটায় তোমার জন্যে কোন ঝুঁকি নেই। আমার কাছে চাবি আছে, দরজা খুলে দেব। এক সেট পারকা আর গ্লাভ দেব, পরে নেবে সেগুলো। তারপর একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ঘুরঘুর করবে। ওখানে একবার না একবার আসবেই ডিআইজি...'

'ভগবান!' নিজের কানকে কালমুনাই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। 'বলুন, বলে যান!'

'আমি চাই তাকে তুমি খুন করো,' বলল লোকটা। 'খুন করো গরুর মত জবাই করে। ছোরাটা আমিই যোগান দেব তোমাকে। তুমি শুধু ওই শালার গলায় চালাবে ওটা। তোমার কাছে চাবি থাকবে, কাজ সেরে আবার ওই ঘরে ফিরে গোঙাবে। ক্যাম্পের কেউ ভাবতেও পারবে না কাজটা তোমার...'

হঠাৎ বাধা দিল কালমুনাই। 'আপনি জানলেন কীভাবে যে আমি গোঙাচ্ছি?'

লোকটা বলল, 'জানবার কী আছে? শুনতেই তো পাচ্ছি। অমন বেধড়ক মার খেলে ভূতও গোঙাবে।' একটু বিরতি নিয়ে আসল প্রসঙ্গে ফিরে এল। 'কাজটা তুমি পারবে কি না বলো।'

হ্যাঁ, পারব! যে-কোন কিছুর বিনিময়ে ওই ডিআইজি-কে খুন করতে চাই আমি! পারতে আমাকে হবেই! এটা কালমুনাইয়ের আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন। কিন্তু তার অন্তরের সংশয় কাটছে না। 'পারব,' ইতস্তত করে বলল সে। 'কিন্তু কাজটায় রাজি হওয়ার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে।'

'হ্যাম তৈয়ার! তুমহারা সওয়াল পুছো, কালু।'

এবারও খানিক ইতস্তত করে কালমুনাই জিজ্ঞেস করল, 'না, মানে...ইয়ে, মানে—আপনিই তো, না?'

'আমি তো...কী?'

'না, মানে, ক্যাম্পে যা কিছু ঘটছে...'

'হ্যাঁ, আমিই দায়ী। খুশি? তবে এরকম প্রশ্ন আর কখনও করবে না। মাত্রা ছাড়ানো কৌতূহল তোমার জন্যে বিপদ ডেকে আনতে পারে। আর কী জানতে চাও?'

'এটা জিজ্ঞেস করা কি নিষেধ যে, কেন আপনি তাকে খুন করতে চাইছেন?' নরম সুরে প্রশ্নটা করল কালমুনাই।

'হ্যাঁ, নিষেধ। কারণ উত্তরটা জানার কোন প্রয়োজন নেই তোমার। আর?'

'এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কাজটা আমি করলাম, তারপর আমাকে আপনি মেরে ফেললেন—কে আপনাকে বাধা দেবে?' দম নিল কালমুনাই। 'ততক্ষণে আমি আপনার পরিচয় জেনে ফেলব, তাই না? কাজেই আমাকে বাঁচিয়ে রাখাটা আপনার জন্যে অত্যন্ত ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।'

'হ্যাঁ, তুমি বলার পর আমিও এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। কিন্তু এ-ব্যাপারটায় অন্য কিছু করার নেই, আমার ওপর তোমাকে বিশ্বাস রাখতে হবে,

কালু। আমি তোমাকে আমার মাতৃভূমির কসম খেয়ে কথা দিচ্ছি, আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না। এখন ভেবেচিন্তে বলো, কী করবে?'

মাতৃভূমির কসম? দূর, দূর! কাজটা করিয়ে নিয়ে তুমি শালা নির্ঘাত খুন করবে আমাকে, ভাবল কালমুনাই। এটাই তোমার প্ল্যান। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি, সার।' কিন্তু আমাকে তুমি চেনো না, শয়তান! তোমার কীভাবে বারোটা বাজাতে হয়, আমার জানা আছে।

'বহোত খুব!'

'ছোরা আর পারকার সঙ্গে আরও কয়েকটা জিনিস লাগবে আমার,' বলল কালমুনাই। 'পেইনকিলার ইঞ্জেকশন, গরম পানি, লিকুইড অ্যান্টিসেপটিক, তুলো, কিছু খাবার...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে লোকটা বলল, 'পেইনকিলার ট্যাবলেট ছাড়া আর কিছুই এখন তুমি আশা কোরো না। এতসব জিনিস যোগাড় করতে গেলে মানুষের মনে সন্দেহ জাগানো হবে।'

'ও।' কালমুনাই ভাবল, নাকি যাকে মেরে ফেলার প্ল্যান করেছ তার জন্য এত ঝামেলা পোহাতে চাইছ না?

'আমি বিশ মিনিটের মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করছি,' বলল লোকটা। 'ঠিক আছে?'

'জী, ঠিক আছে,' বলে তাড়াতাড়ি যোগাযোগ কেটে দিল কালমুনাই। আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে, কাজেই সময় নষ্ট না করে কমান্ড হাটের নম্বরে ডায়াল করল সে। শুনতে পেল অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে।

টেলিফোনে আগেই কারিগরি ফলিয়ে রেখেছে শ্বেতাঙ্গদের প্রতিনিধি। এক জায়গার তার ছিঁড়ে আরেক জায়গায় জোড়া লাগিয়ে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে, কালমুনাই যে নম্বরেই ডায়াল করুক, কলটা তার রিসিভারে চলে আসবে।

কালমুনাই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা মাত্র সাউন্ডপ্রুফ দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল পাপিষ্ঠ লোকটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রিঙ হলো।

ক্রূর একচিলতে হাসি ফুটল লোকটার কালো ঠোঁটে। এবার আর রিসিভারে রুমাল জড়াল না, তার বদলে মুখের ভিতর ছোট আকারের একটা কয়েন ভরল। 'কমান্ড হাট,' রিসিভার তুলে হিন্দিতে বলল সে। 'কে বলছেন?' এমন ফাঁপা লাগল, কার সাধ্য তার কণ্ঠস্বর চিনতে পারে।

'রেড জোন, ল্যাব ট্রেঞ্চ থেকে আমি বিশালা কালমুনাই বলছি,' উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'ক্যাম্প কমান্ডার কর্নেল যাদবকে দরকার আমার। খুব জরুরি!'

'কর্নেল যাদব নেই, ইন্সপেকশনে বেরিয়েছেন।'

'ফিরবেন কখন?' দ্রুত জানতে চাইল কালমুনাই।

'তা তো বলতে পারছি না। আপনার কোন মেসেজ থাকলে আমাকে দিতে পারেন।'

'আপনি কে?' জানতে চাইল কালমুনাই।

'ডিউটি অফিসার কৈলাস মাথুর।'

'শুনুন, ভাই কৈলাস মাথুর! এটা আমার একার নয়, ক্যাম্পের প্রত্যেকের বাঁচা-মরার প্রশ্ন। যেভাবে পারেন কর্নেল যাদবকে খবর দিন। তাঁকে জানান, যে-লোকটা একের পর এক খুন আর স্যাবটাজ করে যাচ্ছে তাকে আমি চিনি...'

'হোয়াট!'

'হ্যাঁ, শুনতে আপনার ভুল হয়নি...'

'কে সে? নাম কি?' কালপ্রিট নিজের পরিচয় জানতে চাইছে।

'তা তো আমি কর্নেল ছাড়া আর কাউকে বলতে পারি না, ভাই! প্লিজ, কৈলাস মাথুর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে খবর দিন। আরেকটা কথা, আর মিনিট পনেরোর মধ্যে আমার কাছে আসছে সে। তাকে ধরতে হলে আপনারা চলে আসুন...'

'ঠিক আছে, দেখছি কর্নেলের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কি না,' অভয় দিয়ে বলল লোকটা। 'আপনি চিন্তা করবেন না, মিস্টার কালমুনাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল লোককে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি আমরা। তার আগেই যদি কালপ্রিট পৌঁছে যায়, সাবধান, কিছুই তাকে টের পেতে দেবেন না। এ-কথা সে-কথা বলে সময় নষ্ট করবেন। বুঝতে পারছেন কি বলছি আমি?'

'হ্যাঁ। আপনারা না আসা পর্যন্ত তাকে আটকে রাখতে হবে।'

'হ্যাঁ।' যোগাযোগ কেটে দিল লোকটা।

সঙ্গে সঙ্গে নয়, কালমুনাইয়ের ঘরে দশ মিনিট পর গেল সে। তার আগে টেলিফোনের তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ভোলেনি।

চার

সকালে জানালাবিহীন কামরায় ঘুম ভাঙতে ঝট করে রানার মনে পড়ে গেল, রিয়্যাক্টর ইঞ্জিনিয়ার তৌফিক আজিজকে কথা দেওয়া আছে ঠিক পাঁচটার সময় জাভেদ হাশমির ক্যাবিনে পৌঁছাবে ও। হাতঘড়িতে চোখ বুলাতে দেখল আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় পরে বেরিয়ে পড়ল ও।

হসপিটাল হাটে ঢুকে ডাক্তার আরিফ হাসানের চেম্বার খালি দেখে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার।

তবে জাভেদ হাশমির ক্যাবিনের দিকে যাওয়ার সময় ওয়ার্ড-এর খালি একটা বেডে মেডিক রফিককে শুয়ে থাকতে দেখে স্বস্তি বোধ করল। রফিক ঘুমালেও, তার বেডের পাশে বসে একটা ম্যাগাজিন পড়ছে ইঞ্জিনিয়ার তৌফিক আজিজের সহকারী শরাফত সামদানি।

'সব ভালো?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

সামদানি মাথা ঝাঁকালেন, তারপর ইঙ্গিতে রফিককে দেখিয়ে বললেন, 'রাত একটার দিকে আরেকটা ইঞ্জেকশন দিয়েছে ও।'

'আচ্ছা,' বলল রানা। 'দেরি হবার জন্য দুঃখিত। এবার আপনি ঘুমাতে যেতে

পারেন।'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।' চেয়ার ছেড়ে আড়মোড়া ভাঙলেন সামদানি।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার হাশমির কি ঘুম ভেঙেছিল?'

'ইয়ে···মানে, উনি তো সব সময় আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যেই আছেন।'

'কিছু বলেছেন?'

'তেমন কিছু না।'

'আচরণ স্বাভাবিক মনে হলো?'

'প্রায়। ভালোর দিকেই যাচ্ছে। তবে জানেনই তো, ঘোরের মধ্যে আছেন।'

সামদানি চলে যেতে ক্যাবিনে ঢুকে রোগীর পাশে বসল রানা। হাশমির শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত ছন্দে পড়ছে। সম্পূর্ণ শান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। ফ্লাস্ক থেকে একটা মগে কফি ঢেলে চুমুক দিল ও।

মাথার ভিতর আবার সেই নাছোড় চিন্তা ফিরে এল। এখানকার একজন বা একদল লোক একের পর এক স্যাবটাজ ঘটিয়ে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চাইছে, নেতাজি ক্যাম্প ছেড়ে সবাই যাতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কেন?

এ প্রশ্নের সহজ উত্তর, ক্যাম্পটা পরিত্যক্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরাধী তার সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। সমস্যাটা কী?

ডক্টর ফারুকের আবিষ্কার পাচার করা।

অর্থাৎ এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সে বা তারা সাদাদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে। এখন যদি সন্দেহভাজনদের একটা তালিকা করতে বলা হয় রানাকে, কার নাম বাদ দেবে ও?

এ পর্যন্ত নেতাজি ক্যাম্পে যাদের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে তাদের একজনকেও বাদ দেওয়া চলে না।

অন্য চিন্তায় মন দিল রানা। জাভেদ হাশমির এই পাগলামি সম্পূর্ণ নতুন। নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিঙের মত স্পর্শকাতর ফিল্ডে কাউকে বড় কোন দায়িত্ব দেওয়ার আগে অবশ্যই তার সাইকোলজিকাল টেস্ট নেওয়া হয়। অতীতে হাশমির আচরণে পাগলামির ছিটেফোঁটা থাকলেও টেস্টে তিনি পাস করতেন না।

সকাল সাতটার দিকে জাগল রফিক। কফি খেয়ে রোগীর যত্ন নিল সে। ঘুম ভেঙে গেলে হাশমি আবার হিংস্র হয়ে উঠতে পারেন, এই ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। শরীর থেকে স্ট্রেইটজ্যাকেট আর পা থেকে ক্যানভাস দিয়ে তৈরি স্ট্র্যাপ খুলে নিল রফিক, বেশ সময় নিয়ে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করা হলো তাঁকে। গভীর ঘুমে তলিয়ে থাকলেন হাশমি, এতটুকু নড়াচড়া করলেন না।

আটটায় আবার হাশমিকে দেখতে এলেন ক্যাম্প কমান্ডার। ক্লান্ত দেখাচ্ছে ভদ্রলোককে। চোখ দুটো গর্তে বসে গেছে, নীচে কালচে পুঁটলি। তবে জোর করা হলেও হাসি আছে মুখে, হাঁটাচলায় ব্যস্ত একটা ভাব। রানার কাঁধে মস্ত একটা থাবা রাখলেন। 'কী অবস্থা রোগীর?'

'সারা জীবনের ঘুম একবারেই সেরে নিচ্ছেন,' বলল রানা 'ডিজেলগুলোর

খবর কী?'

'দু'নম্বর জেনারেটর এখন কাজ করছে, মিস্টার জয়,' বললেন কর্নেল, হাসিটা এখন অকৃত্রিম লাগছে।

'তাই?'

'ভাগ্য সহায়তা করলে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে এক নম্বরটাও চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করছি।'

'বাহ্।'

'শুধু তাই নয়, আরও ভালো খবর আছে। কাল এসে পৌঁছাচ্ছে চলতি-কা-নাম-গাড়ি। এখন আবার রেডিও কাজ করছে, এইমাত্র বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পের কমান্ডার শঙ্কর দয়ালের সঙ্গে কথা বলে এলাম আমি।'

'ওখানকার খবর সব ভালো?' জানতে চাইল রানা। 'কর্নেল শর্মার সঙ্গে পরামর্শ করলেন, পোস্ট মর্টেমের জন্যে লাশগুলো কীভাবে ওখানে পাঠানো যায়?'

মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল যাদব। 'ওরা আমাদের জন্যে এক জোড়া জেনারেটর থিউলে পাঠিয়ে দিয়েছে, প্রথম ওয়েদার ব্রেক শুরু হওয়া মাত্র ক্যারিবুতে তুলে পাঠিয়ে দেবে এখানে। শঙ্কর দয়াল বললেন, ওই প্লেনে লাশগুলো পাঠিয়ে দিলে বাকি যা করার সেই করবে।'

'ক্যারিবুর পাইলট লছমন শেঠি তো আপনার দেশেরই লোক, তাকে নিশ্চয় ভাল করে চেনেন আপনি?'

'চিনি মানে! লছমন আমার গ্রামের ছেলে। কেন বলুন তো?'

'ভাবছি সিডিটা ওকে দিয়ে থিউলে পাঠানো যায় কিনা।'

'খুব যায়। ওর মত বিশ্বস্ত ছেলে খুব কম পাবেন আপনি। থিউলে কার কাছে পাঠাবেন?'

'সেটা আমি বলতে পারব ঢাকার সঙ্গে রেডিওতে কথা বলার পর।'

'ঠিক আছে,' বলে রফিকের দিকে ফিরলেন কর্নেল। 'ও হে, মেডিক—ব্লাডপ্রেশার, পালস রেট ইত্যাদি যা যা লাগবে সব নিয়ে তাড়াতাড়ি রেডিও রুমে চলে যাও, থিউলের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক কী বলেন শোনো।'

'জী, কর্নেল।'

রানার দিকে ফিরলেন ক্যাম্প কমান্ডার। 'দাঁড়ান, আপনাকে রিলিফ দেয়ার একটা ব্যবস্থা করছি। একসঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট খাব আমরা। যেন মনে হচ্ছে বহুকাল পর সত্যিকার রাক্ষুসে খিদে পেয়েছে আমার।'

'আপনার সঙ্গে আমার কথা ছিল…'

রানাকে থামিয়ে দিলেন কর্নেল যাদব। 'মেস হলে তো একটু পর দেখা হচ্ছেই,' বলে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

'না, ব্যাপারটা জরুরি,' পিছন থেকে বলল রানা।

আবার ঘুরে রানার মুখোমুখি হলেন কর্নেল। 'বলুন।'

'কাল রাতে আপনি আমাকে বলেছিলেন বটে যে আজ বিকেলের আগে কালমুনাইয়ের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না, কিন্তু আমি এখনই তার সঙ্গে

একবার কথা বলতে চাই।'

এক নিমেষে থমথমে হয়ে উঠল কর্নেল যাদবের চোখ-মুখ। প্রথমে, কয়েক সেকেন্ড, কোন কথাই বলতে পারলেন না। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'সেক্ষেত্রে একদল সিপাইকে পাঠিয়ে দেখতে হয় কালুর ঘুম ভেঙেছে কিনা বা কেমন আছে সে। মেসে আসুন, ব্যবস্থা করছি।' ভারী পা ফেলে ক্যাবিন ছেড়ে চলে গেলেন তিনি।

হাট থেকে বাইরে বেরুবার কাপড় পরে তৈরি হলো রানা। অপেক্ষা করছে ক্যাম্প কমান্ডার কখন কাকে পাঠাবেন এখানে।

কর্নেল চলে যাওয়ার বিশ মিনিট পর ত্রস্ত পায়ে ক্যাবিনে ঢুকল ডক্টর হারুন হাবিব। রানা ভাবল, সে বোধহয় এখন রোগীর পাশে বসবে। কিন্তু তার মুখের দিকে একবার তাকাতেই বুঝতে পারল আরও একটা দুঃসংবাদ শুনতে হবে ওকে।

হারুন খুব জরুরি ভঙ্গিতে জানতে চাইল, 'মিস্টার জয়, তৌফিক আজিজকে শেষবার আপনি কখন দেখেছেন?'

আর্কটিক কাপড়ে মোড়া রানার শরীর ঘামতে শুরু করল। 'কেন?'

'আপনি ঠিক কখন তাঁকে দেখেছেন, মিস্টার জয়? সময়টা বলতে পারবেন?'

একটু চিন্তা করল রানা। 'এই মাঝরাতের দিকে। যখন তিনি আমার বদলে ডিউটি দিতে এলেন।' প্রশ্নটা আবার করল ও, 'কেন?'

'তাঁকে...মানে, কী বলব...তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কর্নেল আমাকে পাঠালেন...'

'আপনি বলতে চাইছেন, ইঞ্জিনিয়ার তৌফিক আজিজ অদৃশ্য হয়ে গেছেন?'

'কর্নেল ব্রেকফাস্টে না বসে কমান্ড হাটে ফিরে গেছেন, এই খবরটা আপনাকে জানাতে বললেন তিনি। বলেছেন, তিনি দুঃখিত...'

রেগে গেছে রানা, সেটা গোপনও করল না। 'আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না।'

'সরি, সা...মিস্টার জয়।' ডক্টর হারুনের চোখে-মুখে বিমূঢ় একটা ভাব ফুটে উঠল। 'তৌফিক আজিজ তাঁর কোয়ার্টারে নেই, অফিসার্স ক্লাবে নেই, মেস হলে নেই, এমনকী রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চেও নেই। তবে এত তাড়াতাড়ি এ-কথা বলার সময় আসেনি যে...'

'আমি এখানে পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে আসি,' বলল রানা। 'মিস্টার আজিজ তখন এখানে ছিলেন না।'

'তাঁর কি থাকার কথা ছিল?' নরম সুরে জানতে চাইল হারুন।

'হ্যাঁ।' মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করছে রানা। তখন কেন ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়নি ও? 'কথা ছিল আমি এলে তিনি শুতে যাবেন।'

'কর্নেলকে তা হলে কথাটা জানাতে হয়, মিস্টার জয়,' নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা চুলকে, সুর আরও নরম করে বলল হারুন। তারপর জানতে চাইল, 'এখানে এসে তৌফিক আজিজকে পাননি, এই খবরটা কি ডিউটি অফিসারকে জানিয়েছিলেন?'

মাথা নাড়ল রানা, নিজের প্রতি ক্ষুব্ধ। 'না। আমি ভাবলাম ঘুম পাওয়ায়

আরেকজনকে দায়িত্ব দিয়ে শুতে চলে গেছেন।'

'ও। আচ্ছা।' রানার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ডক্টর হারুন। 'কর্নেল...আপনি...' কথা খুঁজে না পেয়ে চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল সে, অসন্তোষে আড়ষ্ট হয়ে আছে শরীরটা।

ঘুমন্ত ইঞ্জিনিয়ারকে ডিসটার্ব করা হবে, তাই কেবিন থেকে ডাক্তারের চেম্বারে বেরিয়ে এসে পায়চারি শুরু করল রানা। তৌফিক আজিজ যে সত্যি গায়েব হয়ে গেছেন, এ-ব্যাপারে মুহূর্তের জন্যও ওর মনে কোন সন্দেহ জাগছে না। কিন্তু কীভাবে? রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চে আসলে ঘটছেটা কী?

কাল সমস্যাটার নাম ছিল জাভেদ হাশমি। লোহার মত শক্ত একজন মানুষ, বলা নেই কওয়া নেই বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেলেন।

চব্বিশ ঘণ্টাও পেরোয়নি, তৌফিক আজিজ নাম নিয়ে আজ আরেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। ইনিও শক্ত একজন মানুষ, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, গোটা ক্যাম্পে কোথাও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রথমে আরিফ হাসান, তারপর জাভেদ হাশমি, এখন তৌফিক আজিজ। একজন ডাক্তার, দু'জন প্রকৌশলী। ওঁরা না থাকায় ক্যাম্প নেতাজি চিকিৎসা সুবিধে থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, বঞ্চিত হচ্ছে রিয়্যাক্টরের সার্ভিস থেকে।

মাটির বুকে শীতলতম আর সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গাগুলোর মধ্যে একটা হলো গ্রিনল্যান্ড আইসক্যাপ, এখানে শারীরিক আর মানসিক সুস্থতার জন্য ওই তিন ব্যক্তির উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

ইন্টারকম পিপ পিপ করে ওঠায় পায়চারি থামাল রানা। এগিয়ে এসে রিসিভার তুলল।

'মিস্টার জয়?' কর্নেল যাদবের কণ্ঠস্বর।

'বলছি।'

'মিস্টার আজিজের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছিল, ভোর পাঁচটায় দেখা হবে আপনাদের?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনি...'

'পৌঁছাতে আমার দেরি হয়ে যায়।'

'পৌঁছে দেখেন মিস্টার আজিজ ওখানে নেই?'

'না।'

'কোন মেসেজও দিয়ে যাননি?'

'আপনি আমাকে জেরা না করে শরাফত সামদানিকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন? তৌফিক আজিজ তাঁকে কিছু বলে যাননি? তাঁকে কিংবা রফিককে?'

'ওরা কেউ কিছু জানে না বলছে।' রিসিভার রেখে দিলেন কর্নেল যাদব।

চেম্বার থেকে ক্যাবিনে ঢুকছে রানা, জাভেদ হাশমিকে বলতে শুনল, 'অভাগাকে একটু কফি খাওয়াবেন?'

সাবধানে এগিয়ে এসে বেডের সামনে দাঁড়াল রানা, ঝুঁকে সন্দেহ ভরা দৃষ্টিতে তাকাল তাঁর দিকে। কাল ওর মুখের যেখানে উনি কামড়ে দিয়েছিলেন সেই

জায়গাটা এখনও সামান্য ব্যথা করছে। এ-ও পরিষ্কার মনে আছে, কী প্রচণ্ড শক্তি এসে গিয়েছিল ভদ্রলোকের শরীরে।

'দিন না, ভাই, প্লিজ,' কর্কশ কণ্ঠে আবার বললেন হাশমি। 'মুখের ভেতরটা এমন লাগছে, কেউ যেন ছাই গুঁজে দিয়েছে।'

'দেয়া যায়,' বলে পাশের চেম্বার থেকে একটা মগ নিয়ে এসে খানিকটা কফি ঢালল রানা। 'মাথা একটু উঁচু করুন।'

চোখ মিটমিট করলেন হাশমি। 'আমাকে স্ট্রেইটজ্যাকেটের ভেতর আটকে রাখা হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। মাথা তুলুন।'

মগটা যতটা সম্ভব কাত করে ধরল রানা, তাতে একটা চুমুক দিলেন হাশমি; মগের কিনারায় ঠোঁট তুলবার জন্য মাথাটা অনেক কষ্টে উঁচু করতে হলো তাঁকে। গরম কফি মুখের ভিতর একটু নাড়াচাড়া করে ঢোক গিললেন, তারপর শুয়ে পড়লেন আবার। 'কেন?'

'কাল,' বলল রানা, 'খানিকটা অদ্ভুত আচরণ করেছেন আপনি।'

'আচ্ছা?'

'হ্যাঁ। আরেকটু কফি?'

মাথা ঝাঁকালেন হাশমি। আরও দু'ঢোক কফি খেলেন। রানা কল্পনা করার চেষ্টা করল, ঘুম ভাঙার পর নিজেকে স্ট্রেইট-জ্যাকেটের ভিতর দেখলে কেমন লাগতে পারে। বিস্ময় আর আচমকা ভয় আতঙ্কিত করে তুলবে। হাশমির আচরণে সে-সব কিছুই দেখা যাচ্ছে না। 'কফিতে চিনি নেই,' বললেন তিনি।

'কেমন আছেন আপনি?'

'আছি? ভালোই তো, রিল্যাক্সড্।'

'গুড।'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন হাশমি। তারপর হঠাৎ বললেন, 'জানেন, আমাকে নানা রকম রঙের বিচিত্র খেলা দেখানো হয়েছে। সে এত সুন্দর রঙ যে বর্ণনা করা যায় না। আর ছিল প্রচুর ধুলো। অত ধুলো সব আমাকে বের করতে হয়েছে।'

বের করতে হয়েছে কোত্থেকে? মনে মনে জিজ্ঞেস করল রানা। 'রিয়্যাক্টর থেকে?'

'হ্যাঁ। যেন পাথরের মত পড়ে আছে। ধুলোর বিরাট সব বোল্ডার। ওগুলো ভেতরে ঢোকে ঢাকনিটা যখন খোলা ছিল।'

'তাই? আরও খানিকটা কফি খান।'

কফি খাওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকলেন হাশমি, কিন্তু তাঁর চোখ জোড়া স্থির নয়। খালি মগটা ধুয়ে রেখে এল রানা। ওকে ফিরে আসতে দেখে তিনি বললেন, 'কিন্তু তা তো হতে পারে না। বোল্ডারের মত কেমন করে হবে?'

'না হবারই কথা।'

'আমি ওগুলো দেখতে পাচ্ছি, বুঝলেন—ঠিক আমার এই মাথার ভেতর।'

'ধুলোর বোল্ডার?'

'বিশ্বাস করুন।'

'আর কী দেখতে পাচ্ছেন?'

একটু চিন্তা করলেন হাশমি। 'জানেন তো, ইস্পাতের গায়ে ফুটো আছে? মানুষের চামড়ায় যেমন লোমকূপ থাকে?'

'আমার ঠিক জানা নেই।' ভদ্রলোকের মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে রানার সন্দেহ কাটছে না। সময় যত গড়াচ্ছে ওর সিদ্ধান্ত ততই দৃঢ় হচ্ছে–স্ট্রেইটজ্যাকেট খোলা যাবে না।

'আছে, বিশ্বাস করুন, লোমকূপ সত্যি আছে।'

'কেন থাকবে? ইস্পাত তো ঘামে না।'

কথাটা বিবেচনা করে দেখলেন হাশমি। 'না, তা ঠিক। তবু মনে হচ্ছিল লোমকূপগুলো ধুলোয় বন্ধ হয়ে গেছে, আর···'

'আর?' এক মুহূর্ত পর জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, মানে, আমাকে সব পরিষ্কার করতে হলো আর কি।' রানার দিকে ঘুরে গেল হাশমির চোখ, দৃষ্টিতে কাতর মিনতি। 'এই স্ট্রেইটজ্যাকেট কেন? আমি পাগল?'

কথাগুলো খুব সাবধানে বলতে চেষ্টা করল রানা। 'ধুলোর বোল্ডার, লোমকূপ–আপনার এ-সব আইডিয়া হজম করা বেশ শক্ত না?'

রীতিমত আতঙ্কিত, হাশমির কণ্ঠস্বর বিকৃত শোনাল। 'আমি পাগল হয়ে গেছি!'

'ভুলটা আপনিও উপলব্ধি করেছেন,' বলল রানা, 'তবে পরে।'

হাশমির গলার পেশি আর শিরা টান টান হলো। হঠাৎ ভয় লাগল রানার, আবার না মারমুখো হয়ে ওঠেন। তাড়াতাড়ি বলল, 'চিন্তা করবেন না!'

'জিনিসটা যেন আমার মাথার ঠিক সামনে রয়েছে। সম্ভব নয়, কিন্তু তারপরও রয়েছে।' সরাসরি রানার চোখে তাকালেন হাশমি। 'আপনি ভয় পাচ্ছেন আমাকে?'

মাথা নাড়ল রানা, তবে সেটা যথেষ্ট তাড়াতাড়ি হলো না।

'গড!' চুপসে গেলেন হাশমি।

রানা একটা সিগারেট ধরাল।

'আমার জন্যে নিষেধ নাকি?' জানতে চাইলেন হাশমি।

'হ্যাঁ।'

হাশমির গলা থেকে ছোট্ট, কর্কশ একটা হাসি বেরুল। 'খুদা কে লিয়ে, কিঁউ?' পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেলেন তিনি, ভাবলেন কিছু, তারপর শান্ত সুরে বললেন, 'আমি লোকজনের সঙ্গে মারপিট করছিলাম। মারপিট করছিলাম···কেন? ভেতরে পড়বার জন্যে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ।'

'ঠিক, তবে ওরা আমাকে বাধা দেয়–!' নাক দিয়ে সশব্দে নিশ্বাস ছাড়লেন হাশমি। 'আমি বোধহয় প্রাণে বেঁচে গেছি। কৃতিত্বটা কার, আপনার?'

মাথা নাড়ল রানা। উৎসাহ দিয়ে বলল, 'ভুলগুলো এখন আরও দ্রুত দেখতে

পাচ্ছেন।'

হঠাৎ উদ্বিগ্ন হলেন হাশমি। 'কাউকে জখম করেছি?'

'স্রেফ দু'একটা ঘুসি মেরেছেন। তেমন কিছু না।'

'না, মানে, ওরা আমাকে ছাড়ছিল না···আল্লাহ, আমার সব চিন্তা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে!'

'আগের চেয়ে এখন অনেক ভালো,' বলল রানা। 'আপনার চিন্তা-ভাবনায় ধীরে ধীরে গুছানো ভাবটা ফিরে আসছে। মাথার সামনের দিকটায় আর কী আছে বলুন তো?'

চোখ বুজলেন হাশমি। বন্ধ পাতার ভিতর কোন নড়াচড়া নেই। তারপর খুললেন ওগুলো। 'স্টার ওঅর সিরিজের একটা ফিল্ম দেখেছিলাম, নামটা এখন আর মনে নেই। সায়েন্স ফিকশন হলেও বেশ অদ্ভুত লেগেছিল। সিনেমার শেষটা এরকম—সমস্ত কিছু ছেড়ে শুধু সামনে ছুটে চলা। শুধু আমি আর মহাশূন্য। কোন অর্থ নেই, কিছু নেই—বুঝতে পারছেন?'

'হ্যাঁ, ছবিটা আমিও দেখেছি।' রানার আবছাভাবে মনে পড়ছে, কোথায় যেন শুনেছিল ওরকম অনুভূতি হয় একটা বিশেষ ড্রাগ নিলে।

'ঠিক ওই রকম।'

রানা জানতে চাইল, 'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

প্রশ্নটা নিয়ে চিন্তা করলেন হাশমি। তারপর মাথা নাড়লেন। 'বলতে পারব না। হবে কোথাও!'

'কোত্থেকে?'

'কে জানে কোত্থেকে।' হঠাৎ নিঃশব্দে একটু হাসলেন হাশমি। 'ক্যাম্প নেতাজি থেকে, কি বলেন? শুনুন, মিস্টার জয়, আমার একটা উপকার করবেন, প্লিজ?'

'যদি সম্ভব হয়।'

'আমাকে কিছু প্রশ্ন করুন। আমার সম্পর্কে। জানতে চাই ঠিক কতটা পাগল আমি।'

প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর খুব সহজে আর দ্রুত দিয়ে গেলেন হাশমি। পরিষ্কার মনে আছে কোথায় জন্মেছেন, লেখাপড়া শিখেছেন বা চাকরি করেছেন। ব্যক্তিগত সমস্ত তথ্য নিখুঁতভাবে সাজানো আছে মগজে, যখন যেটা দরকার চাওয়া মাত্র বেরিয়ে আসছে। এই সাফল্য তাঁর মনে বিরাট স্বস্তি এনে দিল।

কুইজের পালা শেষ হতে হাশমি জানতে চাইলেন, 'জ্যাকেটটা আপনি খুলবেন না, না?'

'না। দুঃখিত।'

'আপনি লোক ভালো না, জানেন তো? খুলে দিলেও কোন সমস্যা হত না মুখে যাই বলুন, হাশমি রাগ করেননি।

তাঁকে খানিকক্ষণ একা থাকতে দিয়ে ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা। চেম্বারে ঢুকে পায়চারি শুরু করল। ড্রাগটার নাম মনে পড়ে গেছে ওর। এলএসডি।

রানা জানে যে এলএসডি এক ধরনের অ্যাসিড। বলা হয় এই ড্রাগের কল্যাণে মানুষ স্বাদের আওয়াজ শুনতে পায়, ঘ্রাণ নিতে পারে শব্দের।

এলএসডির নেশায় বুঁদ এক লোক সুস্থ হওয়ার পর একান্ত সাক্ষাৎকারে একটা পত্রিকাকে বলেছিল, সে অনায়াসে উড়তে পারবে এরকম একটা নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে দশতলার জানালা দিয়ে লাফ…

জাভেদ হাশমি দশতলা থেকে লাফ দেননি বটে, তবে যা করতে যাচ্ছিলেন সেটা আরও অনেক বেশি মারাত্মক।

আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল রানার। কৌশল জানা থাকলে আর প্রয়োজনীয় উপাদান পেলে যে-কোন কেমিস্ট্রির ছাত্র তার স্কুল লাইব্রেরিতেই এলএসডি তৈরি করতে পারবে। উপাদানের কথা বলতে পারবে না ও, তবে নেতাজি ক্যাম্পে ল্যাবরেটরি আছে একাধিক।

এরপরই রঙের কথা মনে পড়ে গেল ওর। এলএসডি হ্যালুসিনেশনের আরেকটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, চোখ ধাঁধানো রঙের বাহার।

রানাকে বিছানার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে গম্ভীর মুখে তাকালেন হাশমি। 'কালকের কথা কতটুকু মনে আছে আপনার?'

'কাল কখনকার কথা?'

'যখন ব্যাপারটা ঘটল। কাল সকালে। মনে পড়ে?'

ভাবছেন হাশমি। 'হ্যাঁ, মনে পড়ে।'

'বলুন।'

'সারারাত কাজ করি আমরা, তারপর এক মগ কফি খেয়ে খালি একটা কটে আধ ঘণ্টার জন্যে শুই। মাঝে মধ্যে এরকম করি আমি। যাই হোক, তারপরই…' ভুরু কুঁচকে চুপ করে গেলেন।

'বলুন!' নরম সুরে তাগাদা দিল রানা।

'আমি ঠিক নিশ্চিত নই। আমার ধারণা…হ্যাঁ, ধুলোর আইডিয়াটা তখনই মাথায় আসে। তারপর আমি বেরিয়ে আসি আর দেখতেও পাই। কাজেই ওই ধুলো পরিষ্কার করতে গেলাম। আর…'

বাধা দিল রানা। 'মগের কফি। কোত্থেকে এল ওটা?'

'ওখানে আমাদের একটা মেশিন আছে, সারাক্ষণ আগুন হয়ে থাকে।'

'আর চিনি? আপনি চিনি নিলেন?'

'চিনি থাকে আমার ডেস্কে। কেন?'

'শুধু জবাব দিয়ে যান।' রানাকে সিরিয়াস দেখাচ্ছে।

'ছোট একটা বাক্সে চিনি ভর্তি কাগজের ব্যাগ আছে।'

'বাক্সটা খুলে ওপরের ব্যাগটা নেন, তারপর মগে ঢেলে চামচ দিয়ে নাড়েন, তাই তো?'

'আরে, নাড়ব না!'

'ব্যাপারটা চিন্তা করুন,' বলল রানা। 'কফিতে চিনি নাড়লেন, তারপর সেটা খেয়ে শুয়ে পড়লেন। এর একটু পরই শুরু হলো আপনার হ্যালুসিনেশনের পালা. ধুলো দিয়ে তৈরি বোল্ডার আর চামড়া আছে এমন ইস্পাত দেখলেন, আরও

দেখলেন চোখ ধাঁধানো রঙের খেলা। এ-সব থেকে কী বোঝা যায়?'

রানার দিকে চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকলেন হাশমি। 'পাগলদের ক্লাবে স্বাগতম।'

'আমার প্রশ্নের জবাব দিন,' তাগাদা দিল রানা। 'কী মনে হয়?'

কী মনে হয় বললেন হাশমি। রানা একটা উন্মাদ, কারণ এ অসম্ভব, নেতাজি ক্যাম্পের কারও পক্ষে এমন উদ্ভট কাজ করা সম্ভব নয়।

'কেমন উদ্ভট কাজ?'

'এই যেমন আমার কফিতে অ্যাসিড ঢালা।'

'আপনার চিনিতে,' বলল রানা। 'আমার ধারণা চিনিই হলো আদর্শ মাধ্যম।'

পরবর্তী কয়েক মুহূর্তে হাশমির চোখে-মুখে কয়েক ধরনের ভাব ফুটল আর মুছে গেল। টিকল শেষেরটা, সেটা স্বস্তির। তিনি বললেন, 'বলিনি, আমি ঠিক হয়ে যাব? এখন ব্যাপারটা মিস্টার যাদবকে জানাতে হবে।'

'এত তাড়াতাড়ি নয়,' বলল রানা।

'কেন?' হাশমি খুব অবাক হয়েছেন।

'কারণ তিনি বিশ্বাস করবেন না।'

'কর্নেল যাদব? আমাকে? অবশ্যই বিশ্বাস করবেন। আমাকে তিনি চেনেন।'

'শুনুন, আপনি যখন ভায়োলেন্ট হয়ে উঠেছিলেন, মিস্টার যাদব দৃশ্যটা দেখেছেন। আপনার নাক যদি এখনও ব্যথা করে, সেজন্যে তাঁর মস্ত থাবার থাবড়াই দায়ী।'

'দূর, ঠাট্টা করবেন না তো! মিস্টার যাদবকে আমি আজ থেকে চিনি না।'

মাথা নাড়ল রানা। 'রিয়্যাক্টর সম্পর্কে চুক্তির কথাটা কাল আমাকে বলেছেন উনি। এরইমধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে তাঁর, ওটার ধারেকাছেও ঘেঁষতে দেয়া হবে না আপনাকে। কাজেই যা বলছি শুনুন, তাঁকে এখনই কিছু জানাবার দরকার নেই।'

'যা খুশি বলুন আপনি,' হাশমি বললেন, 'তারপরও আমি মিস্টার যাদবের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

অগত্যা রাজি হলো রানা। 'ঠিক আছে, কমান্ড অফিসে ফোন করছি।'

মেজর লালু ভাই ফালকে রানাকে জানাল, কর্নেল ওখানে নেই; তৌফিক আজিজের খোঁজে যে-সব সার্চ পার্টি বেরিয়েছে তাদের কাজ তদারক করতে গিয়ে প্রতিটি হাটে দু'বার করে নিজেও তল্লাশি চালাচ্ছেন তিনি।

মেজরকে একটা মেসেজ দিল রানা, কর্নেলকে পৌঁছে দিতে হবে–জাভেদ হাশমি জেগে আছেন, ক্যাম্প কমান্ডারের সঙ্গে দেখা করতে চান।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘুরল রানা, দেখল এরইমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন হাশমি।

অবশেষে, এতক্ষণে, রেডিও রুম থেকে ফিরল রফিক। প্রথমে সে ওয়ার্ডে একটা চক্কর দিল, দেখে এল তার আহত রোগীরা কে কেমন আছে।

তারপর ক্যাবিনে ঢুকে রানাকে জানাল, রেডিও লিঙ্ক খুব দুর্বল হওয়ায় সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোককে সমস্যাটা বুঝিয়ে বলতে তার অনেক সময় লেগেছে।

সব শুনে রফিকের গ্রহণ করা ব্যবস্থা অনুমোদন করেছেন তিনি। ঘুমের অন্য একটা ওষুধের নাম জানিয়েছেন, প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। তবে জোর দিয়ে বলেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেইস হসপিটালে পাঠিয়ে দিতে হবে রোগীকে।

'এখন কোন ওষুধ দরকার নেই,' বলল রানা। 'উনি ঘুমাচ্ছেন।'

মাথা ঝাঁকাল রফিক। খুব ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত লাগছে তাকে।

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল রানা। 'তুমি কিছু খেয়ে আসছ না কেন?'

সামান্য একটু উজ্জ্বল হলো চেহারা, 'ধন্যবাদ,' বলে লাঞ্চ খেতে চলে গেল রফিক।

রানার আন্দাজ করবার কোন উপায় নেই যে এরই মধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে—একা শুধু রফিকের জন্য নয়, আরও বহু লোকের জন্য।

পাঁচ

রফিক চলে যাওয়ার খানিক পর পেটে মোচড় অনুভব করল রানা, সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। কিন্তু ব্যাপারটার গুরুত্ব কমে গেল হাশমির কথা ভেবে, প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা হলো তাঁর পেটে নিরেট কিছু পড়েনি।

রানার জানমতে, হসপিটালে খাবার পাঠানোর কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। উপবাস থাকতে না চাইলে কিছু একটা করা দরকার।

চেম্বারে চলে এসে ইন্টারকমের রিসিভার তুলে কিচেনের নম্বরে ডায়াল করল ও। অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে, কিন্তু কেউ ধরছে না।

যোগাযোগ কেটে দিয়ে আবার ডায়াল করল রানা। তারপরও কোন কাজ হচ্ছে না। এরপর কমান্ড হাটে ফোন করল ও, ভাবল মেজর ফালকেকে একটা ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাবে। একই অবস্থা, ওখানেও কেউ রিসিভার তুলছে না।

এটা অদ্ভুত, কারণ কমান্ড হাটে রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা লোক থাকে।

তারপর, মাত্র কয়েক মিনিট কেটেছে, চেম্বারের দরজা খুলে গেল—দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে খোদ মেজর ফালকে। টলছে সে, ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, মুখের চামড়া পোড়া বেগুনের মত, ভাঁজ করা দুই হাত দিয়ে পেটের নীচের দিকটা শক্ত করে চেপে ধরে আছে।

কিছু বলতে গেল ফালকে, কিন্তু গলার গভীরে আটকে গেল তার কথা, খানিকটা ঘুরে গিয়ে অনর্গল বমি করল দরজার বাইরে।

তার কাছে পৌঁছাতে মাত্র দু'সেকেন্ড লাগল রানার। ফালকে থামাতে পারছে না, বমি করেই চলেছে; তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করছে ও।

এভাবে একটানা পাঁচ মিনিট চলার পর মনে হলো এবার বন্ধ হবে। রানাকে ধরে সোজা হতে যাচ্ছে ফালকে, আবার ফিরে এল ঝোঁকটা।

পেটে যা ছিল আগেই সব বেরিয়ে গেছে, এবার যেন নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে

আসতে চাইছে।

ফালকে গোঙাচ্ছে, কাতরাচ্ছে, বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে, শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় অনবরত ঝাঁকি খাচ্ছে।

আরও তিন মিনিট পর একটু শান্ত হলো সে। তবে কথা বলতে চেষ্টা করে এবারও ব্যর্থ হলো, তার গলার সমস্ত পেশি আর শিরা জ্যান্ত প্রাণীর মত মোচড় খেয়ে শব্দগুলোকে ভিতরে থাকতেই আটকে দিচ্ছে।

চারবারের চেষ্টায় কোন রকমে শুধু বলতে পারল, 'ফুড পয়জনিং।'

'ভেতরে আসুন,' বলল রানা। 'আগে শুয়ে পড়ুন, তারপর…'

'আমি একা নই,' বাতাসের অভাবে হাঁপিয়ে উঠল ফালকে। 'কিচেন…ক্যাম্পের অর্ধেক…আল্লাহ্র কসম লাগে, ভাই…খুলে দেখুন…ডাক্তারের বইতে!' তারপর আবার বমি শুরু করল, হাঁটু গেড়ে নিচু হলো দোরগোড়ায়।

পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের ভিতর কাটল। প্রায় আশিজন লোক আক্রান্ত। একেক সময় মনে হলো, গোটা ক্যাম্পের সব লোকই প্রচণ্ড পেটব্যথা, বমি আর ডায়ারিয়া নিয়ে বরফের উপর ঢলে পড়ছে।

থিউলে ডাক্তার আছে, কিন্তু তাদের পরামর্শ চাওয়ার কোন উপায় নেই, কারণ রেডিও যোগাযোগ আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

নিজেদের চেষ্টায় যতটুকু পারা যায় করছে ওরা। রোগীর মুখে স্যালাইন ভর্তি মগ ধরছে, পাঁজাকোলা করে তুলে এনে হসপিটালের বেডে শোয়াচ্ছে, কম্বল টেনে গা ঢেকে দিচ্ছে। ডাক্তারি বইতে লেখা আছে রোগীকে গরম রাখতে হবে, অথচ হসপিটালে হট ওয়াটার বটল আছেই মাত্র চারটে।

গরম পানি রাখা যায় এমন যা কিছু পাওয়া গেল সব ভরে বিলি করা হলো।

কারও স্পষ্ট কোন ধারণা নেই রোগটা আসলে কী। একমাত্র যে হয়তো বলতে পারত সে-ই মেডিক রফিকও রোগীদের একজন। তার অবস্থা খুব খারাপ দেখল রানা। ওরা এমনকী এ-ও জানে না যে এই চিকিৎসা পদ্ধতি সঠিক হচ্ছে কি না।

সন্ধ্যার দিকে তিনজন মারা গেল। আরও অনেকের অবস্থা মুমূর্ষু, দেখাশোনা করছে বন্ধু-বান্ধবরা। তবে ইতিমধ্যে রেডিও আবার কাজ শুরু করায় থিউলের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে।

বটুলিনাস অ্যান্টিটক্সিন-এর জন্য ডিসপেনসারিতে হানা দিল ওরা। সন্দেহ নেই অনেক মানুষকে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনল ওটা। রানা ভাবল, ডাক্তার হাসান থাকলে আরও অনেককে বাঁচানো সম্ভব হত।

ওর ঠিক খেয়াল নেই কর্নেল যাদবের খবরটা কখন পেয়েছে। বিকেলটা প্রচণ্ড ব্যস্ততা আর উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে, সম্ভবত তখনই কেউ একজন এসে জানিয়ে গেছে ক্যাম্প কমান্ডারও আক্রান্ত। হসপিটালে নয়, হাটেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। লোকটাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করা হয়নি।

পরে গুজব রটে গেল যে কর্নেল যাদব আর ডক্টর হারুন হাবিব মারা গেছে।

সন্ধ্যার বেশ কিছু পরে আসল খবর পাওয়া গেল। কর্নেল যাদব বা ডক্টর হাবিব, দু'জনের কেউই মারা যায়নি, তবে কর্নেলকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি

চলছে।

ডক্টর হারুন সম্পর্কে বলা হলো, অফিসার্স মেসে কয়েকজন অফিসারকে অ্যান্টিটক্সিন ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় বমি আর ডায়েরিয়া শুরু হয় তার, তবে সে একটা প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন নিয়ে রেখেছিল বলে এ-যাত্রায় বোধহয় বেঁচে যাবে।

রাত কাটছে ভয়ানক আতঙ্কে। ওষুধটা অনেকের বেলাতেই ঠিকমত কাজ করছে না। নতুন রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আটটার দিকে দেখা গেল হসপিটালের জেনারেল ওয়ার্ডে লাশের স্তূপ তৈরি হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে রানা জানল, ইতিমধ্যে আরও আটজন মারা গেছে।

রাত ন'টার দিকে থিউল থেকে খবর এল, দু'জন ডাক্তার স্বেচ্ছায় প্যারাশুট নিয়ে নেতাজি ক্যাম্পের কাছাকাছি নামতে রাজি হয়েছেন।

কিন্তু এদিক থেকে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করা হলো। সারফেসে আবহাওয়ার অবস্থা খুবই খারাপ। ঝড়টা এখন ঘণ্টায় একশো মাইল। তাপমাত্রা শূন্যাঙ্কের ত্রিশ ডিগ্রি নীচে। সাহসী দুই বাঙালী ভদ্রলোক লাফ দেবেন স্রেফ মরার জন্য।

রাত আটটার কিছু পরে ইঞ্জিনিয়ার হাশমিকে দুটো স্লিপিং ট্যাবলেট খেতে দিয়েছিল রানা। ভেবেছিল অসহায় অবস্থায় বিছানায় শুয়ে লাশ নিয়ে যাওয়া দেখার চেয়ে বরং আরও খানিক ঘুমান।

ওষুধে কাজ হলো, তবে খুব বেশিক্ষণ নয়। মাত্র দু'ঘণ্টা পরই দেখা গেল চোখ মেলে কী যেন চিন্তা করছেন।

তাঁর বেডের পাশে বসে চকলেটের একটা বার আর কফি খাচ্ছিল রানা, হাশমি বললেন, 'আপনার মনে হচ্ছে না গোটা ব্যাপারটা কারও শয়তানী?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকাল রানা। কিচেন, মেস হল, স্টোররুম থেকে শুরু করে ক্যাম্পের ফুড ট্রেঞ্চ পর্যন্ত পরীক্ষা করেছে ও; জেরা করেছে কুক, ওয়েটার আর তাদের সহকারীদের; কিন্তু সন্দেহ করার মত কিছু পায়নি। 'কী করে সম্ভব?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল ও। 'বিশেষ করে এত বড় স্কেলে?'

হাশমি ধীরে ধীরে বললেন, 'বাড়িতে সবাই আমরা ফ্রিজ ব্যবহার করি, কিন্তু একটা সহজ কথা অনেকেই জানি না। এই না জানাটা মর্মান্তিক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। সেটা হলো, নরম করে আবার শক্ত করাটা বিপজ্জনক।'

'ঠিক কী বলতে চাইছেন?'

'বলতে চাইছি যে এখানে সবকিছুই ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে আছে। মানে, বেশিরভাগ খাবার জিনিসই। বিশেষ করে, মাংস। আপনার কোন ধারণা আছে, ব্রেকফাস্টে কি খেয়েছিল ওরা?'

'আমি যতদূর জানি, সকালে প্রায় প্রতিদিনই খাসির মাংস পরিবেশন করা হয়,' বলল রানা। 'ওদের মধ্যে অনেকেরই লাঞ্চের ঠিক আগে বমি পেয়েছে। ভালো কথা, আপনার কেমন লাগছে?'

'খিদেতে মরে যাচ্ছি, তবে এখন সহ্য করতে পারব।'

'ওটা ছাড়া?'

'ভালো আছি। অন্তত কোন সমস্যা নেই। মাথাব্যথাটা ছেড়ে গেছে। জিনিসটা যা-ই হোক, এলএসডি বা অন্য কিছু, তার প্রভাব কেটে গেছে।'

'ভেরি গুড।'

হাশমির ঠোঁটের কোণে শ্লেষাত্মক একটু হাসি দেখা গেল। 'তবে আপনি এবার এই স্ট্রেইটজ্যাকেট থেকে হয় আমাকে মুক্তি দিন, তা না হলে নিজেকে নার্সের পদে নিয়োগ দিয়ে বটল আর বেডপ্যান নিয়ে আসুন।'

রানা এত ক্লান্ত যে তর্ক করবার শক্তি নেই। বেডের দিকে ঝুঁকে স্ট্রেইটজ্যাকেটের স্ট্র্যাপ খুলতে শুরু করল।

কয়েক মিনিট পর দেখা গেল বেডের পাশে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হাশমি, ক্র্যাম্প ধরা পেশি ঢিল করবার জন্য আড়মোড়া ভাঙছেন।

ইচ্ছে করেই তাঁর দিকে পিছন ফিরল রানা। হামলা করলে এখনই করুন। ধীরে ধীরে দশ পর্যন্ত গুণল ও, তারপর ঘুরল তাঁর দিকে। বেডরেইল ধরে আপনমনে ব্যায়াম করছেন হাশমি।

'কাজটা কীভাবে করা সম্ভব বলছি আপনাকে,' বললেন তিনি। 'আপনি ফুড ট্রেঞ্চে গেছেন তো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'খাবার, বিশেষ করে মাংস, স্লো ট্রেনে করে এখানে আনা হয়। তারও অনেক আগে ওটাকে জমিয়ে বরফ করা হয়েছে। একশো মাইল আইসক্যাপ পাড়ি দেয়ার সময়ও নিরেট পাথরের মত ছিল। এখানে নিয়ে আসার পর ট্রেঞ্চে ঝোলানো হয় ওই অবস্থায়। প্রকৃতি মায়ের কৃতিত্ব, কোন কালেও পচন ধরবে না।'

'একটু সংক্ষেপে বললে ভালো হয়।'

'পচন ধরবে না, অথচ আমাদের ক্যাম্পে খুব বড় মাত্রায় ফুড পয়জনিং ছড়িয়ে পড়ল। কেন? এর সহজ উত্তর হলো–কেউ একজন ফুড ট্রেঞ্চ থেকে খাসির দুটো রান বের করেছে।'

'বলে যান।'

'বের করে কী করেছে? গরম কোন জায়গায় বেশ কিছু সময় ফেলে রেখেছে, যাতে ওগুলোয় জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে। তারপর আবার জায়গামত রেখে এসেছে দিন কয়েকের জন্যে। এই একই কাজ হয়তো আরও একবার করেছে সে। তারপর রান দুটো সরিয়ে এনে মাংস ভর্তি র‍্যাকের সামনের দিকটায় রাখতে হয়েছে। বাকিটা কল্পনা করে নিন।'

'মাংস আনার জন্যে কিচেন থেকে লোক গেছে ওখানে,' বলল রানা। 'সকালের জন্যে ব্রেকফাস্ট তৈরি করা হবে। সামনে থাকায় ওই রান জোড়াই এনেছে সে। আর ওগুলোর মাংস খেয়েই ফুড পয়জন…'

'দ্যাট'স রাইট!'

আশি-নব্বুইজন লোকের ভোগান্তির কথা ভাবছে রানা। এগারোটা তাজা প্রাণ অকালে ঝরিয়ে দেওয়া হলো। শুরু থেকে ধরলে সংখ্যাটা বোধহয় উনিশে পৌঁছে গেছে। কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে।

'কী ভাবছেন? ব্যাপারটা মিলছে না?' জিজ্ঞেস করলেন হাশমি।

উত্তরে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তারমানে মিলছে? বেশ, বুঝিয়ে দিন কীভাবে মিলছে।' দৃষ্টিতে প্রায় চ্যালেঞ্জ

ফুটিয়ে তুলে আহ্বান জানালেন হাশমি। 'কে সেই পাষাণ, এরকম নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটাতেও দ্বিধা করছে না?'

'আপনি আসলে জানতে চান, এ-ধরনের কাজ কেন করছে সে,' বলল রানা। সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল ও–ডক্টর ওসমান ফারুকের মহামূল্য আবিষ্কার ক্যাম্পের কেউ একজন চুরি করে লুকিয়ে রেখেছে; নিজের অপরাধ গোপন রাখতে আর আবিষ্কারটা বের করে সরিয়ে ফেলতে হলে তার এখন নেতাজি ক্যাম্প খালি করা দরকার।

'প্রয়োজনে সবাইকে খুন করে হলেও?' রানা থামতে বিড় বিড় করলেন হাশমি।

'হ্যাঁ।'

'লোকটা বদ্ধ উন্মাদ!'

'উন্মাদ বলছেন কেন? বলুন স্মার্ট, চতুর শ্বেতাঙ্গদের পা-চাটা কুকুর, বিশ্বাসঘাতক,' মন্তব্য করল রানা। 'অথচ দেখে হয়তো মনে হচ্ছে বোকাটে, বদমেজাজি, ড্রাগ অ্যাডিক্টেড।'

'তাকে তো তা হলে এবার ধরতে হয়, মিস্টার জয়।'

'এবার কেন, অনেক আগে থেকেই তাকে আমি ধরতে চেষ্টা করছি,' বলল রানা। 'কিন্তু পারা যাচ্ছে না।'

'মিস্টার জয়, আমাকে আপনি ওয়াটসন হিসেবে সঙ্গে রাখুন,' প্রস্তাব দিলেন হাশমি। 'তারপর আসুন কোমর বেঁধে নামি। লোকটা কিছু লুকিয়ে রেখেছে, তাই না? কিছু লুকিয়ে রাখার জন্যে এরকম আদর্শ জায়গা আর আছে কি না সন্দেহ। প্রতি শীতে সতেরো ফুট তুষার। সব ঢেকে দেবে।'

'না। শুধু কোন জিনিস বোধহয় নয়। হয়তো কোন অপরাধও। এমন কিছু, প্রকাশ হয়ে গেলে তার জন্যে মহা বিপদ ডেকে আনবে।'

'বেশ। এবার চলুন, কাজ শুরু করি।'

'কোত্থেকে?'

'বলছি–' তবে বলা হলো না হাশমির, অন্তত তখনই নয়, কারণ ওদের আলোচনায় বাদ সাধা হলো।

ক্যাবিনের দরজা খুলে গেল। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, চব্বিশ কি পঁচিশ বছর বয়েসী একজন ক্যাপটেন ভিতরে ঢুকে ঘোষণা দেওয়ার ভঙ্গিতে জানাল, তার সিনিয়র অফিসাররা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পের অস্থায়ী কমান্ডার হিসাবে কাজ চালাতে বলা হয়েছে তাকে।

নাম ঘনশ্যাম তিওয়ারি। রানা চেনে, অফিসার্স ক্লাবে দু'একটা কথাও বলেছে। তাকে খানিকটা ভোঁতা, চুপচাপ আর গম্ভীর বলে মনে হয়েছে ওর।

হাশমি জিজ্ঞেস করলেন, 'কর্নেল কেমন আছেন?' তাঁর গলার নীরস ভাবটাই বলে দিল ক্যাপটেন তিওয়ারিকে তিনি পছন্দ করেন না।

'কর্নেল যাদব অত্যন্ত অসুস্থ,' বলল তিওয়ারি। 'কখনও হুঁশ থাকছে, কখনও থাকছে না। তবে, আমার সঙ্গে তাঁর দু'চারটে কথা হয়েছে। আমার এই সাময়িক কমান্ড গ্রহণের ব্যাপারটা তিনি অনুমোদন করেছেন।' রানাকে একবার বাঁকা

চোখে দেখে নিয়ে আবার হাশমির দিকে তাকাল সে। 'আমার ধারণা ছিল, মিস্টার হাশমি, আপনাকে স্ট্র্যাপ দিয়ে...'

'হ্যাঁ।'

'কার হুকুমে মুক্ত করা হয়েছে আপনাকে?'

রানা বলল, 'ওগুলো আমি খুলে দিয়েছি। মিস্টার হাশমি এখন পুরোপুরি সুস্থ।'

'আপনি কি ডিগ্রিধারী সাইকিয়াট্রিস্ট, মিস্টার...ইয়ে-?'

'বিজয় হাসান,' বলল রানা, তারপর স্মিত একটু হাসল। 'মিস্টার হাশমি সুস্থ কি না বোঝার জন্যে সাইকিয়াট্রিস্ট হবার প্রয়োজন নেই। ওঁকে দেখে আপনার কী মনে হচ্ছে?'

ক্যাপটেন তিওয়ারি তার লম্বা নাক বরাবর রানার দিকে তাকাল। 'স্ট্রেইটজ্যাকেট পরাবার হুকুমটা ছিল স্বয়ং কমান্ডারের, সেটা প্রত্যাহারও করা হয়নি। একজন মানুষ, গতকালই যিনি কী না পাগলামি করছিলেন, তাঁকে আপনি...'

'বেশ তো, হুকুমটা আপনি প্রত্যাহার করে নিন।'

মাথা নাড়ল ক্যাপটেন তিওয়ারি। 'আমি চাই কমান্ডারের হুকুম বহাল থাকুক।'

হাশমির কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাস, 'আপনি আবার আমাকে ওই জ্যাকেটে ঢোকাতে চান?'

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকাল তিওয়ারি, তারপর বলল, 'উপায় নেই, ওটাই আপনার জন্যে প্রেসক্রাইব করা হয়েছিল।'

রানা বলল, 'আপনি বোকার মত কথা বলছেন।'

তিওয়ারি বলল, 'প্রয়োজন হলে ফোন করে সাহায্য চাইব আমি। শক্তি প্রয়োগের কোন ইচ্ছেই আমার নেই, কিন্তু পরিস্থিতি যদি আমাকে বাধ্য করে...'

'একটা সমস্যা আছে,' বললেন হাশমি, কণ্ঠস্বর থেকে বিদ্রূপ ঝরে পড়ল। 'এই স্ট্রেইটজ্যাকেটগুলো রেইনকোটের মত নয়, যে পরবে সে নিজে ওটা বাঁধতে পারবে না।'

'বেঁধে দেবেন মিস্টার জয়। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আপনার সমস্ত দায়িত্বও তাঁকে বহন করতে হবে। শুধু তাই নয়, কমান্ডারের অনুমতি না নিয়ে এই হসপিটাল আর নিজের হাট ছাড়া অন্য কোথাও যেতে পারবেন না তিনি।'

'কী বললে ব্যাখ্যা করো,' সম্বোধন পাল্টে জিজ্ঞেস করল রানা, রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বালা করছে। 'তোমার নির্দেশ মত চলতে হবে আমাকে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই...'

'কী করে তা সম্ভব?' জানতে চাইল রানা। 'আমি একজন ডিআইজি, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল। পদ আর মর্যাদায় কর্নেল যাদবের প্রায় সমান। আর তুমি কী?'

বুক ফোলাতে গিয়ে শিরদাঁড়া প্রায় ধনুকের মত বাঁকা করে ফেলল তিওয়ারি। 'আপনার পদমর্যাদা আমি অস্বীকার করছি না,' বলল সে। 'কিন্তু প্রদত্ত ক্ষমতাবলে

সামান্য ক্যাপটেনই এখন এই ক্যাম্পের কমান্ডিং অফিসার। আমার হুকুম মত চলতে আপনি বাধ্য।'

'কই, লিখিত অর্ডারটা দেখাও,' বলে একটা হাত লম্বা করল রানা। 'দেখতে চাই তোমার মত একটা গাড়লকে কে দিল ক্ষমতাটা।'

ওর বাড়ানো হাতটার দিকে বোকার মত এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল তিওয়ারি। 'লিখিত অর্ডার? কর্নেল যাদব গুরুতর অসুস্থ, তিনি লিখিত দেবেন কীভাবে?'

'হুকুম ফলাতে চাইলে লিখিত অর্ডার আনতে হবে,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'তা না হলে, ফের যদি বেয়াদবি করো, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে...'

'কী!' চেঁচিয়ে উঠল ক্যাপটেন। 'এত বড় কথা! আপনাকে আমি দেখে নেব, মিস্টার ডি-আই-জি!' শেষ শব্দ তিনটে চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল তিওয়ারি।

'ভালো চাও তো এখনই ভাগো, তিওয়ারি,' বলল রানা। 'তা না হলে কিন্তু স্ট্রেচারে উঠে ফিরতে হবে।'

'আমার লোকজনকে এখনই আমি অর্ডার করছি, বাইরে কোথাও আপনাকে দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করতে হবে,' হিসহিস করে বলল ক্যাপটেন, তারপর ঝট করে হাশমির দিকে তাকাল। 'স্ট্রেইটজ্যাকেটের ভেতর না পেলে আপনাকেও!' বন করে আধপাক ঘুরল, গটগট করে বেরিয়ে গেল ক্যাবিন থেকে।

হাশমির দিকে তাকাল রানা। 'আপনাকে এত পছন্দ করার কারণ?'

হাশমির ঠোঁটের কোণে শয়তানী ভরা হাসি। 'বুদ্ধি কম, তাস খেলায় কোনদিন জিততে পারে না। হয়তো সেজন্যে প্রমোশনও পাচ্ছে না।'

'আপনার কাছে কি অনেক টাকা হেরেছে?'

'ও ব্যাটার অনেক টাকা থাকলে তো! বলতে যাচ্ছিলাম কোত্থেকে কাজ শুরু করব, মনে আছে?'

'কোত্থেকে?'

'এখান থেকে। মেডিকেল রেকর্ডস।'

'চিন্তাটা আমার মাথাতেও এসেছিল,' বলল রানা, 'কিন্তু সবগুলো ফাইলিং কেবিনেটে তালা দেয়া।'

'তালা থাকলে তার চাবিও আছে।'

কিন্তু অনেক খুঁজেও চাবির হদিশ পাওয়া গেল না।

রানা বলল, 'চাবিগুলো সম্ভবত ডাক্তার হাসানের সঙ্গেই থাকত। এ-ও ধরে নেয়া চলে যে ব্যক্তিগত সমস্ত জিনিস তাঁর শরীর থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আর এ-সব রাখার নির্দিষ্ট একটা জায়গা থাকে।'

'কর্নেল যাদবের একটা সেফ আছে,' বললেন হাশমি।

'সেটা খুলতেও আরেকটা চাবি লাগবে।'

'তাতে কী,' বলে মাথা ঝাঁকিয়ে হসপিটাল ওয়ার্ডটা দেখালেন হাশমি। 'মেজর ফালকে আছেন ওখানে।'

'মেজর ফালকে,' বলল রানা, 'অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন।'

'তাতে কী? তিনি বলতে পারবেন সেফের চাবি কোথায় পাওয়া যাবে। মেজর

ফালকে এমন একজন মানুষ, ক্যাম্পের সব খবর তাঁর জানা।'

'শুধু জানা নেই কে এ-সব করছে।'

ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এসে ওয়ার্ডে ঢুকল ওরা। বদ্ধ বাতাসে ঘাম আর বমির দুর্গন্ধ।

মালদ্বীপের দু'জন তরুণ নার্সকে পাওয়া গেল, স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করছে, রোগীদের মতই অসুস্থ। হাশমি তাদের একজনকে বললেন, 'আধ ঘণ্টা ছুটি নাও, বাছা। ততক্ষণ আমরা দেখছি।'

কৃতজ্ঞ দেখাল তরুণটিকে, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে চশমা পরা বন্ধুকে নিয়ে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে মেজর ফালকের বেডের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রানা। তার অবস্থা ভালো বলে মনে হলো না। গায়ের চামড়া এখনও পোড়া বেগুনের মত লাগছে। ঘাম হওয়ায় চকচক করছে মুখটা। আধ বোজা চোখে ঝিমাচ্ছে সে।

রানার ইচ্ছে হলো না এরকম অসুস্থ একজন মানুষের ঘুম ভাঙায়। কিন্তু ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েই হাশমি ফালকের কাঁধ ধরে ধীরে ধীরে ঝাঁকাতে শুরু করলেন। 'আরে, ভাই, এটা কি অসুস্থ হবার সময় হলো? চোখ মেলুন তো!'

এক মুহূর্ত পর তাকাল মেজর ফালকে। চোখ মিটমিট করল সে, তারপর মৃদু শব্দে গুঙিয়ে উঠল।

'কথা বলতে পারবেন?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন হাশমি।

আবার চোখ মিটমিট করল ফালকে। এমন কষ্ট করে ঢোক গিলল, বোঝাই যায় বমি আটকাবার চেষ্টা করছে। নিস্তেজ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সে, তাকিয়ে আছে রানার দিকে। তারপর বিড় বিড় করে বলল, 'মিস্টার জয়, আপনি আমাকে সময় মত স্যালাইন খেতে না দিলে এতক্ষণে আমি মরে যেতাম।'

'ঋণ শোধ না করে মরবেন না, প্লিজ,' কৌতুক করে বললেন হাশমি।

'বলুন কী করতে হবে,' দুর্বল গলায় জানতে চাইল ফালকে।

ইঙ্গিতে রানাকে শুরু করতে বলে একপাশে সরে গেলেন হাশমি।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তার হাসানের লাশের সঙ্গে ব্যক্তিগত যে-সব জিনিস ছিল, সেগুলো কোথায় রাখা হয়েছে?'

ফালকের চোখ ছানাবড়া। 'মানে? ওগুলো আপনার কী দরকার?'

ওয়ার্ডের চারদিকে চোখ বুলাল রানা। বেডের সব লোক যে ঘুমাচ্ছে, তা নয়। অনেকেই পেটব্যথায় কাতরাচ্ছে, কেউ বা শেষনিঃশ্বাস ফেলবার আগে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। তবে চাদর মুড়ি দিয়ে নিঃসাড় পড়ে থাকা লোকগুলো সবাই ঘুমাচ্ছে, নাকি এরইমধ্যে মারা গেছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বিশেষ করে প্রকাণ্ড আকারের লোমশ আর মাংসল একটা কালো পা মেঝের কাছাকাছি ঝুলে আছে দেখে সন্দেহটা জাগল ওর মনে।

'কী হলো? বলবেন না কী দরকার?'

সংবিৎ ফিরে পেল রানা, গলা খাদে নামিয়ে বলল, 'সেই হেলিকপ্টার অ্যাক্সিডেন্ট থেকে ধরুন। রত্নে গোপালচন্দ্রের নিখোঁজ হওয়া, রানওয়ের আলো নেভানো, তথাকথিত শ্বেতভালুকের ফুয়েল ট্যাংক ছেঁড়া, ডাক্তার হাসানের মৃত্যু,

রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চে কয়েন ফেলা, পানি দূষণ, পোলক্যাটের ফুয়েল গজে কারিগরি ফলানো, আমার হাটে ফোমের ধোঁয়া তৈরি করা, ইঞ্জিনিয়ার তৌফিক আজিজকে গায়েব করে দেয়া, এমনকী এই ফুড পয়জনিঙের ঘটনা–সবই একজন বেঈমান লোকের কাজ বলে আমার ধারণা।'

'আপনার–' আবার ঢোক গিলল মেজর ফালকে– 'আপনার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ আছে, মিস্টার জয়?'

'আমার কাছে আছে,' রানার পাশ থেকে বললেন হাশমি। 'আমি হ্যালুসিনেশনের শিকার হয়েছি, এলএসডি নিলে ঠিক যেমনটি হবার কথা। কেউ একজন আমার চিনিতে মিশিয়ে রেখেছিল।'

'বলেন কী!'

'যেগুলোকে অ্যাক্সিডেন্ট বলা হচ্ছে সেগুলো সংখ্যায় এত বেশি যে মেনে নেয়া সম্ভব নয়,' বললেন হাশমি। 'সবকিছুর ব্যাখ্যা পেতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে তাকে। আমরা মেডিক্যাল রিপোর্টগুলো দেখতে চাই, কিন্তু ফাইলগুলো সব তালার ভেতর।'

'হ্যালুসিনেশন,' বিড়বিড় করল মেজর ফালকে, তারপর ঘাড় বাঁকা করে রানার দিকে তাকাল। 'ব্যাপারটা আপনিও দেখেছেন··· গতকাল।'

'কী দেখেছি?'

'কর্নেল যাদবকে। সকালের দিকে। তিনি–' আবার একটা সন্দেহজনক ঢোক গিলল ফালকে– 'অদ্ভুত আচরণ করছিলেন। মনে নেই, বলপয়েন্ট কলম নিয়ে?'

ফালকের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ব্যাপারটা ভোলেনি ও। 'হ্যাঁ, মনে আছে, তাঁকেও সম্ভবত এলএসডি খাওয়ানো হয়েছিল। তবে কম মাত্রায়।'

মেজর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, খানিক চেষ্টা করে উঠে বসল বেডে। পেটের ভিতরটা সারাক্ষণ মোচড়াচ্ছে, তা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করল সে।

রাতে কোনদিনই ভালো ঘুম হয় না কর্নেল যাদবের, হলেও খুব ভোরে তা ভেঙে যায়, তাই বেডের পাশে এক ফ্লাস্ক কফি রাখেন তিনি। কাল গভীর রাতেও হয়তো তাঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, দু'ঢোক কফি খেয়ে আবার ঘুমিয়েছেন।

'তারমানে,' বললেন হাশমি, 'সকালের মধ্যে জিনিসটার প্রভাব এমনিতেই কমে এসেছিল।'

'হ্যাঁ,' বলে বেড থেকে মেঝেতে পা নামিয়ে দিল ফালকে।

'উঁহুঁ,' বাধা দিল রানা, 'বিছানা থেকে আপনার নামা চলবে না।'

দুর্বলভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ফালকে। 'কমান্ড অফিস থেকে চাবির গোছাটা এনে দিই। আপনারা খুঁজে পাবেন না।'

'এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কোথাও আপনাকে যেতে হবে না।' মাথা নাড়লেন হাশমি।

'আরে, আমি পারব।' আরেকটা ঢোক গিলল ফালকে। 'আগের চেয়ে এখন আমি ভালো আছি। তা ছাড়া, আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, প্রাণভিক্ষা পাওয়ায় দু'মিনিটের জন্যে মন্দিরে একবার যেতে চাই।'

হাশমির দিকে তাকাল রানা। দু'জনের কেউই ওরা ফালকেকে যেতে দিতে

চাইছে না। কিন্তু ওদের কথায় কান না দিয়ে বেড থেকে নেমে পড়ল সে, টলমলে পায়ে এদিক-ওদিক হেঁটে দেখাল ওদেরকে। 'কই, পড়ে যাচ্ছি?'

অগত্যা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, হাশমির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মেজর ফালককে পারকা আর বুট পরতে সাহায্য করল রানা। তারপর তাকে ওরা দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

ফালকে চলে যাচ্ছে, পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'ডাক্তার হাসানের সঙ্গে যে-সব জিনিস পাওয়া গেছে। ওগুলো এখন কোথায়?'

ঘুরল মেজর ফালকে। 'সব এখনও তাঁর শরীরে। লাশ তো ঠিক বলা যায় না…কী অবস্থা দেখেছেনই তো। তাই আমরা আর ঘাঁটাঘাঁটি করিনি।'

এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধ চাপড়ে দিলেন হাশমি। 'শুনুন, তাড়াহুড়োর দরকার নেই।'

'ঠিক আছে।' চোখ-মুখ কোঁচকাতে দেখে সন্দেহ হলো আবার বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়ছে ফালকে। তবে না, নিজেকে দ্রুতই সামলে নিতে পারল সে। 'ভাবছি শরীরে কুলালে কর্নেল যাদবকে একবার দেখে আসব।'

'না,' মানা করল রানা। 'কেন?'

'তাঁর তো ধারণা এখানে যা কিছু ঘটছে সবই অ্যাক্সিডেন্ট,' বলল ফালকে। 'আমি হয়তো তাঁকে বোঝাতে পারতাম।'

'মনে হয় না।'

ধাপ দুটো পার হলো ফালকে, ট্রেঞ্চ ধরে ধীর পায়ে এগোল। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, যতক্ষণ না মেইন স্ট্রিটে পৌঁছে কমান্ড হাটের দিকে বাঁক নিল সে।

মেজর ফালকে না ফেরা পর্যন্ত কিছু করবার নেই ওদের।

পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রায় স্পষ্টই একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে জাভেদ হাশমিকে, ফলে সম্ভাব্য কালপ্রিট কে হতে পারে তা নিয়ে রানার সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন তিনি।

নেতাজি ক্যাম্প সম্পর্কে রানার চেয়ে অনেক বেশি জানেন হাশমি, কিন্তু তিনিও কারও দিকে আঙুল তুলে বলতে পারছেন না ওই লোকটাকে তাঁর সন্দেহ হয়। তবে তাঁর কাছ থেকে কর্নেল যাদব সম্পর্কে নতুন একটা তথ্য পেল রানা।

দশ বছর আগে ভারতীয় সেনাবাহিনী তাঁর নেতৃত্বে ছ'জনের একটা টিম পাঠিয়েছিল অ্যান্টার্কটিকায়। শীতকালটা বড় একটা ভাসমান বরফ খণ্ডের উপর কাটায় তারা। সেখানেও একের পর এক বিভিন্ন ধরনের বিপদ দেখা দিয়েছিল।

যেমন–এক লোক ভাসমান বরফের কিনারা থেকে ঠাণ্ডা পানিতে পড়ে যায়, শক-এ মৃত্যু হয় তার; আরেকজন মারা যায় অ্যাপেনডিক্স বিস্ফোরিত হওয়ায়; তারপর কীভাবে যেন হাটে আগুন লেগে যায়।

কর্নেল যাদব এসওএস পাঠান, ফলে রিসার্চের কাজ শেষ না হওয়া সত্ত্বেও অবশিষ্ট পাঁচজনকে প্রচুর টাকা খরচ করে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয় ভারতীয় সেনাবাহিনী।

পরে তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, কর্নেল যাদব এসওএস না পাঠালেও পারতেন; লিডার হিসাবে তিনি যথেষ্ট ধৈর্য আর কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দেননি।

এই ঘটনার পর আবার কর্মকর্তাদের সুনজরে আসতে কয়েক বছর সময় লেগে যায় ভীম সিং যাদবের।

'তবে,' সব শুনে বলল রানা, 'হারানো সুনাম নিশ্চয়ই তিনি ফিরে পেয়েছিলেন, তাই না? তা না হলে নেতাজি ক্যাম্পের দায়িত্ব দিয়ে এখানে তাঁকে পাঠানো হত না।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। তবে ব্যাপারটা তাঁর রেকর্ডে আছে, আর তিনি সেটা জানেনও। কাজেই, আঙুলের ফাঁক গলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যেতে দেখলেও সহজে স্বীকার করবেন বলে মনে হয় না।'

সময় যেন কাটতে চাইছে না। হাশমির ক্যাবিনে বসে পর পর দু'মগ কফি খেয়েও দূর হচ্ছে না ক্লান্তি। রানার চোখ জোড়া বুজে আসছে...হঠাৎ, তন্দ্রার মধ্যে, বিশালা কালমুনাইয়ের চেহারাটা ভেসে উঠল বন্ধ চোখের পাতায়।

চোখ খুলে গেল রানার, এক পলকে সজাগ হয়ে উঠেছে প্রতিটি ইন্দ্রিয়। অবচেতন মন সূত্রটা ধরিয়ে দেওয়ার পর বাকিটা স্মরণ করতে সময় লাগল না।

কর্নেল যাদবের সঙ্গে প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা আগে কথা হয়েছিল রানার, সকালে কালমুনাইকে জেরা করার ব্যবস্থা করে দেবেন তিনি। সেই সকাল পার হয়ে আরেক সকাল চলে আসছে, কিন্তু নানা উদ্বেগ আর উত্তেজনার ভিতর তার কথা একবারও মনে পড়েনি ওর। ডক্টর ওসমান ফারুকের ল্যাবে, একটা কামরার ভিতর, আহত অবস্থায় বন্দি করে রাখা হয়েছে তাকে।

এখন যখন মনে পড়েছে, রানার সন্দেহ হলো–মাত্র পাঁচ কি ছ'মিনিট আগে কালমুনাইকে দেখেছে ও। দেখেছে এই হসপিটাল ওয়ার্ডের ভিতরই।

কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব?

ছয়

ক্যাবিন থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল রানা, কিছু না বুঝে ওর পিছু নিয়ে বেরিয়ে এলেন হাশমিও। ওয়ার্ড ধরে ছুটছেন দু'জন। মেজর ফালকের খালি বেডটাকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা।

ইতিমধ্যে মালদ্বীপের সে-ই দুই তরুণ স্বেচ্ছাসেবক ডিউটিতে ফিরে এসেছে আবার। 'আপনারা!' বিস্মিত হয়ে ওদের পিছু নিল তাদের একজন।

কোনদিকে না তাকিয়ে সরাসরি একটা বেডের পাশে এসে দাঁড়াল রানা। বেডে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে একজন লোক। লোকটা যে প্রকাণ্ডদেহী, সেটা পরিষ্কারই বোঝা যায় মেঝের কাছাকাছি ঝুলে থাকা তার বিরাট পা দেখে। সেটা যেমন লোমশ তেমনি মাংসল।

হাত বাড়িয়ে রোগীর মুখ থেকে চাদরটা সরাল রানা। সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের রক্ত ছলকে উঠল।

কালমুনাইয়ের চেহারা ক্ষত-বিক্ষত হলেও, মুখের ভাব শান্ত, যেন আরাম করে ঘুমাচ্ছে। চোহারার লাবণ্য এতটুকু ম্লান হয়নি। গায়ের শার্টে এখনও শুধু শুকনো রক্ত লেগে রয়েছে। বমি করেছে, এমন কোন লক্ষণ চোখে পড়ছে না। আর যাই হোক, এটা ফুড পয়জনিং-এর কেস নয়।

রানা তার পালস দেখল। নেই।

কালমুনাইয়ের গলার কাছে শার্টের বোতাম লাগানো দেখে আবার হাত বাড়াল রানা। বোতাম খুলতেই গলা আর ঘাড়ের লাল দাগটা বেরিয়ে পড়ল। সরু তার পেঁচিয়ে, দম বন্ধ করে মারা হয়েছে তাকে।

সেই ধুরন্ধর শয়তান আবার আঘাত হেনেছে।

'কী ঘটনা, আমাকে বলবেন না?' পাশ থেকে জানতে চাইলেন হাশমি।

কালমুনাই আসলে কে, কী তার অপরাধ, কোথায় তাকে আটকে রাখা হয়েছিল, সংক্ষেপে সবই তাঁকে জানাল রানা।

শুনে মাথা নাড়লেন হাশমি। 'এটা ফুড পয়জনিঙের কেস নয়,' বললেন তিনি। 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আপনার চতুর শয়তান আরেকটা ছোবল মেরেছে।'

'সেরকমই মনে হচ্ছে,' বলে স্বেচ্ছাসেবক তরুণের দিকে ফিরল রানা, ইঙ্গিতে কালমুনাইয়ের লাশ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই রোগী সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?'

'একজন সিপাই বলল, বোধহয় হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। বন্ধ কামরার ভেতর একা ছিল, কেউ নাকি দেখেনি কীভাবে মারা গেছে।'

'লাশটা কখন আনা হয় ওয়ার্ডে? কারা এনেছিল?'

'এই তো, সন্ধ্যার খানিক পর,' জবাব দিল তরুণ। 'দু'জন সিপাই স্ট্রেচারে করে এনেছিল। সঙ্গে আরও দু'জন ছিল।'

'কারা তারা?'

'মুখ চিনি, কমিউনিকেশন হাটের লোক। কিন্তু নামও জানি না, পরিচয়ও নেই।'

রানা চিন্তিত। তার কারণও আছে। কালমুনাইকে জেরা করবার ব্যাপারে অযথা ওকে দেরি করিয়ে দিচ্ছিলেন কর্নেল যাদব, তাই খুঁতখুঁতে মনের তাগিদে কুমারাতুঙ্গা আর উপলকে দায়িত্ব দিয়েছিল, তারা যেন দূর থেকে ডক্টর ফারুকের ল্যাবরেটরির উপর নজর রাখে।

কালমুনাইয়ের সঙ্গে আসা লোক দু'জন নিশ্চয় তারাই হবে। কিন্তু কালমুনাই অসুস্থ, তাকে হসপিটালে আনা হয়েছে, এই খবরটা তারা দেবে না ওকে?

'তোমার সঙ্গী হয়তো চিনবে তাদের,' বলল ও।

'চিনতে পারে, তাদের সঙ্গে ওকে আমি কথা বলতে দেখেছি।' ঘুরে

ফিরতি পথ ধরল তরুণ, এইমাত্র আসা কয়েকজন রোগীকে নিয়ে ব্যস্ত সঙ্গীর দিকে এগোল।

তিন মিনিট পর চশমা পরা দ্বিতীয় তরুণকেও একই প্রশ্ন করা হলো। মাথা ঝাঁকাল সে, অর্থাৎ কালমুনাইয়ের সঙ্গে আসা কমিউনিকেশন হাটের লোক দু'জনকে চেনে সে।

'তারা কি শ্রীলঙ্কান, উপলচন্দ্র আর কুমারাতুঙ্গা?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ।' দ্বিতীয় তরুণের বিষণ্ণ দৃষ্টি খানিক আগে নিয়ে আসা কয়েকজন রোগীর উপর থেকে ঘুরে এল। বেডের অভাব, তাই ওয়ার্ডের শেষ মাথায় মেঝেতে শুইয়ে রাখা হয়েছে তাদের।

'তুমি ঠিক জানো?'

দ্বিতীয় তরুণ তাকিয়ে থাকল রানার দিকে, চোখে পলক পড়ছে না। তারপর ধৈর্য হারাবার ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি জানি আপনি কাদের কথা জানতে চাইছেন। আসুন আমার সঙ্গে।' ঘুরে ওয়ার্ডের শেষ মাথার দিকে এগোল সে। 'এই মাত্র তারা ফিরে এসেছেন...'

হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গেছে রানা। বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছে। তরুণ স্বেচ্ছাসেবকের পিছু নিল যেন একটা রোবট। খুব খারাপ কিছু আশঙ্কা করছে ও।

মেঝেতে শুয়ে থাকা উপল আর কুমারাতুঙ্গাকে দেখল রানা, তবে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল না।

যেন কোন জাদুবলে ওদের আকার আর রঙ বদলে গেছে। ফুলে কমপক্ষে দ্বিগুণ হয়ে গেছে তাদের মুখ আর শরীর, হাত ও পা ফোলা বেলুনের মত দেখাচ্ছে। ত্বক টকটকে লাল। আর সব রোগীদের চাদর বা কম্বল দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এদের দু'জনের গায়ে কিছু নেই।

রানা স্তম্ভিত। চোখ বুজে মেঝেতে পড়ে আছে দু'জন, কোন রকম নড়াচড়া নেই, যেন পরম শান্তিতে ঘুমাচ্ছে তারা।

'কী হয়েছে এদের?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রানা।

'যে সিপাইরা পৌঁছে দিয়ে গেল তারা বলল যে দু'জনকে দু'জায়গায় পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিয়ে এসেছে,' জানাল তরুণ স্বেচ্ছাসেবক। 'রত্নে উপলচন্দ্রের জ্ঞান ছিল তখনও। তবে মাত্র দুটো কথা বলতে পারলেন। প্রথমে বললেন, "ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলছে"। তারপর বললেন, "রেডিওটা নিয়ে গেল"। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলছে? কিন্তু তিনি জবাব দিতে পারলেন না, তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।'

'কুমারা—?'

মাথা নাড়ল তরুণ। 'তাঁর জ্ঞান ছিল না, একটু পরই মারা যান তিনি।'

কিছু একটা সন্দেহ হতে কুমারার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। এত কাছ থেকে দেখছে বলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেল ওর চোখে। লাশের লাল হয়ে থাকা ত্বকে অতি সূক্ষ্ম বেগুনি দাগ ফুটে আছে।

আরও ভালো করে তাকাতে বোঝা গেল, ওগুলো আসলে দাগ নয়।

কুমারার মাংস আর চর্বি বেগুনি হয়ে গেছে, লাল চামড়া ফেটে ফাঁক হয়ে যাওয়ায় সেগুলোকেই দাগ বলে মনে হচ্ছে।

একটু সরে বসে এরপর উপলকে পরীক্ষা করল রানা, তবে তাকেও ছুঁলো না। উপলেরও একই অবস্থা, চামড়া ফেটে যাওয়ায় ভিতরের বেগুনি মাংস আর চর্বি দেখা যাচ্ছে।

কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে উপলের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। শুধু যে শরীর ফুলে উঠেছে, তা নয়, ভিতর থেকে শিরাগুলোও ফুটে আছে চামড়ার উপর। বিশেষ করে গলা আর ঘাড়ের সবগুলো শিরা দেখতে পাচ্ছে ও। একটাও লাফাচ্ছে না।

ওর পাশে বসলেন হাশমিও, হাত বাড়িয়ে ছুঁতে গেলেন রোগীকে।

'না!' প্রায় আঁতকে উঠল রানা, এক ঝটকায় তাঁর হাতটা সরিয়ে দিল।

'কী হলো?' হাশমি হকচকিয়ে গেছেন।

'উপল ঠিকই ধরতে পেরেছেন, ওদেরকে ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে,' বলল রানা, সিধে হয়ে দাঁড়াল। 'ওই ইঞ্জেকশনে মারাত্মক কোন ভাইরাস ছিল।' তরুণ স্বেচ্ছাসেবকের দিকে ফিরল ও। 'লাশগুলো এখনই বডি ব্যাগে ভরে পুঁতে ফেলতে হবে। তা না হলে, ভাইরাসটা যদি ছোঁয়াচে হয়, একজনও আমরা বাঁচব না।'

হাঁ করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ছেলেটা। তারপর বিড়বিড় করে জানতে চাইল, 'আপনি বুঝলেন কীভাবে যে উপল মারা গেছেন?'

'তোমার চশমাটা দাও,' বলে তরুণ স্বেচ্ছাসেবকের নাক থেকে চশমাটা খুলে নিল রানা, তারপর আবার হাঁটু গাড়ল ওয়ার্ডের মেঝেতে।

আঙুল দিয়ে শুধু ডাঁটি ধরে আছে রানা, একটা গ্লাস অত্যন্ত সাবধানে উপলের স্থির নাকের সামনে নিয়ে গেল, খেয়াল রাখছে চশমাটা যাতে উপলকে স্পর্শ না করে।

পনেরো সেকেন্ড পর সিধে হলো ও। গ্লাসটা দেখাল তরুণকে। 'কাঁচে কোন বাষ্প জমেনি। তারমানে উপল নিঃশ্বাস ফেলছেন না।' তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ও। 'ফুড পয়জনিঙে যারা মারা গেছে, তাদের লাশ কোথায় রাখা হয়েছে?'

'ওদিকে।' স্বেচ্ছসেবক অন্যমনস্ক।

'ওদিকে কোথায়? কপ্টার অ্যাক্সিডেন্টে যারা মারা গেছেন তাঁদেরকে যেখানে রাখা হয়েছে? নাকি সারফেসে কোথাও?'

রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে মাথা নাড়ল তরুণ। 'যে ভয়ঙ্কর আবহাওয়া, কার এত সাহস যে সারফেসে উঠবে! ক্যাম্পের ভেতরই একটা গর্ত খুঁড়ে পুঁতছে সিপাইরা।'

'এদেরকে আলাদা একটা গর্তে পুঁততে বলবে,' নির্দেশ দিল রানা। 'পোস্ট মর্টেম করার প্রয়োজন হলে সহজেই যাতে তোলা যায়।'

'জী, ঠিক আছে, মিস্টার জয়।' মাথা ঝাঁকাল তরুণ, চশমার ফ্রেমের উপর দিয়ে দেখছে রানাকে।

'আমরা সামনের কেবিনটায় আছি,' বলল রানা। 'কোন সমস্যা হলে জানিয়ো।'

'ঠিক আছে।'

ক্যাবিনে ফিরে এসে নিজের বেডে শুয়ে পড়লেন জাভেদ হাশমি। 'খুব টায়ার্ড ফিল করছি।'

'আমাকে একবার আমার হাটে যেতে হবে,' দোরগোড়া থেকে বলল রানা। 'এখনই ফিরে আসব।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

কথা রাখল রানা, দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল।

'কী, সত্যি রেডিওটা চুরি হয়েছে?' ওকে দেখেই জানতে চাইলেন হাশমি।

দুটো মগে কফি ঢালল রানা, একটা বাড়িয়ে ধরল হাশমির দিকে। 'হ্যাঁ। বিছানার মাথার কাছে রেখে এসেছিলাম। নেই।'

'কে নিয়েছে...মানে, কাউকে সন্দেহ করেন?'

মাথা নাড়ল রানা।

'কি ঘটেছে, আন্দাজও করতে পারছেন না?'

'তা পারছি।' রানা চিন্তিত, কথা বলল ধীরে ধীরে। উপল আর কুমারাকে অনুরোধ করা হয়েছিল সম্ভব হলে তারা যেন কালমুনাইয়ের উপর নজর রাখে। নিশ্চয় আড়াল থেকেই কাজটা করছিল তারা। হঠাৎ দেখতে পায় এক লোক ডক্টর ফারুকের ল্যাবে ঢুকছে। খানিক পর তাকে সম্ভবত বেরিয়ে আসতেও দেখে।

স্বভাবতই ওদের মনে প্রশ্ন জাগে, গোপনে ল্যাবে ঢুকে কী করল লোকটা?

এরপর নিশ্চয়ই কৌতূহল মেটাতে কারও কাছ থেকে ল্যাবের চাবি সংগ্রহ করে ওরা, এবং কয়েকজন সিপাইকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখে বিশালা কালমুনাই মারা গেছে।

তবে ওরা বোধহয় বুঝতে পারেনি কালমুনাইয়ের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, নাকি ব্যাপারটা হত্যাকাণ্ড।

'আমরা এখন জানি কালমুনাইকে খুন করা হয়েছে। ওই লোকটা কে, চুপি চুপি ল্যাবে ঢুকেছিল? সে-ই তো খুনি?' রানা দম নিচ্ছে, এই ফাঁকে জানতে চাইলেন হাশমি।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল রানা। 'সময়টা সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা না থাকায়, সন্দেহের তালিকা থেকে কাউকেই আমরা বাদ দিতে পারছি না।'

'আমি আপনার সঙ্গে ছিলাম,' সকৌতুকে হলেও, প্রয়োজনের চেয়ে একটু যেন তাড়াতাড়ি কথাটা বললেন হাশমি। সেটা ধরতে পেরে নার্ভাস একটু হাসলেনও।

'তা ছিলেন, কিন্তু আপনার সহকারী কোথায় ছিল তা কি আমি জানি?'

এবার বেশ জোরেই হেসে উঠলেন হাশমি।

আবার শুরু করল রানা, নিজের ধারণা ব্যাখ্যা করছে। উপল আর কুমারা ল্যাবে যাকে ঢুকতে দেখেছে সে হয়তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন মানুষ, ক্যাম্পের সবাই তাকে সমীহ করে চলে, কিংবা হয়তো ভয়ও পায়। তাই তার বিরুদ্ধে তখনই কারও কাছে অভিযোগ করতে সাহস পায়নি ওরা।

তা ছাড়া, অভিযোগ করার কোন যুক্তিও তখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি, কারণ কালমুনাই কীভাবে মারা গেছে সে-সম্পর্কে ওদের কোন ধারণা ছিল না। ওরা সিদ্ধান্ত নেয়, লোকটার উপর নজর রাখবে।

সম্ভবত এই নজর রাখতে গিয়েই রানার হাট থেকে লোকটাকে রেডিও চুরি করতে দেখে ফেলে ওরা। সেই সঙ্গে অপরাধীর চোখে ধরাও পড়ে যায়। বাকিটা পানির মত সহজ।

'কী রকম?' রানা থামতেই জানতে চাইলেন হাশমি।

'ফুড পয়জনিং ঠেকাতে গোটা ক্যাম্প জুড়েই তো অ্যান্টিটক্সিন ইঞ্জেকশন দেয়া চলছিল। আমি তো সাধারণ সিপাইদেরও দেখেছি সামনে যাকে পাচ্ছে তাকে ধরেই সুই ফোটাচ্ছে। একটু কল্পনার সাহায্য নিন–অত্যন্ত ব্যস্ত কোন সিপাইয়ের হাতে ভাইরাস ভর্তি দুটো হাইপডারমিক সিরিঞ্জ ধরিয়ে দিল অপরাধী, দূরে দাঁড়িয়ে থাকা উপল আর কুমারাকে দেখিয়ে বলল, ওদেরকে ইঞ্জেকশন দিয়ে এসো।'

'এ-ধরনের কিছুই ঘটেছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে রানার সঙ্গে একমত হলেন হাশমি।

হাতঘড়ির উপর একবার চোখ বুলিয়ে খোলা দরজার দিকে তাকাল রানা, তারপর হাশমিকে মনে করিয়ে দিল, 'মেজর ফালকে অনেক বেশি সময় নিচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, খুব চিন্তা হচ্ছে আমার।'

আরও কিছুটা সময় কাটল। দু'বার দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে ট্রেঞ্চটা দেখে এল রানা, মনে আশা মেজর ফালকেকে হেঁটে আসতে দেখবে। কিন্তু না, তার দেখা নেই।

আরও দশ মিনিট পর দেখা গেল কয়েকজন সিপাই ডিউটিতে ফিরে আসছে। রানা ভাবল, দেরি হওয়ার কারণ জানিয়ে নিশ্চয়ই ওদের হাতে কোন মেসেজ পাঠিয়েছে ফালকে। ওয়ার্ডে বেরিয়ে এলে তাদের সঙ্গে কথা বলল ও।

কোন মেসেজ নেই। সিপাইরা কমান্ড হাট থেকে আসছে না, কাজেই মেজর ফালকেকে তারা দেখেওনি।

রানা আর হাশমি উদ্বেগে অস্থির। মেজর ফালকের না ফিরে আসবার সম্ভাব্য তিনটে কারণ দেখতে পাচ্ছে ওরা। পথে কোথাও অজ্ঞান হয়ে পড়ায় তার চিকিৎসা চলছে; অজ্ঞান হয়ে কোথাও পড়ে আছে, আশপাশে এমন কেউ নেই যে তার দেখাশোনা করবে; কিংবা–এই ভয়টাই বেশি জাগছে দু'জনের মনে–আক্রমণ করা হয়েছে তাকে, হয়তো মেরেই ফেলা হয়েছে।

হঠাৎ পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম জ্যান্ত হয়ে উঠল। দেয়ালের সঙ্গে ব্রাকেটে আটকানো স্পিকার থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপটেন ঘনশ্যাম তিওয়ারির

কর্কশ কণ্ঠস্বর, শুনে মনে হলো যেন একজন ফিল্ড মার্শাল কথা বলছেনঃ

'অনিবার্য কারণবশত ক্যাম্প নেতাজিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া ক্যাম্পের ভেতর ঘোরাফেরা বা হাঁটাচলা করা সম্পূর্ণ নিষেধ। এই নিষেধাজ্ঞা যদি কেউ অমান্য করে, তাকে জরিমানা সহ গৃহবন্দি করা হতে পারে। পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। ঘোষণাটি শেষ হলো।'

বিছানা থেকে নামলেন হাশমি। পায়চারি শুরু করলেন। 'শালা!' দাঁতে দাঁত চাপলেন তিনি। 'যেন শুধু আমাদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে ঘোষণাটা ব্রডকাস্ট করল।'

আরও পাঁচ মিনিট পার হলো। ইতিমধ্যে ক্যাবিন ছেড়ে ওয়ার্ডে বেরিয়ে এসেছে ওরা।

'কিছু একটা করা দরকার,' বলে দেয়ালের দিকে এগোল রানা। ব্রাকেট থেকে ওয়াল স্পিকার নামিয়ে বোতামে চাপ দিয়ে অ্যাড্রেস সিস্টেম চালু করল, তারপর মুখের সামনে মাইকটা তুলে বলল, 'মেজর লালু ভাই ফালকে, আপনি ইমিডিয়েটলি হসপিটালে রিপোর্ট করুন।' মেসেজটা পুনরাবৃত্তি করে সিস্টেমটা বন্ধ করে দিল ও।

'তাঁর অন্তত শুনতে পাবার কথা,' রানার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন হাশমি।

'শোনার অবস্থায় যদি থাকেন।'

'হ্যাঁ।' একটা চেয়ার টেনে এনে ধপাস করে তাতে বসলেন হাশমি, আঙুল দিয়ে ওটার হাতলে ড্রাম বাজাচ্ছেন। তাকিয়ে আছেন নাক বরাবর সামনে, কপালের চামড়া কুঁচকে রেখেছেন। এক মুহূর্ত পর বললেন, 'একটা ব্যাপার প্রথম থেকেই আমাকে বিরক্ত করছে।'

'বলে যান, আমি শুনছি।'

'পানি। পানিতে দূষণ। সে কারণেই তো রিয়্যাক্টর বন্ধ করতে হলো। কিন্তু এই ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢোকেনি। শুনুন, সাধারণত আমরা ডিস্টিলড্ ওয়াটার ব্যবহার করি, কারণ রিয়্যাক্টরের বেলায় কোন রকম দূষণের ঝুঁকি নেয়া চলে না।

'তবে তুষার গলা পানিও, আসলে, ডিস্টিলড্। সাগর থেকে শুষে ওপরে তোলা হয়েছে ওটা, বাষ্প বা মেঘে পরিণত হয়েছে ওখানে, তারপর তুষার কণা হয়ে ঝরে পড়েছে। কাজেই আইসক্যাপে ডিস্টিলেশনের কোন প্রয়োজন হয় না। আজকাল অবশ্য ধোঁয়া-টোয়া লেগে নতুন তুষার কিছুটা দূষিত হলেও হতে পারে। কিন্তু যে তুষার একশো বা দুশো বছর আগে পড়েছে, সেই তুষারের পানি দূষিত হতে পারে না। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'অথচ হঠাৎ করে পানিটা দূষিত হয়ে গেল।'

'দূষণের পরিমাণ?' জানতে চাইল রানা।

'যথেষ্ট। আপনার কাছ থেকে সব কথা শোনার পর এখন আমার মনে

হচ্ছে, আমাদের ওই মহা ধুরন্ধর বন্ধু কুয়ার ভেতর নিশ্চয় কিছু ফেলেছে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ডক্টর হারুন কুয়ায় নেমেছিল। কিছু পায়নি সে।'

'তাতে কিছু বোঝা যায় না। আপনি ওই কুয়ায় একশো একটা জিনিস নিঃশেষে হারিয়ে ফেলতে পারবেন। কেমিক্যাল সল্ট, ক্লিনিং ফ্লুইড, মেটাল ডাস্ট—এরকম আরও বহু কিছু ফেলুন, জিনিসটা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে বা মিলিয়ে যাবে যে কারও চোখে কিছুই ধরা পড়বে না। জিনিসটাকে আলাদা করতে হলে আপনার আসলে সত্যিকার ভালো মানের একটা ল্যাব দরকার।'

রানা বলল, 'কুয়ার মাথা তো খোলাই থাকে। কিছু ফেলা কোন সমস্যা নয়। কিন্তু ক'জন লোক জানে যে এত সহজে একটা রিয়্যাক্টরকে অচল করে দেয়া যায়?'

কাঁধ ঝাঁকালেন হাশমি। 'যে-কেউ জানতে পারে। রিয়্যাক্টরে যারা কাজ করছে তারা সবাই জানে। আরও নিশ্চয় বহু লোক জানবে।'

'আমি জানতাম না।'

একটু বাঁকা চোখে রানার দিকে তাকালেন হাশমি। 'আপনি ম্যানুয়েলটা পড়েননি।'

'আমাদের বন্ধু হয়তো পড়েছে। কোথায় সেটা?'

'সব জায়গায় পাওয়া যায়। ক্যাম্প লাইব্রেরিতেও কয়েকটা কপি আছে।'

এখনও মেজর ফালকের কোন খবর নেই। কী করা যায় ভাবছে ওরা। এই সময় আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম।

ক্যাপটেন তিওয়ারির কণ্ঠস্বর এবার আরও যেন কর্কশ। 'নেতাজি ক্যাম্পের অ্যাকটিং কমান্ডার বলছি,' এভাবে শুরু করল সে, তারপর ঝড়ের বেগে নিজের বক্তব্য রাখল।

গোটা ক্যাম্প প্রচণ্ডভাবে নোংরা আর আগোছাল হয়ে আছে, কাজেই ধুয়ে-মুছে সব পরিষ্কার করা দরকার। এখনই শুরু হচ্ছে কাজ, খালি প্রতিটি হাট জীবাণু-মুক্ত এবং ভালো মত পরিষ্কার করবার পর অসুস্থ লোকজনকে সেখানে বদলি করা হবে।

কাল সকালে মেইন স্ট্রিটে শুরু হবে ইন্সপেকশন প্যারেড। আর্মি হোক আর সিভিলিয়ান, সবাই যেন পরিচ্ছন্ন হয়ে ধোপদুরস্ত কাপড়চোপড় পরে উপস্থিত হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

'আর সময় পেল না!' বলল রানা। 'লোকজন না তিওয়ারির বিরুদ্ধে খেপে ওঠে।'

একদিকের ভুরু উঁচু করে রানার দিকে তাকালেন হাশমি। 'তা হয়তো খেপবে না, তবে চরম বিশৃংখলা দেখা দেবে।'

'অপরাধীর জন্যে ভালো সুযোগ তৈরি হচ্ছে।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালেন হাশমি। 'আমাদের জন্যেও।'

'প্রথম কাজ,' বলল রানা, 'মেজর ফালকেকে খুঁজে বের করা। কিন্তু ভাবছি আপনার কথা, বাইরে ঘোরাফেরা করতে দেখলে তিওয়ারি না ঝামেলা করে।'

হেসে উঠলেন হাশমি। 'আমি কি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য যে ওদের নিয়ম মেনে চলতে হবে আমাকে? তা ছাড়া, এখানে আসার আগে আমার সঙ্গে যে চুক্তিটা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সবাইকে সেটা মেনে চলতে হবে। তাতে অনেক কথার মধ্যে এটাও আছে যে আমার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হাত দেয়া যাবে না।'

হেসে উঠে রানা বলল, 'পাগলের আবার ব্যক্তিস্বাধীনতা কী?'

রিয়্যাক্টর ইঞ্জিনিয়ার জাভেদ হাশমির চোখের তারায় কৌতূহল ঝিক করে উঠল। 'আমার কথা বাদ দিন, মিস্টার জয়,' বললেন তিনি। 'কিন্তু তিওয়ারি নামের উপদ্রবটাকে আপনি কীভাবে এড়াবেন, শুনি?'

'আমি স্রেফ তাকে দেখতে পাব না,' বলল রানা। 'মানে, পুরোপুরি অগ্রাহ্য করব। আমার মনে হয়, তাতেই মেসেজ যা পাবার পেয়ে যাবে সে।'

'ঠিক আছে,' বললেন হাশমি। 'আপনি বেরিয়ে পড়ুন।'

'আর আপনি?'

'দু'জনের একসঙ্গে বেরুনোটা বোধহয় ঠিক হবে না,' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললেন হাশমি। 'আপনি এদিক সেদিক খুঁজে দেখুন। মেজরকে পান বা না পান, তারপর রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চে চলে যাবেন। আমি ওখানে বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছাব। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, তবে জানতে চাইল না দু'জন একসঙ্গে বেরুলে সমস্যাটা কী।

ক্যাবিন থেকে বের করে এনে নিজের পারকা পরছে রানা, বাধা দিলেন হাশমি। 'দাঁড়ান,' বলে ওখান থেকে সরে গেলেন তিনি।

রানা তাঁকে একটা র‍্যাকের দিকে হেঁটে যেতে দেখল। র‍্যাকটায় রোগীদের খুলে রাখা পারকা ঝুলছে। একটা পারকা নিয়ে ফিরে এলেন তিনি। 'এটা পরুন,' ওর হাতে সেটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন। 'ওয়ার্ডে যারা আছে তাদের পারকার দরকার নেই।'

রানা দেখল ব্রেস্ট পকেটের গায়ে, এক ফালি টেপ-এ, যার পারকা তার নাম লেখা রয়েছে–কাপুর। 'কিন্তু কেন?' জিজ্ঞেস করল ও।

'কিছু না, সম্ভাব্য ঝামেলা এড়াবার জন্যে একটু সতর্ক হওয়া আর কী,' বললেন হাশমি। 'তিওয়ারির অনেক চেলাই আপনাকে চেনে না। লেখাটা পড়ে আপনাকে কাপুর মনে করবে।'

ব্যাপারটা বিশেষ পছন্দ না হলেও হাশমির দেওয়া পারকাটাই পরল রানা। তারপর হুডটা মাথায় ভালো করে বসিয়ে মুখটা যতটা সম্ভব লুকাবার জন্য ড্র-স্ট্রিংটা টান টান করল।

টানেলে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করল রানা, তারপর সাবধানে চারদিকে তাকাল। বরফের লম্বা দেয়ালের মাঝখানে খাঁ-খাঁ করছে ট্রেঞ্চ। দৃঢ় পায়ে এগোল ও, মেইন স্ট্রিটে উঠে বাঁক নিল কমান্ড হাটের দিকে। মেজর ফালককে তো খুঁজবেই, কয়েকজন সিপাইকেও জেরা করতে চায় ও।

প্রথমে জানতে হবে কালমুনাইয়ের লাশ হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার সময় উপল আর কুমারার সঙ্গে কারা ছিল। তাদেরকে প্রশ্ন করা সম্ভব হলে অনেক

তথ্য বেরিয়ে আসবে।

পথে কারও সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। আপনমনে মুচকি হেসে রানা ভাবল, সবাই এরইমধ্যে রেজার আর ফার্নিচার পলিশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল নাকি?

কমান্ড ট্রেঞ্চ খুব লম্বা, কোনদিকে বাঁক না ঘুরে বেশ অনেক দূর সোজা হাঁটল রানা, তারপর থামল মন্দিরে ঢুকবার মুখে। মেজর ফালকে বলেছিল মন্দিরে একবার আসবে, পুজো দিতে ভিতরে ঢোকার পর অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো?

কিন্তু না, ফালকে মন্দিরে নেই। এখানে যদি এসেও থাকে সে, চলে গেছে। মন্দির, মসজিদ আর গির্জা পাশাপাশি– তিনটেই খালি পড়ে আছে।

ওগুলোর পাশে এক সারি শাওয়ার স্টল আর বাথরুম, সেগুলোও খালি–সম্ভবত বারো ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম। ওখান থেকে বেরিয়ে আসছে রানা, হন-হন করে হেঁটে এসে ভিতরে ঢুকল তিনজন লোক। নিজেদের গতি আর অস্বস্তি নিয়ে এতই ব্যস্ত তারা যে রানার দিকে তাকাবারও ফুরসত পেল না।

কমান্ড হাটে রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা লোক থাকে। দিনের বেলা বসেন কর্নেল যাদব আর মেজর ফালকে, রাতে বসে ডিউটি অফিসাররা। কিন্তু এই মুহূর্তে কমান্ড হাট খালি। মেজর ফালকে তো নেইই, কোন ডিউটি অফিসারকেও দেখা যাচ্ছে না। অথচ ভিতরের সবগুলো আলো জ্বলছে।

রানা ধারণা করল, ঘোষণা প্রচার করার পর ক্যাপটেন তিওয়ারি সম্ভবত ইন্সপেকশন ট্যুরে বেরিয়েছে। খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক, পরিপাটি থাকতে পছন্দ করে, কাজটায় প্রচুর সময় লাগবে তার। তা ছাড়া, এ-ধরনের কাজে নিশ্চয়ই দলবল নিয়ে বেরুবে সে। অর্থাৎ ধরে নেওয়া চলে আপাতত, অন্তত কয়েকটা মিনিট, কেউ ওকে বিরক্ত করবে না।

কর্নেল যাদবের অফিসে ঢুকল রানা। অন্য কোন কারণে নয়, শুধু নিশ্চিত হওয়ার জন্য। না, খালি কামরা–ভিতরে ফালকে নেই।

লোকটা তা হলে গেল কোথায়? তার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা ছাড়াও এক ধরনের দৃঢ় নিশ্চয়তাদানের ভাব আর আশ্বস্ত বোধ করানোর গুণ দেখেছে রানা, মোটামুটি প্রায় ধরেই নিয়েছিল এখানে তাকে পাবে ও।

হঠাৎ করে কষে গিঁট বাঁধার মত একটা অনুভূতি হলো পেটে। এখানে আসবে বলে হসপিটাল থেকে বেরিয়েছে মেজর ফালকে, চাবির একটা গোছা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার তার ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু তাকে রানা পাশ কাটায়নি, এখানেও সে নেই। তা হলে···

দেয়ালে কী কাবার্ড রয়েছে। সেটা খুলে দ্রুত লেবেলগুলো পড়তে শুরু করল রানা। নীল আর সাদা প্লাস্টিক স্ট্রিপ-এ লেখা রয়েছে– 'মেডিকেল ব্লক ডুপ্লিকেট'। স্ট্রিপ-এর নীচের হুকটা খালি।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল রানা। অন্তত এ-টুকু জানা গেল যে মেজর ফালকে এখানে এসেছিল। পরমুহূর্তে নিজের ধারণা শুধরে নিল ও। হুক খালি থাকার অর্থ মোটেও তা নয়। হয়তো সে এখানে এসেছিল, খুব বেশি হলে

এটুকু ধরে নেওয়া চলে। আর যদি এসে থাকে, চাবি নিয়ে বেরিয়ে যায়, হসপিটালে ফিরে যায়নি কেন?

কাবার্ডের দরজা বন্ধ করে দিল রানা। দরজা দিয়ে বেরুতে যাবে, হঠাৎ করে বাইরের কাঠের ধাপ থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল।

বিদ্যুৎ চমকের মত কয়েকটা প্রশ্ন খেলে গেল ওর মাথায়। কেউ কি ওর পিছু নিয়ে এসেছে, তারপর জায়গাটা নির্জন বুঝতে পেরে হামলা করতে চাইছে? নাকি ক্যাপটেন তিওয়ারি ফিরে এল? মেজর ফালকে নয় তো?

পরে দেখা যাবে কে, চট করে রানা সিদ্ধান্ত নিল—লুকাবে। দরজার পাশেই বইয়ের একটা র‍্যাক, সঁ্যাৎ করে সেটার আড়ালে গা ঢাকা দিল ও। কাঁধের একটু ঘষা খাওয়ায় র‍্যাকটা সামান্য একটু ঝাঁকি খেল।

কাঁপতে কাঁপতে খুলে গেল দরজা। ধীর, ক্লান্ত পায়ে ভিতরে ঢুকল কেউ একজন।

র‍্যাকের সরু ফাঁক দিয়ে তাকাল রানা।

তাকাতেই স্বস্তি বোধ করল, কারণ ভিতরে ঢুকেছে ডক্টর হারুন হাবিব। তার চোখের নীচে কালি জমেছে, গাল দুটো গর্তে বসা, নিঃশ্বাস ফেলছে ঘন ঘন। হাঁটছেও একটু কুঁজো হয়ে। সন্দেহ নেই, ফুড পয়জনিঙে মারা যাওয়ার হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেছে সে।

ঠিক ওই সময় র‍্যাকের একটা বই কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

চমকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল ডক্টর হারুন। 'ঠিক আছে, যে-ই হও, বেরিয়ে এস এখনই,' কঠিন সুরে বলল সে।

সাত

আড়াল থেকে এমন ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল রানা, হারুনের কথা যেন শুনতে পায়নি; র‍্যাক থেকে আগেই একটা বই তুলে নিয়েছিল, সেটার প্রচ্ছদ দেখবার ভান করছে।

'মিস্টার জয়? আপনি?' আকাশ থেকে পড়বার অবস্থা ডক্টর হারুনের। 'আপনি এখানে কী করছেন—?'

বইটা র‍্যাকে রেখে দিয়ে তার দিকে ঘুরল রানা। 'সে প্রশ্ন তো আমিও আপনাকে করতে পারি, ডক্টর হাবিব। আপনি এখানে কী করছেন?'

রানার প্রশ্ন করার ধরন দেখে হেসে ফেলল হারুন। 'সিকিউরিটির লোকজন রোগী আনা-নেয়া আর পরিচ্ছন্নতা অভিযান নিয়ে এত ব্যস্ত যে এখানে ডিউটি দেয়ার মত কাউকে পাওয়া গেল না,' বলল সে। 'তাই ডেস্কে বসার জন্যে আমাকে পাঠানো হয়েছে।'

'ভালোই হয়েছে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।' মাথা ঝাঁকিয়ে তার বক্তব্য মেনে নিল রানা। 'আপনি মেজর ফালকেকে দেখেছেন?' ওর দিকে

একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে হারুন। সে কি ক্যাপটেন তিওয়ারির নির্দেশ সম্পর্কে জানে?

হ্যাঁ, জানে। 'মিস্টার জয়, ক্যাপটেন তিওয়ারি যে বদমেজাজী লোক, আপনার বোধহয় হসপিটাল...'

'ফালকে,' তাকে মনে করিয়ে দিল রানা। 'আপনি তাঁকে দেখেছেন?'

'কেন দেখব না। হসপিটালে আছে সে।'

'না,' বলল রানা। 'প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে হসপিটাল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এখানেই তাঁর আসার কথা। দেরি হচ্ছে দেখে খুঁজতে বেরিয়েছি।'

মাথা ঝাঁকাল হারুন। 'মাইকে শুনেছি আমি। এখানে সে কী করতে এসেছিল?'

'তা বলতে পারব না। জিজ্ঞেস করিনি।'

ডক্টর হারুন বলল, 'মিস্টার জয়, কথাটা বলছি বলে কিছু মনে করবেন না–তাকে আপনার ছাড়াই উচিত হয়নি। ফালকে সিরিয়াসলি অসুস্থ ছিল।'

'জিদও কম ছিল না,' বলল রানা। 'আমার নিষেধ শোনেননি। কিন্তু এখন তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে। ভয় হচ্ছে, জ্ঞান হারিয়ে কোথাও পড়ে নেই তো?'

'ঠিক আছে, মিস্টার জয়।' মাথা ঝাঁকাল ডক্টর হারুন। 'ব্যাপারটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। চারদিকে লোক পাঠাচ্ছি, তারা তাকে ঠিকই খুঁজে বের করে ফেলবে। ভালো হয় আপনি যদি এখন নিজের হাটে ফিরে যান...'

'সে প্রসঙ্গে পরে আসছি,' বলল রানা। 'তার আগে দেখুন দেখি কয়েকটা বিষয়ে আপনি আমাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারেন কি না।'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'আপনি জানেন, বিশালা কালমুনাই মারা গেছে?'

'ভালোই তো হয়েছে,' বলল হারুন। 'নিজে থেকে বিদায় নিয়েছে আপদটা।'

'নিজে থেকে নয়, ডক্টর হাবিব। কালমুনাইকে খুন করা হয়েছে। গলায় তার পেঁচিয়ে।'

স্থির হয়ে গেল ডক্টর হারুন। নিজের অজান্তেই একটা হাত উঠে গেল গলায়। 'ওহ্, গড! কে, মিস্টার জয়?'

'কে আবার!' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা।

'ভালো কথা, আপনার তদন্ত কত দূর এগোল, মিস্টার জয়?'

মাথা নাড়ল রানা। 'এখনও সে-ই চাল দিয়ে যাচ্ছে,' বলল ও। 'সে থামলে না আমি চাল দেব।'

'আর আমার সারের ফর্মুলা? ডিকোড করার জন্যে ঢাকায় পাঠিয়েছেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'টেলেক্স মেশিন নষ্ট, ওটা কারও হাতে পাঠাতে হবে।'

'বলছিলেন কী সব তথ্য দরকার আপনার,' মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল হারুন।

'আপনি তা হলে বোধহয় রত্নে উপলচন্দ্র আর কুমারাতুঙ্গার খবরও

জানেন না,' বলল রানা। 'ওরাও মারা গেছে, ডক্টর হারুন। ওদেরকে খুন করা হয়েছে ভাইরাস পুশ করে। নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পেয়ে মারা গেছে ওরা। লোকটা...

'বাস্টার্ড!'

'সান-অভ-আ-বিচ।'

'কিন্তু, মিস্টার জয়, কালমুনাই বা ওদের দু'জনকে খুন করে তার লাভ কী?'

'কী লাভ তা একমাত্র কালপ্রিটই বলতে পারবে,' বলল রানা। 'তবে আমার ধারণা, কালমুনাই তাকে চিনতে পেরেছিল। কিংবা সে হয়তো নিজেই কালমুনাইকে নিজের পরিচয় জানিয়েছিল।'

'কেন, তা কেন জানাবে সে?'

'হয়তো কালমুনাইকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নিতে চেয়েছিল সে, তাই নিজের পরিচয় প্রকাশ না করে তার উপায় ছিল না। কিন্তু তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় কালমুনাই। তাই তাকে মরতে হয়েছে।'

'উপল আর কুমারা, মিস্টার জয়? ওদের ব্যাপারটা তা হলে কী?'

'ওরা তাকে আমার রেডিও চুরি করতে দেখে ফেলে,' বলল রানা।

'আশ্চর্য তো! রেডিও নিয়ে কী করবে সে?'

'জান বাঁচাবার শেষ উপায় হিসেবে যাদের হয়ে কাজ করছে, অর্থাৎ সাদাদের ডাকবে সে,' বলল রানা। 'রেডিওটা সেজন্যেই দরকার ওর।'

'দেখা যাচ্ছে মহা চতুর এক লোকের পাল্লায় পড়েছি আমরা।'

'জেরা করব বলে দু'জন সিপাইকে খুঁজছি আমি,' বলল রানা। 'তারা ডক্টর ফারুকের ল্যাবে ঢুকে কালমুনাইয়ের লাশ বের করে এনেছিল।'

'ঠিক আছে, খোঁজ নিচ্ছি আমি,' বলল হারুন। 'আপনাকে কোথায় পাব-হাটে, নাকি হসপিটালের ক্যাবিনে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি আসলে টহলের মধ্যে থাকব। ভালো কথা, ক্যাপটেন তিওয়ারিকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে তার কথা মত চলতে বাধ্য নই আমি।'

'ও, তাই?' খুশি হলো ডক্টর হারুন। 'লোকটা এমন বদরাগী, আমি খুব ভয় পাচ্ছিলাম...'

'তার কথা ছাড়ুন,' হাত ঝাপটা দিয়ে তিওয়ারি প্রসঙ্গ বাতিল করে দিল রানা। 'আমি ভয় পাচ্ছি মেজর ফালকের কথা ভেবে...'

ডক্টর হারুন অভয় দিয়ে হাসল। 'লালু আমার বন্ধু,' বলল সে। 'তার খোঁজে প্রয়োজন হলে গোটা ক্যাম্প আমি চষে ফেলব না! আপনি নিশ্চিত থাকুন, মিস্টার জয়।'

'ধন্যবাদ, ডক্টর হাবিব,' বলে তাকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে এগোল রানা।

'হসপিটালের কী অবস্থা, মিস্টার জয়?' পিছন থেকে জানতে চাইল হারুন। 'মানে, ওখানে যারা আছে?'

'দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে,' বলল রানা, ঘুরে তার দিকে তাকাল। 'তবে আগের চেয়ে পরিবেশ এখন অনেক শান্ত।'

'ইঞ্জিনিয়ার হাশমি কেমন আছেন?'

'পুরোপুরি সুস্থ,' বলল রানা।

'বলেন কী!' বিস্মিত দেখাল হারুনকে। 'তবে আপনি তো আর না জেনে কথাটা বলছেন না। তারপরও, মিস্টার জয়, পাগল কি সত্যি কখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়?'

'তা আমি জানি না,' বলল রানা। 'তবে জানি যে জাভেদ হাশমি কখনোই পাগল ছিলেন না।'

'পাগল ছিলেন না? তা কী করে হয়!' হাসতে গিয়ে ডক্টর হারুনের প্রায় বিষম খাওয়ার অবস্থা।

'হওয়ালেই হয়,' বলল রানা।

'পাগল না হলে রিয়্যাক্টরের কেটলিতে হাশমি লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন কেন?'

'আমাকে আপনি খানিকটা এলএসডি অ্যাসিড খাইয়ে দিন, আমিও হিমালয়ের মাথা থেকে লাফিয়ে পড়তে চাইব।'

'এলএসডি? সে তো মারাত্মক...'

'অন্য একটা প্রসঙ্গ, ডক্টর হাবিব। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তৌফিক আজিজের কোন খোঁজ পাওয়া গেছে কি না জানেন আপনি?'

কী যেন বলতে গিয়ে নিজেকে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল ডক্টর হারুন। 'না, থাক।'

'কী আশ্চর্য, থাকবে কেন, বলুন!'

ডক্টর হারুনের ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারায় অসন্তোষ। আরও এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মুখ খুলল সে, 'আপনিই বলুন না, কোন যোগ্য লোকের হাতে পড়লে কি ক্যাম্পের এই বেহাল অবস্থা হত? একের পর এক মারাত্মক সব স্যাবটাজ চলছে, অথচ ওঁনার কোন হুঁশই নেই...'

'আপনি কর্নেল যাদবের কথা বলছেন...'

'কি? না, এ-সবই অ্যাক্সিডেন্ট! নিজের ধারণা থেকে একচুল নড়বেন না। কে বোঝায়, অপরাধী তো আশকারা পেয়ে যাচ্ছে!' একটু দম নিল ডক্টর হারুন। 'তখন শয্যাশায়ী হননি, বললাম তৌফিক আজিজকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর কি প্রতিক্রিয়া হলো শুনবেন?'

অপেক্ষা করছে রানা। ডক্টর হারুনকে এভাবে কথা বলতে শুনে ক্ষীণ একটু সন্দেহ হচ্ছে ওর, মানসিক চাপের মধ্যে থাকায় তার মগজও সম্ভবত শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি কাজ করছে না।

কর্নেল বললেন, 'মিস্টার আজিজের এই নিখোঁজ হওয়াটা তো মিস্টার জয়ের কাছে ব্যাখ্যা করা যাবে না। অ্যাক্সিডেন্টালি মানুষ গায়েব হয়ে গেছে, এ তো কোন পাগলেও বিশ্বাস করবে না। বুঝুন!'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কর্নেল যাদবের অতীত রেকর্ডও উজ্জ্বল কিছু নয়। তা

সে যাকগে। ভদ্রলোক এখন আছেন কেমন?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাগ আর অসন্তোষ ঝেড়ে ফেলতে চাইল ডক্টর হারুন। 'এ যাত্রায় বোধহয় বেঁচে গেলেন।'

'এখনও নিজের হাটে আছেন?'

মাথা নাড়ল হারুন। 'ক্যাপটেন তিওয়ারি তাঁকে ওখান থেকে সরিয়ে পনেরো নম্বর হাটে রেখেছেন। কেন বলুন তো?'

'না, এমনি ভাবছিলাম।'

'অযাচিত না হলে আপনাকে একটা পরামর্শ দিই, মিস্টার জয়,' সকৌতুকে বলল হারুন। 'স্থায়ী বা অস্থায়ী, দুই কমান্ডারের কাছ থেকেই সযত্নে দূরে সরে থাকুন। দু'জনের কারও কাছেই আপনি পপুলার নন।'

'তা নই।' ঘুরে দরজার দিকে এগোল রানা, শুনতে পেল টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করছে ডক্টর হারুন।

মেইন স্ট্রিটে বেরিয়ে এল রানা, পনেরো নম্বর হাট আর কর্নেল যাদবের কথা ভাবছে। হারুন বলল, 'এ যাত্রায় বোধহয় বেঁচে গেলেন।' কিন্তু তারপরও ভদ্রলোক ক্যাপটেন তিওয়ারির হাতে তুলে দিয়েছেন ক্যাম্পের দায়িত্ব।

ক্ষমতা তিনি সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় ছেড়েছেন; তারমানে, এখন তিনি সুস্থ বোধ করছেন না, দু'চারদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও দেখছেন না।

তবে, সিদ্ধান্তটা যেহেতু তাঁকেই নিতে হয়েছে, তাঁর নিশ্চয় জ্ঞান আছে। রানা ভাবল—ঠিক এভাবেই চিন্তা করবে মেজর ফালকে। আর তারপর, চাবির গোছাটা হাতে পেয়েই, পনেরো নম্বর হাটের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে বসের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য।

রানাকে একবার বলেওছিল ফালকে, শরীরে কুলালে কর্নেলকে একবার দেখে আসবে।

রানার মনের কানাচে ছোট্ট একটা আশার আলো জ্বলে উঠতে চাইছে। ফালকে যদি কর্নেলের কাছে গিয়ে থাকে, তার সঙ্গে ওর দেখা না হওয়ার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, কারণ পাওয়া যায় হসপিটালে না ফেরার।

পনেরো নম্বর হাট খুঁজে বের করা কঠিন কোন ব্যাপার নয়, কারণ প্রতিটি ট্রেঞ্চে ঢোকার মুখে একটা করে নোটিশ বোর্ড টাঙানো আছে।

কিন্তু হাটটা খুঁজে বের করার পর ইতস্তত করছে রানা। ডক্টর হারুন সাবধান করে দিয়েছে বলে নয়, আগে থেকেই জানা আছে ওর সম্পর্কে কর্নেল যাদবের কী ধারণা। অজুহাত পেলে ওর স্বাধীনতায় হাত দিতে ছাড়বেন না তিনি। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই তাঁর কানে কিছু মন্ত্র আউড়েছে তিওয়ারি। ফলে ওর প্রতি মনটা আরও বিষিয়ে আছে।

দেখা গেল কর্নেল জেগে আছেন, রানা ভিতরে ঢুকতে না ঢুকতে নিজের কর্তৃত্ব ফলিয়ে নির্দেশ দিলেন—এই মুহূর্তে নিজের হাটে বা হসপিটালে ফিরে যেতে হবে ওকে। তখন? ও জানবে কীভাবে হাটের ভিতর মেজর ফালকে আছে কি না।

কপাল খারাপ হলে আরও বিচ্ছিরি পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হতে পারে।

হয়তো দেখা গেল কর্নেল যাদবের বেডের পাশে সাক্ষাৎ যমের মত উপস্থিত রয়েছে ঘন আলকাতরা। তা হলে তো কথাই নেই! গুরু-শিষ্য মিলে মনের সাধ মিটিয়ে অপদস্থ করবে ওকে।

হাটে কোন জানালা নেই, স্মরণ করল রানা। কাঠের দেয়ালগুলো এমন নিখুঁতভাবে ইনসুলেটেড, হাটটাকে প্রায় সাউন্ডপ্রুফই বলা যায়। মাসুদ রানার উর্বর মস্তিষ্কে একটা সন্দেহজনক সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে—কী হয় ও যদি হাটের দরজা একটু খুলে বিকৃত কণ্ঠে মেজর ফালকের নাম ধরে ডাকে?

হঠাৎ ত্রুটিটা ধরতে পারল রানা। ওর চিন্তা-ভাবনা উদ্ভট হয়ে যাচ্ছে! কারণটা পরিষ্কার। ওর ব্রেনও মাত্র পঞ্চাশ ভাগ করছে।

এই সময় দরজা খুলে গেল, বাইরে এসে দাঁড়াল একজন সিপাই।

রানা জানতে চাইল, 'মেজর ফালকে কি ভেতরে?'

'না, সার।'

'ধন্যবাদ। আমি ভেবেছিলাম মেজর বোধহয় কর্নেলকে সঙ্গ দিচ্ছেন।'

'না, সার। কর্নেলের সঙ্গে একা শুধু ক্যাপটেন তিওয়ারি আছেন।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সিপাই।

'সে এখন তা হলে এখানে?' ইচ্ছে করেই তেতো স্বরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'জী, সার!'

রানা খেয়াল করল, সিপাইয়ের ফরসা মুখ লালচে হয়ে আছে, গোটা চেহারায় ক্ষোভের ছাপ। সন্দেহ নেই, বদমেজাজী তিওয়ারি একহাত নিয়েছে তাকে। হয়তো বিনা কারণেই।

ওখানে আর দাঁড়িয়ে না থেকে রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চের দিকে রওনা হলো রানা, জানে হাশমি ওর জন্য অপেক্ষা করছেন।

সামনে একটা বাঁক পড়ল। তারপর জেনারেটর ট্রেঞ্চ। ওটাকে পাশ কাটিয়ে চলে আসছে, ভিতর থেকে একজন লেফটেন্যান্ট বেরিয়ে এল, সঙ্গে দু'জন সিপাই।

লেফটেন্যান্ট তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'এই, তুমি!'

দাঁড়াল রানা, ঘুরল।

'তুমি ইঞ্জিনিয়ার তৌফিক আজিজকে দেখেছ?'

'না,' বলল রানা। 'দেখিনি।'

'মাফ করবেন, সার।' খুব বিব্রত দেখাল লেফটেন্যান্টকে। 'আমি আপন্যাকে চিনতে পারিনি।'

'এখনও সার্চ করছ তোমরা?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট। 'এটা কেমন ব্যাপার হলো, সার? জ্যান্ত মানুষটা চোখের সামনে থেকে গায়েব হয়ে যাবেন?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'পুরো ক্যাম্প দু'বার সার্চ করা হয়েছে, সার। কোথাও নেই।'

'কোন ধারণাই করা যাচ্ছে না?'

মাথা নাড়ল লেফটেন্যান্ট। 'এখানে আর ধারণা করার কী আছে, বলুন?

কেউ কেউ বলছে, তিনি হয়তো সারফেসে উঠে গেছেন, বা এ-ধরনের কিছু ঘটেছে। কিন্তু আমার কাছে, সার, ব্যাপারটা ভৌতিক বলে মনে হচ্ছে। ভয় হচ্ছে আমাকেও না গায়েব করে দেয়া হয়।'

ওরা যেহেতু গোটা ক্যাম্প সার্চ করছে, তাই রানা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোমরা কি মেজর ফালকেকে দেখেছ?'

'তিনিও গায়েব হয়ে গেছেন, সার?' এ এক ধরনের সতর্ক কৌতুক।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা। 'এমনি খুঁজছি আর কী।'

'না, মিস্টার জয়। মেজর কোথায় বলতে পারব না।'

'ঠিক আছে। ধন্যবাদ।'

আবার হাঁটা ধরল রানা, রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চে ইঞ্জিনিয়ার হাশমির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। মাথায় পর পর দুটো চিন্তা এল। একটাও স্বস্তিকর নয়।

প্রথমে ভাবল, মেজর ফালকেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এটা একা শুধু ও-ই জানে। হাশমি উদ্বিগ্ন, কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ওর মত স্পষ্ট ধারণা নেই তাঁর।

তারপর ভাবল, তৌফিক আজিজের বেলায় যা করেছিল, ফালকের বেলায়ও তাই করছে–কাউকে রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

না, ব্যাপারটা পুরোপুরি ঠিক নয়। ডক্টর হারুন জানে। সে কথা দিয়েছে, সার্চ করার জন্য চারদিকে লোক পাঠাবে। তারপর নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠল রানা, ভাবল–ধুত্তোর ছাই! মাথায় কী সব উদ্ভট, এলোমেলো চিন্তা আসছে! অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাকে মাথার এক কোণে সরিয়ে রেখেছে কখন থেকে।

সেটা হলো, মেডিক্যাল রেকর্ডস।

প্রথমেই যেটা চমকে দেয়, মেডিক্যাল রেকর্ডের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল তারা সবাই হয় অচল নয়তো অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ নিজেকে পরীক্ষা করল রানা, সিদ্ধান্তে পৌঁছাল–এ বিষয়ে ওর চিন্তা খেই হারাচ্ছে না।

ডাক্তার আরিফ হাসান নিহত হয়েছেন, তাঁর সহকারী মেডিক রফিক ফুড পয়জনিং-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে, আর চাবি আনতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে মেজর ফালকে!

দ্রুত একটা উপসংহার টানা যায়–নিশ্চয়ই তা হলে ওই রেকর্ডগুলোয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে!

তবে না, উপসংহারটায় খুঁত আছে। মেডিক রফিক একটা ছড়িয়ে পড়া ফুড পয়জনিং-এর শিকার, এটা একা তার কোন বিষয় নয়; আর মেজর ফালকে যে মেডিক্যাল ফাইল সম্পর্কে আগ্রহী, এটা রানা আর হাশমি ছাড়া তৃতীয় কেউ জানে না।

অবশ্য যদি না...যদি না কেউ তাকে কমান্ড হাট থেকে চাবি নিতে দেখে থাকে!

তবে এভাবে রানা কোথাও পৌঁছাতে পারছে না। শুধুই সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে; যদি, হয়তো, কিন্তু এসে ভিড় করছে, তথ্য আর লক্ষণ বিশ্লেষণ করে বা সূত্র ধরে সম্ভাব্য অপরাধীর দিকে আঙুল তাক করা যাচ্ছে না।

রিয়্যাক্টর কমপ্লেক্স-এর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখল রানা। কবাটে বার কয়েক ঘুসি মারার পর সাড়া পাওয়া গেল। দরজা খুলল সহকারী ইঞ্জিনিয়ারদের একজন।

'মিস্টার হাশমি...'

রানাকে শেষ করতে না দিয়ে লোকটা বলল, 'না, মিস্টার হাশমি এখানে নেই, মিস্টার জয়। তিনি হসপিটালে।' তার হাতে মোটা আর শক্ত একটা লাঠি দেখা যাচ্ছে।

ইঙ্গিতে সেটা দেখাল রানা। 'ওটা কী?'

টান টান হাসি দেখা গেল সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের মুখে। 'এখন থেকে কাউকে ডাইভার বলে সন্দেহ হলেই ধাওয়া করে তাড়িয়ে দেয়া হবে।'

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। উদ্বেগে অসুস্থ বোধ করছে ও। এবার তা হলে হাশমিও নিখোঁজ!

কিন্তু এত লোককে গায়েব করে শয়তানটা রাখছে কোথায়? তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, এত লোককে তার গায়েব করতে হচ্ছে কেন?

নিজের কাজে গুরুতর কোন ভুল করে ফেলেছে সে? বোধহয়। এই ভুলের কারণে তার অপরাধ হয়তো প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। এমন একটা ভুল, শোধরানোর কোন উপায় নেই। শোধরাতে হলে ক্যাম্প খালি করাতে হবে? নিশ্চয়ই তাই।

এক ঘণ্টার ভিতর দু'জন লোক নিখোঁজ, সারাদিনে তিনজন! ব্যাপারটা রিপোর্ট করা দরকার। কিন্তু কাকে রিপোর্ট করবে ও? কর্নেল যাদব অসুস্থ, মেজর ফালকে অদৃশ্য, ক্যাপটেন তিওয়ারি বিষবৎ পরিত্যাজ্য। কমান্ড হাট খালি পড়ে আছে, রিপোর্ট করবার মত কেউ নেই ওখানে।

না, ওখানে ডক্টর হারুনকে পাওয়া যাবে। তাকে বলে লোকজন যোগাড় করা যায়, খবর পাঠানো যায় ক্যাপটেন তিওয়ারিকেও।

গোটা ক্যাম্পে আরও ভালো করে তল্লাশি চালাতে হবে। সেটা চিরনি অভিযান হওয়া চাই। জাভেদ হাশমিকে ধরতে হবে শুনলে এই অভিযানে তিওয়ারির অন্তত উৎসাহের কোন অভাব হওয়ার কথা নয়।

সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও হসপিটাল ট্রেঞ্চের কাছাকাছি আসবার পর ইতস্তত একটা ভাব দেখা দিল রানার মধ্যে। ক্ষীণ হলেও সম্ভাবনা আছে যে ভিতরে হাশমি থাকতে পারেন। নিজের ক্যাবিনে হঠাৎ একটা কাজে আটকে যেতে পারেন না? অন্তত একবার উঁকি দিয়ে দেখতে তো কোন ক্ষতি নেই।

টানেলে ঢোকার পর হঠাৎ এত ঠাণ্ডা লাগল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো রানাকে। নেতাজি ক্যাম্পের ভিতর সারাক্ষণই ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, কিন্তু এখনকার গতি তার তুলনায় জোরাল, নাকের ভিতর লোমের গোড়ায় ঠাণ্ডা

সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

দেয়ালের কাছে সরে এসে ট্রেঞ্চ বরাবর তাকাল রানা, ওর দৃষ্টি হাটগুলোর কিনারাকে পাশ কাটিয়ে আরও দূরে চলে গেল। তারপর ধীরে ধীরে সামনে এগোল ও। দেখার মত কিছু নেই। বরফের দেয়াল আর অর্ধবৃত্ত আকৃতির ছাদ যেমন থাকবার কথা তেমনই আছে। মেইন স্ট্রিট থেকে আসা নিস্তেজ আলোয় জমাট বাঁধা বরফ ধূসরবর্ণ লাগল।

তবে যতই সামনে এগোল রানা–এখনও বরফের দেয়াল ঘেঁষে আছে–বুঝতে পারল ওর কোন ভুল হয়নি। ট্রেঞ্চ ধরে বেশ জোরাল একটা বাতাস বইছে।

প্রথম হাটের পাশে চলে এল রানা। ওটা আর ট্রেঞ্চ দেয়ালের মাঝখানে সরু একটা প্যাসেজ রয়েছে, ঢুকে পড়ল ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের গতি বেড়ে গেল, নদীর ঠাণ্ডা পানির মত ওর চারপাশে বইছে।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ছুটল রানা। স্ফটিকের মত বরফে পিছলে যাচ্ছে বুট। হোঁচট খাচ্ছে বারবার। ট্রেঞ্চের শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে চাইছে ও, এরইমধ্যে জানে কী দেখতে পাবে।

ওখানে পৌঁছানোর আগেই, পারকা হুড পরে থাকা সত্ত্বেও, আওয়াজটা শুনতে পেল রানা। আরও একটু এগোতে গায়ে আছড়ে পড়ল হিম বাতাসের তীব্র ঝাপটা, সঙ্গে বয়ে আনছে ওদের উপরকার হিংস্র ঝড়ের গর্জন।

থেমে উপর দিকে তাকাল রানা। ওর মাথা থেকে বিশ ফুট উপরে, খোলা হ্যাচ কাভারের বাইরে, সাদা তুষারের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ দেখতে পেল।

ইস্পাতের প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে ছুটল রানা। ওর চারপাশে তুষারের কণা ঝরে পড়ছে। ধাপগুলো এরইমধ্যে এক কি দেড় ইঞ্চি পুরু নতুন সাদা তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে। সেই তুষারের উপর স্পষ্ট ফুটে আছে বুটের ছাপ। কেউ একজন বাইরে বেরিয়েছে!

উপরে উঠে এসে মাথা আর কাঁধ হ্যাচের বাইরে বের করে দিল রানা। পরমুহূর্তে বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কায় সিঁড়ির ধাপ থেকে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলো ওর। মাথা আর কাঁধ ঝট করে টেনে নিতে হলো।

এক ধাপ নীচে নেমে এসে পারকার হুড আরও আঁটসাঁট করল ও, ফাঁকটা যাতে দু'ইঞ্চির বেশি না হয়।

পায়ের বুট দিয়ে সিঁড়ির ধাপ থেকে আলগা তুষার সরাল রানা, তারপর স্টিল রেইলটা শক্ত করে ধরে আবার হ্যাচের উপর মাথা তুলল, সতর্ক একটা কাছিমের মত।

হুডের সরু ফাঁক দিয়ে বাইরের নরকে তাকিয়ে কিছুই রানা দেখতে পেল না। দৃষ্টিসীমা দুই কি তিন ফুটের মত। তুষার কণাগুলোর গতি এত বেশি যে খুদে বর্শার মত আঘাত করছে। মাথার চারপাশে মনে হলো কয়েক হাজার দানব কী এক প্রচণ্ড আক্রোশে হুংকার ছাড়ছে অবিরাম।

বাইরে কোন পায়ের ছাপ দেখতে চেষ্টা করা স্রেফ বাতুলতা মাত্র। ওই নরকে যে-ই বেরিয়ে থাকুক, তার কোন আশা নেই, কোনরকম সাহায্যও তার

নাগাল প্যাবে না। নিয়ম হলো হ্যাচ কাভারের সঙ্গে লাইফলাইন বাঁধা থাকবে, কিন্তু তাও নেই।

তীব্র ঝড় অগ্রাহ্য করে আরও এক মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর মাথা নিচু করে হ্যাচ কাভার নামাল, লোহার খিলটা ভালো করে লাগাচ্ছে।

হঠাৎ একটা কথা ভেবে থেমে গেল ও।

ক্যাচটা না হয় খোলাই থাক। যে-ই বাইরে বেরিয়ে থাকুক, সে হয়তো সম্ভব নয় জেনেও ফিরে আসবার লড়াইটা লড়ছে। এবং অলৌকিক কোন কারণে সে যদি সফল হয়ও, ক্যাচ লাগানো হ্যাচ কাভার তার মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করবে।

ধীরে ধীরে, বিষণ্ন মনে, সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামছে রানা; আর্কটিক ঝড়ের গর্জন এখনও লেগে রয়েছে কানে।

হ্যাচ বন্ধ করবার পর ট্রেঞ্চের পরিবেশ শান্ত আর স্থির হয়ে গেছে। মেইন স্ট্রিট থেকে আসা ম্লান আলো পড়ায় বরফের বিবর্ণ দেয়ালগুলোকে কুৎসিত দেখালেও, নিরাপদ আর সুরক্ষিত মনে হচ্ছে। এখনও লোকটার পাগলামি নিয়ে চিন্তা করছে রানা। যদিও কোন কূল খুঁজে পাচ্ছে না।

বাইরে অসহিষ্ণু প্রকৃতি, চারদিকে কয়েকশো মাইল খাঁ-খাঁ আইসক্যাপ, তুষার ঝড়ের গতি ঘণ্টায় একশো মাইলের বেশি তো কম নয়, বেরুলে ফিরে আসবার সম্ভাবনা শূন্য, এ-সব জেনেও কোন সাহসে বেরুল সে? এ লোক পাগল নয় তো কী!

কিন্তু না, পাগল আছে ওদের সঙ্গে নীচে, ক্যাম্পের নিরাপদ আশ্রয়ে।

সিঁড়ি বেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পিছু হটছিল রানা। ঘুরে সিধে হতে যাচ্ছে, পিছলে গেল পা। রেইল ধরতে চেষ্টা করে পারল না, হড়কে আট কি দশ ফুট নীচের টানেলে নেমে এল। পতনটা মারাত্মক হতে পারত, পরনে ভারী আর্কটিক কাপড়চোপড় থাকায় রক্ষা পেয়েছে।

তবে বেশ জোরাল ঝাঁকি লেগেছে। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে পড়ে থাকল ও, দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে। তারপর নরম তুষারে হাত রাখল, নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

কী যেন ঠেকল হাতে। আলগা তুষারের নীচে কিছু একটা আছে। এই শুকনো তুষার উপরের হ্যাচ গলে পড়েছে এখানে, বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে একটা স্তূপ তৈরি হয়েছে। দ্রুত হাত চালিয়ে তুষার সরাচ্ছে রানা।

ধীরে ধীরে আকৃতি পেল মাথাটা। একজন মানুষের মাথা। তারপর মুখটাও উন্মোচিত হলো।

মেজর লালু ভাই ফালকে।

আট

হাতের গ্লাভস খুলে ফালকের মুখে হাত দিল রানা। বরফের মতই ঠাণ্ডা। নিজে বসে, মেজরকেও বসাল ও। তার দিকে পিছন ফিরে হাত দুটো ধরল, তারপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পিঠে তুলে নিল তাকে। কুঁজো হয়ে হাঁটছে, হোঁচট খাচ্ছে বারবার।

জানে খালি কোন বেড নেই, তারপরও মেজর ফালককে হসপিটালেই নিয়ে যাচ্ছে রানা।

সরাসরি অপারেটিং থিয়েটারে চলে এসেছে, টেবিলে শুইয়ে দিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল পাশে, দৃষ্টিতে গভীর বিষণ্নতা নিয়ে দেখছে ফরসা মসৃণ ত্বক কেমন প্রাণহীন কালচে-বেগুনি হয়ে গেছে।

রানা নিশ্চিত ফালকে বেঁচে নেই।

তার হাত দুটো টেবিলের দু'পাশে ঝুলছে, হাঁ হয়ে আছে মুখ। তার খোলা মুখের সামনে কান পাতল ও, নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনতেও পেল না, অনুভবও করল না। গলার পাশের কোন শিরা নড়ছে না একচুল। কবজিতে তো আগেই পালস্ পায়নি। কাপড় ছিঁড়ে বুকের উপর কান চেপে ধরল। কিচ্ছু না।

সময়ের একটা হিসাব করল রানা, ফালকে হসপিটালের ওয়ার্ড ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কতক্ষণ পার হয়েছে। তারপর ডাক্তার হাসানের চেম্বারে চলে এল স্টেথস্কোপের খোঁজে। কাগজ-পত্রের নীচে চাপা পড়েছিল, ফলে মিনিট পাঁচেক নষ্ট হলো এখানে।

অপারেটিং থিয়েটারে ফিরে এসে ফালকের হার্টবিট শোনবার জন্য স্টেথস্কোপের ইয়ারপিসটা নিজের কানে চেপে ধরল রানা। শুধু যন্ত্রটার নড়াচড়ার শব্দ পাচ্ছে কানে। কিন্তু তারপর, অস্পষ্ট একটা ছোট্ট আওয়াজই বোধহয়, শুনতে পেল।

কাঁপা কাঁপা তরল একটা ধ্বনি—যেন দূরের কোন বেসিনে দাঁড়িয়ে, মুখে অল্প একটু পানি নিয়ে কুলকুল করল কেউ, তারপর ফেলে দিল।

কয়েকটা সেকেন্ড পার হলো। আবার সেই শব্দ!

এক ঝটকায় স্টেথস্কোপ সরিয়ে দিয়ে ঝুঁকল রানা, ফালকের ঠাণ্ডা ঠোঁটে মুখ ঠেকাল, তারপর যতটা জোরে পারা যায় নিজের গরম নিঃশ্বাস ভরল তার ভিতর।

আরেকটা নিঃশ্বাস ভরো, বুকের খাঁচায় চাপ দিয়ে বের করো সেটা, তারপর আরেকটা নিঃশ্বাস···

এক মিনিট পার হলো। দু'মিনিট।

তারপর হঠাৎ, পরম এক আনন্দময় মুহূর্তে, ফালকের বুক একচুল উঁচু হতে আর নিচু হতে দেখল রানা। ব্যাপারটা আবার ঘটল। অপেক্ষা চলছে,

শ্বাসরুদ্ধকর অপেক্ষা। যেন মনে হলো এক যুগ দেরি হচ্ছে। ওই, তৃতীয়বার!

ওখানে দাঁড়িয়ে স্বস্তি আর ঘামে ভিজছে রানা, কার প্রতি যেন কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে দেখছে মেজর ফালকেকে–প্রথমে খুব ছোট করে, তবে ক্রমশ আরও বড় হচ্ছে।

আগে মনে করা হত ফ্রস্টবাইটের শিকার কোন মানুষকে দ্রুত গরম করে তোলা ঠিক নয়। নিয়ম ছিল, ঠাণ্ডায় শক্ত হয়ে যাওয়া মাংসে রক্ত চলাচল আরম্ভ হলে যে অসহ্য ব্যথা হওয়ার কথা তা কমাবার আশায় তুষার দিয়ে ভুক্তভোগীকে অনবরত ঘষতে হবে। পরে এই ধারণা পাল্টেছে। রোগীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গরম করে তুলতে হবে।

মেজর ফালকের বুট, মোজা আর ট্রাউজার খুলে ফেলল রানা। গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে পা দুটোয় বেশ কয়েক মিনিট সেঁক দিল। হাতের কাছে দেখতে পেয়ে অ্যানেসথেটিক অ্যাপারাটাসটাও ব্যবহার করল–ফালকে মুখে ফেস মাস্ক লাগিয়ে বোতামে চাপ দিতেই অক্সিজেন সাপ্লাই শুরু হয়ে গেল।

এরপর ফালকের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় নিয়মিত হয়ে এল। তাকে অপারেটিং টেবিলে শোয়ানোর পর মাত্র দশ মিনিট হয়েছে, আরেকবার গরম পানিতে ভিজানো তোয়ালে নিঙড়াচ্ছে রানা, এই সময় তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও–মাস্কের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসায় ভোঁতা।

তার দিকে ফিরে মাস্কটা খুলে নিল রানা। দুর্বল ভঙ্গিতে একটা হাত সামান্য একটু তুলে ককিয়ে উঠল সে, 'ভগবান, মাথাটা!'

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

'মাথা। ভগবান, মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে!'

ফালকের মাথার পিছনে চলে এল রানা। ধীরে ধীরে আঙুল ঢোকাল তার চুলে। হিসহিস করে নিঃশ্বাস ফেলল ফালকে, ঝাঁকি খেল শরীরটা।

রানার আঙুল তার মাথার পিছনে ছোট একটা পাহাড়ের সন্ধান পেল, অর্থাৎ ফুলে বিরাট আলু হয়ে আছে জায়গাটা। তারমানে খোলা হ্যাচের নীচে অসুস্থতার কারণে ঢলে পড়েনি সে!

'কে এই কাজ করল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ফালকের মাথা নিস্তেজ ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক নড়ল।

'কে?'

রানার দিকে ফিরে চোখ মিটমিট করল ফালকে। সত্যিকার অর্থে এতক্ষণে তার চৈতন্য ফিরে আসছে।

'কেউ আপনার মাথায় আঘাত করেছে?'

'করেনি মানে!' মেজর ফালকে চোখ দুটো শক্ত করে বুজে আছে।

'কে?'

'দেখতে পাইনি কে। তার পারকার হুড...আঁটো করা ছিল। ওইটুকুই দেখতে পেয়েছি। তারপর–ধাম!' চোখ খুলে রানাকে দেখল ফালকে।

'বুঝতে পারলেন না কে? কোন ক্লু নেই? একটা আইডিয়াও হলো না?'

'না।' ফালকে মুখটা আরেকদিকে ঘুরিয়ে নিল, যেন রানার দৃষ্টি তার ভাল লাগছে না।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রানা একটু কঠিন সুরে জানতে চাইল, 'আপনি কাউকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন না তো, মেজর ফালকে?'

রানার দিকে ফিরল ফালকে। 'আপনার কি মাথা খারাপ হলো? লোকটা আমাকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করেছে! আর আপনাকে আমি মিথ্যেকথা বলব, আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন জেনেও?'

'ঘটনাটা ঘটল কোথায়? আপনি চাবি পাবার পর, না আগে?'

এক মুহূর্ত হতভম্ব দেখাল মেজরকে, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'ও, হ্যাঁ, চাবি। ওটার কাছাকাছিও যেতে পারিনি।'

অথচ, ভাবল রানা, র‍্যাকের চাবি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। 'কফি?'

আবার চোখ বুজেছে ফালকে। কথা না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল।

থিয়েটার থেকে বেরিয়ে ডাক্তার হাসানের অফিসে যাচ্ছে রানা, কফি মেশিনটা ওখানেই। নিজেকে অসহায় আর নিঃসঙ্গ লাগছে ওর। মেজর ফালকের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য পাওয়ার আশা না করাই ভালো। ওদিকে ইঞ্জিনিয়ার জাভেদ হাশমিরও দেখা নেই।

মন বলছে, ওর উপর আবার হামলা হবে।

কফি নিয়ে ফিরে এল রানা। মগটা নিয়ে ধীরে ধীরে নিজেই চুমুক দিতে পারছে ফালকে। একে তো ফুড পয়জনিঙের কারণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বমি করেছে, তারপর খুলির পিছনে নির্মম আঘাত অসম্ভব দুর্বল করে ফেলেছে তাকে। গরম, আরামদায়ক একটা বিছানা দরকার তার, অপারেটিং টেবিল নয়। কিন্তু বেড পাবে কোথায় ও...

হঠাৎ নিজেকে তিরস্কার করল রানা। সত্যি বোকামি হয়ে গেছে! বোকামি মানে, কথাটা মনে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু পড়েনি। খালি বেড তো একটা আছে, ক্যাবিনের ভিতর, হাশমি যেটায় শুয়ে ছিলেন!

চেক করার জন্য ক্যাবিনে ঢুকল রানা। ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বেডটায় হাশমি শুয়ে রয়েছেন। ভদ্রলোক কটমট করে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে।

'এ কী, এর মানে—?' তবে প্রশ্ন না করলেও চলে, দৃশ্য নিজেই বলে দিচ্ছে সব। জাভেদ হাশমি আবার স্ট্রেইটজ্যাকেট পরেছেন, সেটা বেডের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা। অতিরিক্ত জিনিসটা হলো—হাশমির মুখে সার্জিক্যাল টেপ লাগানো হয়েছে।

ঝুঁকে হাশমির মুখ থেকে টেপটা খুলতে গেল রানা, কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টে জ্যাকেটের স্ট্র্যাপগুলো খুলে দিল। হাত মুক্ত হতে হাশমি নিজেই ব্যস্ত অথচ অত্যন্ত সাবধানে মুখটাকে প্লাস্টার মুক্ত করলেন। কী ঘটেছে রানাকে বলার সময় মুখের চারপাশ ধীরে ধীরে ডলছেন।

'আপনি চলে যাবার চার কি পাঁচ মিনিট পরই বাইরে থেকে 'ক্যাপটেন

তিওয়ারির গলার আওয়াজ ভেসে এল। আপনি নেই, আমি একা, গাড়লটা কী বলে না বলে ভেবে বেড়ে উঠে শুয়ে থাকলাম কাত হয়ে। দুঃখিত, মিস্টার জয়, এভাবে শুয়ে থাকার কারণেই বুঝতে পারিনি কাজটা কার।'

'কোন কাজ?'

'শুনুন। বলছি। ক্যাবিনের ভিতরে ঢুকে তিওয়ারি কী করল? আমার দিকে তাকাল সে। চোখ মেলে দেখিনি তো কী হয়েছে, আমি জানি নির্ঘাত তাকিয়েছে সে, তার অশুভ জ্যোতি অনুভব করা যায়। যাই হোক, একবার তাকিয়েই চলে গেল সে।' দম ফুরিয়ে যাওয়ায় থামলেন হাশমি।

'তারপর?'

'তিওয়ারি চলে যেতে আমি উঠে বসতে যাচ্ছি, এই সময় পিছন থেকে কেউ একজন শক্ত কিছু দিয়ে মারল মাথায়। জ্ঞান ফেরার পর দেখি স্ট্রেইটজ্যাকেটের ভেতর রয়েছি।'

'কে লোকটা? ওয়ার্ডের কেউ?'

কাঁধ ঝাঁকালেন হাশমি। 'কে জানে? তিওয়ারির সঙ্গে কয়েকজন লোক ছিল, তাদের মধ্যে কেউ হতে পারে। সবার পিছু নিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে—থ্যাচ!' মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, ব্যথায় মুখ কোঁচকালেন।

'আপনি দাঁড়াতে পারবেন?'

'তা চেষ্টা করলে বোধহয় পারব।'

'ধন্যবাদ। বিছানাটা আমাদের দরকার।'

'বিছানা দরকার? কেন?'

মেজর ফালকের ব্যাপারটা হাশমিকে জানাল রানা। তারপর দু'জন ধরাধরি করে ক্যাবিনে নিয়ে এল তাকে ওরা।

বিছানায় শুইয়ে ফালকের গায়ে কম্বল টেনে দেওয়া হয়েছে, তবে তার আগে আন্ডারওয়্যার ছাড়া বাকি সব খুলে নিয়েছে রানা। তার ট্রাউজারটা ভাঁজ করার জন্য উল্টো করে ধরে ঝুলিয়েছে ও, পকেট থেকে চাবির একটা গোছা পড়ল মেঝেতে। সেটা তুলার জন্য ঝুঁকেছে, একটা চিন্তা ঢুকল মাথায়।

ইঞ্জিনিয়ার তৌফিক আজিজের খোঁজে সার্চ করা হয়েছে ক্যাম্প, কিন্তু ক্যাম্পের সব জায়গায় কি দেখা হয়েছে?

মেজরকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আচ্ছা, রেড জোন ছাড়া নিষিদ্ধ আর কোন জায়গা আছে নেতাজি ক্যাম্পে?'

'আছে বৈকি,' বলল ফালকে। 'আমার জানামতে সেখানে যাওয়াটা...'

কথাটা ফালকেকে শেষ করতে দিল রানা, তবে উত্তরটা পেয়ে গেছে আগেই। আশ্চর্য, কথাটা আরও আগে কেন ভাবেনি ও?

কিংবা কর্নেল যাদব, ক্যাপটেন তিওয়ারি বা মেজর ফালকেই বা ভাবেনি কেন?

'ওই ট্রেঞ্চে লাশগুলো আছে,' বলল ফালকে।

'ছয়টা আগে থেকেই ছিল, পরে রাখা হয়েছে ডাক্তার হাসানের লাশ, তাই না?' হিসাবটা পেতে চাইছে রানা।

'হ্যাঁ, তবে তারও পরে আরেকটা লাশ রাখা হয়েছে ওখানে,' বলল মেজর। 'সার্জেন্ট মোলায়েম সিং-এর লাশ।'

'সব মিলিয়ে তা হলে আটটা।'

'হ্যাঁ।'

'কার পক্ষে ভেতরে ঢোকা সম্ভব?' জানতে চাইল রানা।

'তালা খুলতে হলে দুটো চাবি লাগবে,' জানাল ফালকে। 'একটা আপনার হাতের ওই রিঙে আছে। আরেকটা আছে কমান্ডার যাদবের কাছে।'

'আপনি ভেতরে ঢুকে সার্চ করেছেন?' জানতে চাইল রানা।

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল ফালকে।

হাশমি বললেন, 'তবে আমার বিশ্বাস কর্নেল যাদব অবশ্যই দেখেছেন।'

'কেন তিনি দেখবেন? অনেকদিন হলো তালা দেয়া রয়েছে। তা ছাড়া চাবি তো মাত্র দুটো...'

'ওই তালা আমি লাগিয়েছি,' বলল ফালকে, 'সার্জেন্ট মোলায়েমের লাশ রাখার পর।'

চাবির রিঙটা উঁচু করল রানা। 'কোনটা?'

ক্লান্ত একটা হাত তুলে দেখাল ফালকে।

'ঠিক আছে,' হাশমির দিকে ফিরে বলল রানা। 'চলুন একবার দেখে আসা যাক।'

'আমরা কিন্তু ধরা পড়ে যাব,' বললেন হাশমি। 'অন্তত আমি তো নির্ঘাত।'

'তখন না বলছিলেন আপনার স্বাধীনতায় ওরা হাত দিতে পারবে না? তা হলে এত ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'না, মানে, আসলে ধরা পড়ার ভয় পাচ্ছি না। হামলা হবার পর নিরাপত্তার কথাটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবছি...আমি তো মারাও যেতে পারতাম, বলুন?' কাতর দৃষ্টিতে তাকালেন হাশমি।

'আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন, কাজেই নিরাপত্তার দিকটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। আর সাবধান হতে চাইলে অন্য কারও নাম লেখা পারকা পরে নিন। এই বুদ্ধিটা কোন এক কালে জাভেদ হাশমি নামে এক পাকিস্তানি ভদ্রলোক দিয়েছিলেন আমাকে, অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে।'

হেসে ফেললেন হাশমি। 'থাক, আর লজ্জা দিতে হবে না।' তারপর ভারী গলায় আবার বললেন, 'তবে, কী জানেন, কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে গেলে ভাল হোত আর কী।'

'আমি তো কর্তৃপক্ষেরই একজন,' বলল মেজর ফালকে। 'আপনারা আমার অনুমতি নিয়ে যেতে পারেন। তবে তার দরকার নেই। কারণ, দিল্লি থেকে কর্নেলের কাছে পাঠানো মেসেজটা আমিও দেখেছি।'

'তাতে কী?' জানতে চাইলেন হাশমি। 'মেসেজটায় কী আছে?'

'তাতে স্পষ্ট করে বলা আছে, ডিআইজি মিস্টার বিজয় হাসানকে নেতাজি ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য সবরকম ভাবে সহায়তা দিতে বাধ্য থাকবেন।'

'ও, তাই? তা কথাটা আগে বলবেন তো!' রানার দিকে ফিরে হাসলেন হাশমি। 'চলুন, আর কোন দ্বিধা নেই আমার।'

'সঙ্গে কিছু একটা নিন,' বলল রানা। 'ভারবাহী গাধার দিকে দ্বিতীয়বার কেউ তাকায় না।'

'কী নেয়া যায়?'

'কয়েকটা চাদর বা কম্বল নিন, দেখে মনে হবে তিওয়ারির নির্দেশে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে বেরিয়েছেন।'

আরও একটা পারকা আর নোংরা কয়েকটা কম্বল সংগ্রহ করল ওরা, আপাতত রোগীদের এ-সব দরকার হবে না। কম্বলগুলো লন্ড্রি বাস্কেটে ফেলে হসপিটাল ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল সাবধানে।

মেইন স্ট্রিট খালি পড়ে আছে। পা চালিয়ে নির্দিষ্ট ট্রেঞ্চে চলে এল ওরা। তালা দেওয়া দরজার কবাটে একটা নোটিশ দেখা গেল, তাতে লেখা–'কোন কারণেই ভিতরে প্রবেশ করা যাবে না।'

রানা আর হাশমি গম্ভীর দৃষ্টি বিনিময় করলেন। কী হোলে ঢুকিয়ে চাবি ঘোরাল রানা। ক্লিক করে আওয়াজের সঙ্গে খুলে গেল তালা। ভিতরে ঢুকল ওরা, তালাটা আবার বন্ধ করে দিল রানা।

হসপিটাল থেকে একটা হেডল্যাম্প নিয়ে এসেছে রানা, তবে সেটার দরকার হলো না। সুইচ অন করতেই ওভারহেড স্ট্রিপ লাইট জ্বলে উঠল।

তৌফিক আজিজের ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও, তারপরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য ট্রেঞ্চের পুরোটা দৈর্ঘ্য ধরে হেঁটে এল ওরা, এগোবার সময় লাশগুলোকে সাবধানে পাশ কাটাচ্ছে।

ইস্কেপ হ্যাচ সিঁড়ির নীচে পৌঁছে রানার গায়ের কাছে সরে এলেন হাশমি, তারপরই শিউরে উঠে বললেন, 'হয়েছে, চলুন এবার ফেরা যাক।'

'হ্যাঁ, চলুন,' বলল রানা, অন্যমনস্ক।

ঘুরল ওরা, দরজার দিকে ফিরছে। এখনও চিন্তা করছে রানা, কী যেন মনে পড়েও পড়ছে না। দাঁড়িয়ে পড়ল ও, তাকিয়ে আছে লাশগুলোর দিকে।

'কী হলো?'

'এক মিনিট।' প্রতিটি লাশ সুতি কম্বলে মোড়া, স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো রয়েছে একটা করে স্টিলের তৈরি স্ট্রেচার স্লেজের সঙ্গে।

'আপনার চোখে কিছু ধরা পড়েছে?'

'এক সেকেন্ড। আমাকে একটু চিন্তা করতে দিন, প্লিজ।' এর আগে এখানে একবার এসেছে রানা, সেই সময়ের কথা স্মরণ করতে চাইছে ও। তখন জায়গাটা অন্ধকার ছিল, শক্ত বরফে পরিণত হওয়া লাশগুলোর মাঝখানে হোঁচট খাচ্ছিল। একটা লাশের মধ্যে অদ্ভুত কী যেন একটা ছিল। ও মনে করেছিল ডাক্তার হাসানের লাশ সেটা, কিন্তু…

'আরে ভাই, এত কী চিন্তা করছেন বলুন তো?' হাশমি ধৈর্য হারাচ্ছেন।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'এখানে আসলে ঠিক কজন লোকের থাকার কথা?'

'তখন না একবার হিসাব হলো–সব মিলিয়ে আটটা। হেলিকপ্টার ক্র্যাশ

থেকে ছ'টা লাশ, পরে ডাক্তার হাসান আর সার্জেন্ট মোলায়েমকে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু আপনি করছেনটা কী, মিস্টার জয়?'

মেঝেতে হাঁটু গেড়েছে রানা। একটা ঢোক গিলে দ্বিধার ভাবটুকু কাটিয়ে কাপড়ে মোড়া আকৃতিগুলোর উপর হাত বুলাচ্ছে। ওর স্মৃতি থেকে চেতনায় ফিরে আসতে চাইছিল চতুর্থ লাশটা।

স্লেজটায় আটকানো আইডেনটিফাইং লেবেলটার উপর চোখ বুলাল রানা। তারপর হাশমিকে বলল, 'শ্রীলঙ্কান টেকনিশিয়ান তন্ময় তাসমিন-এর দেখছি বেশি কিছু অবশিষ্ট নেই।'

'ক্র্যাশ করা হেলিকপ্টারে ছিল ও!' বললেন হাশমি, অধৈর্য হয়ে উঠছেন। 'কিছুটা যে খুঁজে পাওয়া গেছে তাই তো যথেষ্ট। বেচারাকে রেহাই দিন তো।'

তাঁর কথায় কান না দিয়ে বাঁধনের গিঁটগুলো খুলে সুতি কম্বলটা তুলে ফেলতে চাইছে রানা। কয়েকটা গিঁট খোলার পর যেখানে মাথা থাকবার কথা সেখান থেকে কাপড়টা সরাল।

মাথার বদলে বেশ খানিকটা তুলো রয়েছে ওখানে, শেষ প্রান্তে একটা আর্কটিক-ইস্যু হ্যাট পরিয়ে রাখা হয়েছে। 'আমাদের বোধহয়,' বলল রানা, 'সবটুকুই দেখা দরকার।'

হাশমি বললেন, 'দূর, বাদ দিন তো! কবর দেবার মত কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে। সরকারী দায়িত্ব পালন করার সময় কেউ দুর্ঘটনায় মারা গেলে, তার লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করার নিয়ম আছে–কফিনের ঢাকনি পেরেক ঠুকে বন্ধ করার পর।'

তবে রানা থামছে না দেখে শেষদিকে তাঁর কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে এল। ধীরে ধীরে বাকি গিঁটগুলো খুলে সুতি কম্বল সবটাই সরিয়ে ফেলল রানা। লম্বা কয়েক প্রস্থ কাঠ পড়ে আছে শুধু, ওগুলোই লাশ বা তার হাত-পা।

প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে এক মুহূর্ত বোবা হয়ে থাকলেন হাশমি। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'সাতটা লাশ।'

'কিন্তু থাকার কথা আটটা। তা হলে বাকিটা কোথায়?'

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। কারও চোখে পলক পড়ছে না।

তারপর হাশমি বললেন, 'দাঁড়ান! এক সেকেন্ড! ব্যাপারটা আমাকে ভাল করে বুঝতে দিন। আমাদের হিসাবে থাকার কথা...'

গলা চড়িয়ে তাঁকে থামিয়ে দিল রানা। 'শুনুন, কী ঘটেছে বলছি!' নিজের কানেই কর্কশ লাগছে আওয়াজটা। 'কেউ একজন এখানকার একটা লাশ কোন কাজে ব্যবহার করেছে। তারপর একটা ডামি সাজিয়ে রেখেছে, দেখে যাতে মনে হয় সবগুলোই আছে।'

'বাকিগুলোর কী অবস্থা?' ফিসফিস করে জানতে চাইলেন হাশমি।

তাড়াতাড়ি ওগুলো পরীক্ষা করল রানা।

অবশিষ্ট সবগুলো স্লেজে একটা করে লাশ আছে। খুঁটিয়ে দেখবার দরকার নেই, একবার করে শুধু চোখ বুলাল রানা। ম্লান, মোমের মত, নিষ্প্রাণ মুখ।

ডাক্তার আরিফ হাসানের ছিন্নভিন্ন অবশিষ্ট দেখে পেটের ভিতরটা মোচড়

খেল রানার, প্রায় গলায় উঠে আসা বমিটাকে কোন রকমে ঠেকাতে পারল।

এক স্লেজ থেকে আরেক স্লেজে যাচ্ছে রানা, ওর ঠিক পিছনেই থাকছেন হাশমি, নিঃশব্দে বন্ধ করছেন প্রতিটি ঢাকনি।

কাজটা শেষ হতে সিধে হলো রানা। 'কেন সে একটা লাশ চুরি করবে?'

'কারণ ওটায় কিছু আছে?' সম্ভাবনা বিবেচনা করছেন হাশমি। 'কারণ প্যাথলজিস্ট পরীক্ষা করলে গোপন কিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। এই ব্যাখ্যাটাই মনে আসছে।

তারপর হাশমি ধীরে ধীরে বললেন, 'তবে জিনিসটা নিশ্চয়ই অবভিয়াস কিছু হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুনুন, প্রথম সুযোগেই লাশগুলোকে বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হবে, ঠিক আছে? ওগুলো ডেলিভারি নেয়ার পর ওখানকার মেডিকরা কী করবে?

'কম্বল খুলে লাশগুলো বের করবে তারা, সংশ্লিষ্ট দেশে পাঠানোর জন্যে যত্ন করে সাজাবে। তবে তারা জানে কীভাবে মারা গেছে লোকগুলো। হেলিকপ্টার ক্র্যাশে। কাজেই সন্দেহজনক কিছু খুঁজবে না কেউ...'

'লাশটায় কেউ যদি সন্দেহজনক কিছু না-ই খুঁজবে, তা হলে ওটা সরাবার দরকারটা কী?'

এক মুহূর্ত বোকা বোকা লাগল হাশমিকে। তারপর বললেন, 'শুনুন। আমাদের বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে সমস্ত ফ্যাসিলিটি আছে। প্যাথলজিস্ট চান? পাবেন। মর্গ? আছে। কী, ওই বানচোত লাশ সরাল কেন? বলছি।

'ওই লাশে, তন্ময় তাসমিনের লাশে, এমন কিছু আছে যা খুব সহজেই চোখে পড়বে! সন্দেহ করে কিছু না খুঁজলেও, প্রতিটি লাশই একবার করে দেখবেন প্যাথলজিস্ট ভদ্রলোক। কারণ, বইয়ে লেখা আছে—দেখো। তিনি দেখে ও.কে. করবেন, তবেই না মেডিকরা কফিনে ভরবে ওগুলো। কিন্তু তাসমিনের বেলায় তিনি ও.কে. করবেন না। কারণ লাশের দিকে তাকানো মাত্রই অ্যালার্ম বেজে উঠবে। কাজেই লাশটা চুরি না করে ওই শালার কোন উপায় ছিল না।'

'ভুল,' বলল রানা।

'কেন?'

'কারণ অ্যালার্ম তো তারপরও বাজবে। লাশের বদলে তুলো আর কাঠ পাওয়া যাবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হাশমি। 'তা বটে। আমার ব্রেন বোধহয় ঠিকমত কাজ করছে না!'

'আপনার একার নয়, কারও ব্রেনই হানড্রেড পার্সেন্ট কাজ করছে না।'

'ভুল,' বললেন হাশমি, হাসছেন, যেন বদলা নিতে পেরে খুশি।

'কেন?'

'অন্তত একজন সম্পর্কে এ-কথা আপনি বলতে পারেন না। তার মাথা একশো ভাগ কাজ না করলে আমাদেরকে এভাবে ঘোল খাওয়াচ্ছে কীভাবে?'

হাসল রানা। 'আমাদেরকে ঘোল খাওয়ানো তার উদ্দেশ্য নয়,' বলল ও।

'নিজের কাজে মারাত্মক কোন ভুল করে ফেলেছে সে, সেটা নিশ্চয় বুদ্ধিরই দোষে। সেই ভুল শোধরাতে বা চাপা দিতে এত কিছু করতে হচ্ছে তার।'

'হ্যাঁ, বোধহয় তাই,' ব্যাখ্যাটা মেনে নিলেন হাশমি।

'চলুন, দেখা যাক সব শুনে মেজর কী বলেন।'

খুব সাবধানে ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এল ওরা। দূর থেকে যতটুকু দেখা যায়, মেইন স্ট্রিট খালি। কিন্তু বাঁক ঘুরতেই একেবারে ক্যাপটেন ঘনশ্যাম তিওয়ারির সামনে পড়ে গেল রানা।

সিপাইদের একটা দলকে নিয়ে নিশ্চয়ই কোথাও কোন অভিযানে বেরিয়েছে সে, চোখে-মুখে গাম্ভীর্য আর দাম্ভিকতা।

একেবারে সামনে পড়ে যাওয়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল রানা, অনভিপ্রেত একটা নিম্নচাপ সামলাবার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হচ্ছে।

কিন্তু নিম্নচাপ এত দ্রুত লঘুচাপে পরিণত হলো, হাসি চেপে রাখতে রীতিমত বেগ পেতে হলো রানাকে।

রানাকে দেখা মাত্র চেহারায় অন্যমনস্ক, উদাস ভাব আনল তিওয়ারি; তারপর সিপাইদের উদ্দেশে হুংকার ছাড়ল, 'অ্যাবাউট টার্ন!' পরমুহূর্তে নাটকীয় ভঙ্গিতে উল্টোদিকে ঘুরে গেল। 'কুইক মার্চ!' আরেকটা চিৎকার ছেড়ে সদলবলে ফিরে যাচ্ছে সে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভান করে গেল রানা বা হাশমিকে সে দেখতে পায়নি।

নয়

ফিরে এসে ওরা দেখল মেজর ফালকে ঘুমাচ্ছে।

ক্যাবিনের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করছে রানা, কোন রকম ইতস্তত না করে বার কয়েক ঝাঁকি দিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে ফেললেন হাশমি।

লাশের ট্রেঞ্চে কী দেখে এসেছে দ্রুত বলা হলো ফালকেকে। তার শরীরের অবস্থা মোটেও ভাল নয়, ভয়ানক দুর্বল, তার উপর ঘুমটা যাচ্ছে না। তবে চোখ মিট মিট করে ওদের কথা মন লাগিয়ে শুনল সে।

সব বলার পর শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, চিন্তা করবার জন্য সময় দিচ্ছে ফালকেকে।

অবশেষে মুখ খুলল ফালকে। 'না, আমি এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না।' ক্লান্তিতে বিছানায় আবার কাত হলো সে, একটু পর আপনা থেকে বুজে এল চোখ দুটো।

রানা হতাশ; একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবল, ব্যাপারটা নিয়ে কর্নেল যাদবের সঙ্গে আলাপ করা যায় কিনা।

যায়, তিনি যদি ইতিমধ্যে কথা বলার মত সুস্থতা ফিরে পেয়ে থাকেন।

বন্ধ চোখ কখন খুলে গেছে খেয়াল করেনি রানা, হঠাৎ শুনতে পেল মেজর

ফালকে বলছে, 'কার লাশ বললেন যেন? লোকটার নাম কী?'

'তাসমিন,' বলল রানা। 'তন্ময় তাসমিন, শ্রীলঙ্কান।'

ঠোঁট কামড়াল ফালকে। 'মাস দুয়েক আগে নেতাজি ক্যাম্পে একটা শো হয়েছিল, বুঝলেন,' বলল সে।

'শো? কী ধরনের শো?'

'স্টেজ শো। ক্যাম্প কনসার্ট। ক্যারিকেচার আঁকা, যাকে খুশি তাকে নিয়ে গান গাওয়া—সবাই মিলে মজা করার জন্য যা হয় আর কী।'

রানার একবার সন্দেহ হলো, ফালকে বোধহয় প্রলাপ বকছে। 'সেই শোর সঙ্গে তন্ময়ের কী সম্পর্ক?'

'তন্ময় একটা কমেডিতে ডাক্তার আরিফ হাসানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। তারটাই শ্রেষ্ঠ পারফর্মেন্স হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।'

'তাতে কী?' ধৈর্য হারিয়ে জানতে চাইলেন হাশমি।

'এক সেকেন্ড,' বলল রানা, তারপর মেজরের দিকে একটা আঙুল তাক করল। 'আপনি বলতে চাইছেন ডাক্তর হাসানের মত দেখতে ছিল সে?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ফালকে। 'হুবহু না হলেও, এই ধরনের শো করার জন্যে প্রচুর মিল ছিল। লম্বা-চওড়া কাঠামো, কালো চুল, কালো চোখ, এমনকী গায়ের রঙটাও। আবার বলছি হুবহু নয়, কাছাকাছিও নয়—তবে মেকআপ নেয়ার পর সাদা কোট পরে আর হাতে স্টেথস্কোপ ঝুলিয়ে মঞ্চে উঠলে...'

হাশমি তাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিলেন। 'তা হলে ওখানে ওটা যদি ডাক্তার হাসানের লাশ না হয়...'

প্রচুর আলোচনা হলো, কিন্তু কোন সমাধানে পৌঁছানো গেল না। আগের রহস্যগুলোরই কোন মীমাংসা হয়নি এখনও, সেগুলোর সঙ্গে নতুন আরেকটা যোগ হলো—দৈহিক গঠনের দিক থেকে তন্ময় আর ডাক্তারের মধ্যে বেশ কিছুটা মিল ছিল, সেই মিলের কারণে তাদের লাশ কী কাজে ব্যবহার করা হতে পারে?

অবশেষে কথাটা মেজর ফালকের মুখ থেকে বেরুল, 'প্রথমে জানতে হবে ওখানে ওটা কার শরীর।'

লাশটার অবশিষ্ট এখনও রানার চোখের সামনে ভাসছে। 'নিশ্চিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। যে-ই হোক...ভয়ানক অবস্থা তার...দেখলেই চেনা যাবে এমন কিছু নেই। তার ওপর দিয়ে একটা বুলডোজার চালানো হয়েছে।'

'ফিঙ্গারপ্রিন্ট?' অবাস্তব একটা প্রশ্ন করলেন হাশমি।

জবাব দেওয়ার ঝামেলায় গেল না কেউ।

তারপর ফালকে বলল, 'বুট।'

'বুট কী?'

চোখের পাতা এখনও জোর করে খুলে রাখতে হচ্ছে ফালকেকে। তার ঠোঁট রাবারের মত একটু চওড়া হতে বোঝা গেল হাসছে সে। 'বুটের পিছনে,

ভেতর দিকের লেদারের গায়ে, কত সাইজ লেখা থাকে।'

ডাক্তারের চেম্বারে চলে এল ওরা। ফালককে হেঁটে আসতে সাহায্য করল রানা।

আরিফ হাসানের একটা লকার খুললেন হাশমি। ভিতরে ডাক্তারের কয়েকটা ওভারঅল, কিছু স্টেরাইল প্যাক রয়েছে। সবুজ রাবারের জুতা দেখা গেল লকারটার মেঝেতে। এগুলো শুধু অপারেটিং থিয়েটারে ব্যবহার করা হয়।

হাতে একটা জুতো নিয়ে পরীক্ষা করলেন হাশমি। 'সাইজ এগারো,' বললেন তিনি।

রানা বলল, 'এটা জেনে কোন লাভ নেই, যতক্ষণ না তন্ময়ের সাইজটাও জানছি আমরা।'

'ইলেভেন রেগুলার ফিটিং,' বললেন হাশমি, ফালকের দিকে ফিরলেন। 'মোট ক'রকম ফিটিং হয়?'

'তিন। ন্যারো, রেগুলার, ওয়াইড।'

'এগারো খুব বড় সাইজ।'

'তন্ময়ও লম্বা-চওড়া ছিল,' বিড়বিড় করল মেজর।

রানা বলল, 'আমরা এখন বুট দেখতে যাব।'

হাশমির চেহারা ম্লান হয়ে গেল, তবে তিনি বুঝলেন ট্রেঞ্চে আরেকবার তাঁদেরকে যেতেই হবে। নোংরা কম্বলের বোঝাটা নিতে যাচ্ছেন, মানা করল রানা। 'ক্যাপটেন তিওয়ারি আমাদেরকে আর বিরক্ত করবে বলে মনে হয় না,' বলল ও। 'আপনি বরং একটা ছুরি আর কাঁচি নিন সঙ্গে, দরকার হবে।'

মেইন স্ট্রিটের পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে কারও ছায়া পর্যন্ত নেই। আবার ওরা ডেথ ট্রেঞ্চ, অর্থাৎ মৃত্যু গহ্বরে চলে এল। ভিতরে ঢুকেই হাত দিল কাজে। কঠিন, ঘৃণ্য, কদর্য একটা কাজ। থেঁতলানো পায়ে ফেল্ট বুট জমে আটকে গেছে, রানা চেষ্টা করল যতটা ভালভাবে পারা যায় কেটে বের করে আনতে।

বুটের সাইজ সাড়ে দশ।

'একটা পার্থক্য বটে,' বলল রানা, 'তবে শুধু এটার ওপর নির্ভর করে তদন্ত এগোবে না।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে হাশমি বললেন, 'ডগ ট্যাগ। তার গলায় থাকার কথা, কর্ডের সঙ্গে ঝুলবে।'

কিন্তু নেই।

হাশমি আবার বললেন, 'নিয়ম হলো, ট্যাগটা সবাইকে সারাক্ষণ পরে থাকতে হবে। এখানে না থাকার মানে কি ওই বেজন্মাটা খুলে নিয়েছে?'

'হ্যাঁ, বোধহয়।'

'আংটি? ঘড়ি?'

দু'জন মিলে বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর ছিন্নভিন্ন লাশের একটা পকেটে হাত গলাতে পারা গেল। এই কাজটা করতে গিয়ে হাশমি একা নন, রানাও প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিন্তু কোন লাভ হলো না। পকেটটা খালি।

এক সময় মানুষ ছিল, এখন দলা পাকানো খানিকটা মাংস, যেন এইমাত্র ফ্রিজ থেকে বের করা হয়েছে। তার বাম হাতটা খুঁজে নিল ওরা–হাড় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে আছে, মাংস থেঁতলানো। গ্লাভটা কেটে বের করতে গলদঘর্ম হতে হলো ওদেরকে।

না। আঙুলে আংটি নেই, কবজিতেও ঘড়ি দেখা যাচ্ছে না।

তারপর, হঠাৎ রানার খেয়াল হলো–একদৃষ্টে ভাঙা হাতটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। খুঁটিয়ে লক্ষ করছে চওড়া আঙুল আর ভাঙাচোরা নখ। মধ্যমায়, শুধু এই একটাই অক্ষত, কাটা একটা দাগ দেখা যাচ্ছে।

ঝুঁকে বসে থাকল রানা, কয়েকটা দিন পিছনে ফিরে গেছে, স্মরণ করছে–ডাক্তার হাসানের সঙ্গে বসে কফি খাচ্ছে ও, একটা মিউজিক শোনাচ্ছেন তিনি; ভদ্রলোকের হাত দেখে মনে হলো, এত সুন্দর আঙুল শুধু শিল্পীদেরই মানায়।

যে আঙুল ওর এত ভাল লেগেছিল, এ সে আঙুল নয়। মাথা তুলল রানা, হাশমির চোখে চোখ রাখল। 'এটা ডাক্তার হাসানের হাত নয়।'

'প্রশ্নই ওঠে না!'

এই আবিষ্কার আরও এক প্রস্থ আলোচনার সূত্রপাত ঘটাল। সেটা মাঝপথে বন্ধ করে দিল রানা, তারপর হাশমিকে নিয়ে ফিরে এল মেজর ফালকের কাছে।

ইতিমধ্যে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে ফালকে। এবার আর তার কাঁচা ঘুম ভাঙাতে মন চাইল না হাশমির।

হসপিটাল ক্যাবিনে, ফালকের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে, নিচু গলায় আলাপ করছে দু'জন।

ডাক্তার আরিফ হাসান এখনও বেঁচে আছেন, এটা বিশ্বাস করা যায় না। ধারণাটাই অবাস্তব মনে হয়।

তন্ময়ের শরীরে ডাক্তার হাসানের কাপড় পরিয়ে এমন জায়গায় ফেলে রেখে আসা হলো যেখানে একটা বুলডোজার সেটাকে চাপা দেবে, যাতে কেউ চিনতে না পারে–এটারও কোন কারণ বা ব্যাখ্যা জানা নেই ওদের।

তারপর ওই স্লেজটা। এমনভাবে সাজানো হয়েছে দেখে যাতে মনে হয় ওটায় একটা লাশ আছে। কিন্তু ধোঁকা দেওয়ার এই চেষ্টাও অর্থহীন মনে হয়। স্লেজটা বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পে পৌঁছালে ধোঁকাবাজিটা ধরা পড়ে যাবে। তা হলে এত কাঠখড় পুড়িয়ে কী লাভ হলো?

ব্যাপারগুলো মেলানো যাচ্ছে না।

এখন শুধু জানা যাচ্ছে, ডাক্তার হাসান আর টেকনিশিয়ান তন্ময় অজ্ঞাত কোন কারণ ছাড়াই নিখোঁজ হয়েছে। ধরে রাখা যেতে পারে, তারা কেউ বেঁচে নেই।

হাশমি হঠাৎ ভুরু কুঁচকে বললেন, 'দেখুন, আমরা কিছু ফ্যাক্টস জানতে পেরেছি, ঠিক আছে? এখন আমাদের উচিত কর্তৃপক্ষের সাহায্য চাওয়া।'

'না,' বলল রানা।

'কেন?'

'কারণ, অপরাধী যে-ই হোক, সে জানে না আমরা ইতিমধ্যে কতদূর এগিয়েছি। ক্যাপটেন তিওয়ারিকে কিছু বলা মাত্রই গোটা ক্যাম্পের সবাই সব কিছু জেনে ফেলবে।'

'তারমানে কি আপনি বলতে চাইছেন, চেষ্টা করলে আমরাই তাকে ধরতে পারব?'

'হ্যাঁ, চেষ্টা করলে অবশ্যই পারব। কেন, বলিনি, তাকে ধরতেই তো আইসক্যাপে এসেছি আমি। তবে এখনও কিন্তু তার বিরুদ্ধে নিরেট কোন প্রমাণ আমরা যোগাড় করতে পারিনি।'

আড়মোড়া ভাঙলেন হাশমি। 'আমার একটা কাজ আছে। যাই, একবার ঘুরে আসি।'

'কী কাজ? কোথায়?' রানা বিস্মিত।

'আমাকে একবার রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চে যেতে হচ্ছে।' নোংরা কম্বলের বোঝাটা তুলে নিলেন হাশমি।

'কী কাজে যাচ্ছেন, আমাকে বলে যাবেন না?'

এরইমধ্যে দরজার কাছে পৌঁছে গেছেন হাশমি। 'অবশ্যই বলব আপনাকে। তবে পরে, ঠিক আছে? ভাল কথা, তিওয়ারি ঝামেলা শুরু করলে কাভার দেবেন আমাকে।'

তাঁর পিছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতে দেখল রানা। খানিকটা বিব্রত বোধ করছে। ওর দৃষ্টিতে, এই লুকোচুরি খেলার কোন মানে হয় না।

হাশমির বিছানায় শুয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মেজর ফালকে। এখন যদি এসে পড়ে তিওয়ারি, তার প্রতিক্রিয়া সম্ভবত দেখার মতই হবে। হাশমিকে কাভার দেওয়ার জন্য রানা তাকে বলবে, মেজরই ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোককে মুক্ত করে দিয়ে তার বিছানাটা দখল করে নিয়েছে। ইমিডিয়েট বস্ হওয়ায় মেজরের বিরুদ্ধে কী বলবে তিওয়ারি?

ডাক্তারের চেম্বারে ফিরে এসে একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসল রানা, ঘুম তাড়াবার জন্য সিগারেট ধরাল। চেম্বারের ভিতর হসপিটাল ওয়ার্ডের কোন আওয়াজ এসে পৌঁছাচ্ছে না। অনুভব করল, খুব ক্লান্ত বোধ করছে ও। ডেস্কের একটা দেরাজ টেনে তার উপর পা তুলে দিয়ে চোখ বুজল।

ঘুমাবার কোন ইচ্ছে নেই রানার। যা কিছু বাহুল্য, মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কেসটা নিয়ে ভাবছে।

সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন, কে সেই লোক?

এক সময় একটা সম্ভাবনা বেশ জোরাল হয়ে উঠল—ক্যাম্পের দেড়শো লোকের মধ্যে একজন সে, কিন্তু তার সঙ্গে ওর পরিচয় হয়নি।

সাদাদের টাকা খাওয়া ভারতীয় একজন সামরিক অফিসার হতে পারে, হতে পারে কোন জুনিয়ার পাকিস্তানি ইঞ্জিনিয়ার। এমনকী ভুটান-মালদ্বীপ-নেপাল বা শ্রীলঙ্কার কেউও হতে পারে।

বার কয়েক চেয়ার ছেড়ে মেজর ফালকেকে দেখে এল রানা। তৃতীয়বার

চেয়ার ছাড়তে যাচ্ছে, ডান হাঁটুর নীচের হাড় খোলা দেরাজটার সঙ্গে ধাক্কা খেল।

এক পায়ে কয়েক সেকেন্ড লাফাল রানা, ব্যথায় চোখ-মুখ কুঁচকে আছে, তিরস্কার করছে নিজেকে। জোরে ঠেলে দেরাজটা বন্ধ করল, তখনই আইডিয়াটা ঢুকল মাথায়—কিছু পাওয়া যাক বা না যাক, অন্তত সময় কাটানোর জন্য হলেও ডাক্তার হাসানের দেরাজগুলো একবার সার্চ করা যেতে পারে।

নোটবুকটা পুরানো, পাতাগুলো ঢিলে-ঢালা হয়ে আছে। ঠিক যে লুকানো ছিল, তা নয়, তবে ওটার উপরে কিছু কাগজ আর ফোল্ডার পড়ে ছিল। রানাকে আকৃষ্ট করল হাতে লেখা শিরোনামটা— 'প্রতিকূল পরিবেশে পড়াশোনা'।

নোটবুকটা খুলে পড়ছে। খানিক পরই বুঝতে পারল রানা, ডাক্তার হাসান কোন মেডিক্যাল জার্নালে পাঠাবার জন্য লেখাটা লিখতে বসেছিলেন, বিষয় ছিল—নেতাজি ক্যাম্পের মত বৈরি পরিবেশে মানুষের সম্ভাব্য আচরণ কেমন হতে পারে।

কিছুদূর এগোবার পর তাঁর লেখার বিষয়বস্তু আর ধাঁচ বদলে যেতে শুরু করল। গুরু-গম্ভীর অ্যাকাডেমিক ভঙ্গি থেকে সরে এসে সামান্য হাস্য-রসাত্মক হয়ে উঠল। পরিষ্কার বোঝা গেল, সিরিয়াস প্রজেক্ট বাদ দিয়ে নিজেকে আনন্দদানের চেষ্টায় আছেন ভদ্রলোক।

পরে স্টাইলটা আরেকবার বদলাল। ছোট্ট পরিসরে ছয়জনের চরিত্রচিত্রণ, দৈর্ঘ্যে কোনটাই বিশ-বাইশ লাইনের বেশি নয়। কোন নাম বা পদ উল্লেখ করা হয়নি, এমনকী কে কী কাজ করে তাও না। তা সত্ত্বেও প্রথম লেখাটি যে কর্নেল ভীম সিং যাদবকে নিয়ে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাগজের মার্জিনে ছোট একটা প্রশ্ন আছে—'ম্যানিক?'

সবগুলো লেখাই পড়ল রানা, যদিও চিনতে পারল না একজনকেও। তবে পড়া শেষ হতে নোটবুক বন্ধ করল না, ফিরে গেল চার নম্বর চরিত্রে।

ডাক্তার হাসান তার নাম দিয়েছেন: জনাব বহুরূপী ধুরন্ধর।

'ব্যাপারটা বুঝতে অনেক সময় লেগেছে আমার,' ডাক্তার হাসান লিখেছেন, 'এই ব্যক্তিকে আমি যেভাবে দেখি, আর কেউ তাঁকে সেভাবে দেখে না। আমরা বেশিরভাগই, জীবনের শুরুর দিকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি দুনিয়ার সামনে নিজের কোন্ চেহারাটা পরিবেশন করতে চাই, তারপর সেটাকে ডেভলপ করতে থাকি। আমাদের জনাব বহুরূপী ধুরন্ধর একটা বা দুটো নয়, আমার ধারণা পাঁচ-সাতটা ফ্রন্ট বা চেহারা ডেভলপ করেছেন।

'এটা একটা খেলা—যার সঙ্গেই দেখা হোক, তার সামনে সামান্য হলেও নিজের আলাদা একটা চেহারা তুলে ধরতে হবে। তাঁর ভিতরে জ্যাকল অ্যান্ড হাইড-এর সমস্ত লক্ষণ বা উপকরণ বিদ্যমান, কিছু পরিমাণে আইনস্টাইনও আছেন। তাঁর সম্পর্কে আমার কৌতূহল মাত্রা ছাড়ানোই বলতে হবে। অনেক সময় নিজের লাগাম টেনে ধরতে হয়; বেশ ক'বার এমন হয়েছে— কাজে ব্যস্ত অবস্থায় কেমন দেখায় তাঁকে জানার জন্য রওনা হয়েও মাঝপথ থেকে ফিরে

এসেছি।

'আমি যে তাঁর সম্পর্কে জানি, এটা তিনি বোঝেন বলেই মনে হয়। কারণ মাঝে মধ্যে এমন দৃষ্টিতে তাকান, তাঁর সঙ্গে আমিও যেন কোন ব্যাপারে ষড়যন্ত্রে জড়িত।

'তাঁর সম্পর্কে মানুষের ধারণা একেকজনের একেকরকম। কারও মতে—"ভালো কিছু করতে পারুক বা না পারুক, নিজের কাজে এত নিষ্ঠা খুব কম মানুষের মধ্যে দেখা যায়। তবে কেউ যদি জানতে চায় তিনি মানুষটা কেমন, আমি বলব, বাস্টার্ড!"

'আবার কেউ বলে—"এত ভালো কী সত্যি ভালো? পারফেক্ট জেন্টেলম্যান বলে মনে হয়।"

'বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, কীভাবে যেন সব সময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যান তিনি। লোকজনের আলোচনার খোরাক হওয়া থেকেও কী এক আশ্চর্য কৌশলে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন।

'প্রথমবার আমার কাছে এলেন এক লোকের সমস্যা নিয়ে। লোকটা নাকি উদ্বেগ আর হতাশায় ভুগছে। দয়া করে কি আমি একবার দেখব?

'আমি যখন লোকটাকে দেখলাম, সত্যি সে উদ্বেগ আর হতাশায় ভুগছিল। কারণ হিসাবে সে জানাল, জনাব ব.ধু. তার পিছনে লেগেছে। বললাম, পিছনে লেগেছে মানে, ব্যাখ্যা করুন! সে বলল, ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। ব.ধু.-র উপস্থিতিই হুমকি আর ঘৃণার কারণ সৃষ্টি করে।

'অ্যান্টি-ডিপ্রেশন ট্যাবলেট দিয়ে বিদায় করলাম লোকটাকে।

'আবার জনাব বহুরূপী ধুরন্ধরের সঙ্গে দেখা হতে কী চিকিৎসা করেছি বললাম, কিন্তু চেপে গেলাম কারণটা। আর, সেই প্রথম, আমার দিকে চট করে একবার এমন দৃষ্টিতে তাকালেন—পরস্পরের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমরা যেন সচেতন।

'এই ব্যাপারটার পর টুকে রাখলাম, তাঁর ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে হবে।

'বেশ কয়েকজনকে তাঁর নাম বললাম। পাঁচজনকে একসঙ্গে নয়, প্রত্যেককে আলাদাভাবে।

'এরপর থেকেই হতবুদ্ধিকর চিত্রটা বেরিয়ে আসতে শুরু করল। প্রত্যেকেই তাঁর সম্পর্কে আলাদা কিছু বলে, কারও সঙ্গে কারওটা মেলে না।

'তাদের সব কথা ছেঁকে সার যেটা পাওয়া গেল—এই ব্যক্তি সবার চেয়ে সবদিক থেকে উন্নত, বুদ্ধিমান, কৌশলী আর শ্রেষ্ঠ।

'চিন্তার বিষয় হলো, আমারও বিশ্বাস, মানুষের এই ধারণা ভিত্তিহীন নয়।

'মাঝে মধ্যে আমি ভাবি, অন্য কোন পরিবেশে মানুষ হবার সুযোগ পেলে, অক্সফোর্ড বা হার্ভার্ড-এ, এতদিনে আর্মির জেনারেল বা নিজ দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার পথে অনেক দূর এগিয়ে থাকতেন তিনি।

'কিছুদিনের মধ্যে আমি তাঁর ইন্টারভিউ নেয়ার জন্য অত্যন্ত নামকরা একদল সাইকিয়াট্রিস্টকে আমন্ত্রণ জানাব। তাঁরা প্রত্যেকে তাঁকে আলাদাভাবে

দেখবেন। আমি নিশ্চিত, তাঁদের সবার টনক নড়িয়ে দেবেন উনি; শুধু তাই নয়, তাঁর কোন ব্যাপারে তাঁরা একমত হতে না পেরে নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু করে দেবেন। তার আগে পর্যন্ত চুপচাপ থাকব আমি, নজর রাখার কাজটা চালিয়ে যাব।'

লেখাটা আরও দু'বার পড়ল রানা। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, মাথাটা কাজ করছে ঝড়ের বেগে।

ক্লু খুঁজছে ও। এ কী বেঈমানটার, খুনিটার পোর্ট্রেইট? হয়তো তাই-ই, কিন্তু শব্দ বা ভাষা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে জনাব বহুরূপী ধুরন্ধরের পরিচয় সম্পর্কে বা তাঁর পদ বা বয়সের ব্যাপারে এতটুকু আভাস পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

তাঁর ভিতরে কিছু পরিমাণে আইনস্টাইনও আছেন, এই কথাটার মানে কী?

রানার একবার ঝোঁক চাপল, মেজর ফালকের ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞেস করে নেতাজি ক্যাম্পে ম্যাথামেটিক্যাল জিনিয়াস কেউ আছে কি না। তারপর ভাবল, ডাক্তার হাসানের কথা ঠিক হলে আলোচ্য চরিত্র সম্পর্কে মেজর ফালকের ধারণা সম্পূর্ণ অন্য রকম হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা।

তবু, ব্যাপারটা নিয়ে হাশমির সঙ্গে কথা বলবে রানা। হাতঘড়ি দেখল ও। রাত দুটো।

সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চে যাচ্ছে। ডাক্তার হাসানের ক্যারেক্টার স্কেচ অস্থির করে তুলেছে ওকে।

কিন্তু হসপিটাল থেকে বেরুতেই থমকে দাঁড়াতে হলো রানাকে। প্রথমে কিছুক্ষণ ঘ্যারঘ্যার করে যান্ত্রিক শব্দজট ছড়াল পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, তারপর ভেসে এল ক্যাপটেন তিওয়ারির কর্কশ চিৎকার। 'নেতাজি ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার ক্যাপটেন ঘনশ্যাম তিওয়ারি বলছি। একটি বিশেষ ঘোষণা। ঘোষণাটি শুধুমাত্র বাংলাদেশী ডিআইজি মিস্টার বিজয় হাসানের উদ্দেশে প্রচারিত হচ্ছে।

'মিস্টার জয়, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এখনও বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনি। ক্যাম্পের শৃংখলা ভঙ্গ করায় আপনাকে অবশ্যই এখানকার নিয়ম অনুসারে শাস্তি পেতে হবে। তবে সেটা যথা সময়ে। ভুলেও ভাববেন না, মেইন স্ট্রিটে বেরুবার সময় আপনাকে দেখতে পাইনি আমরা। সম্মানী মানুষ, তাই প্রথমবার দেখেও না দেখার ভান করা হয়েছে।

'কিন্তু এরপর আর আপনাকে সম্মান দেখানো হবে না। কাজেই সাবধান। ঘোষণাটি শেষ হলো।'

অত্যন্ত পাজি লোক এই ক্যাপটেন তিওয়ারি, ভাবল রানা, চেষ্টা করা উচিত তার কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে থাকা। তবে তার ভয়ে ঘরের ভিতর বসে থাকার পাত্রও নয় ও।

মেইন স্ট্রিটের আলো আগের চেয়েও ম্লান দেখল রানা, কয়েকটা আলো আবার নিভিয়ে রাখা হয়েছে।

সাবধানে, একই গতিতে হাঁটছে ও; আলো কম থাকায় খুশি। এখন এমনকী তিওয়ারির সঙ্গে ধাক্কা খেলেও, ওকে চিনতে পারবে না সে, যদি না দু'জনেই সরাসরি একই আলোর নীচে থাকে।

তবে তিওয়ারির সঙ্গে রানা ধাক্কা খেল না। ধাক্কা খেল, অকস্মাৎ, গাঢ় কালির মত অন্ধকারের সঙ্গে। বিনা নোটিশে, এমনকী এতটুকু কম্পন ছাড়াই, একসঙ্গে নিভে গেল সমস্ত আলো।

পা তুলতে গিয়েও তুলল না রানা, এক সেকেন্ড চিন্তা করল, তারপর দ্রুত সরে এল বরফ দেয়ালের পাশে। এরইমধ্যে হিসাব করা হয়ে গেছে ওর—রিয়্যাক্টর আছে ডানদিকের চার নম্বর ট্রেঞ্চটায়।

সিদ্ধান্ত নিল, আলো ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকাটা বোকামি হবে। কারণ আলো কখন ফিরবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তারচেয়ে বরফের দেয়াল ঘেঁষে এগোবে ও, তাতে পথ হারাবার কোন ভয় নেই।

বিশ গজের মত এগোল রানা, প্রথম ট্রেঞ্চের মুখটাকে পাশ কাটিয়েছে। মাথায় দুশ্চিন্তা, ভাবছে ডিজেল জেনারেটরে আবার নিশ্চয় বড় ধরনের কোন গোলযোগ দেখা দিয়েছে। পা ফেলার নরম আওয়াজটা ঠিক এই সময় শুনতে পেল রানা।

দাঁড়িয়ে পড়ল। কান পেতে শুনছে। আওয়াজটা দ্রুত এদিকেই এগিয়ে আসছে। এক লোকের ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও পাচ্ছে রানা, এতক্ষণ যেন দৌড়েছে সে।

ডিজেল শেডটা যেহেতু ওদিকে, তাই এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে ওখান থেকেই ছুটে বেরিয়ে এসেছে লোকটা, কোথাও থেকে সাহায্য আনতে যাচ্ছে। তবে তা না-ও হতে পারে।

রানাকে জানতে হবে লোকটা কে। ওর কাছে কোন অস্ত্র নেই, ওই লোকের কাছে থাকলেও থাকতে পারে। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু রানা তাকে থামতে বলা মাত্র ওর অবস্থান জেনে ফেলবে সে।

নিরাপদ উপায় একটাই, লোকটাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়া। পারকা পরে থাকায় খুব একটা ব্যথা পাওয়ার কোন কারণ নেই।

এ-সব চিন্তা এক কি দু'সেকেন্ডের মধ্যে সেরে ফেলল রানা। কান পেতে আছে এখনও। লোকটা একেবারে কাছে চলে এসেছে, খুব বেশি হলে আর ছয়-সাত হাত দূরে। তার আসবার পথে একটা পা বাড়িয়ে দিল ও, অপর পা বরফের মেঝেতে শক্ত অবলম্বন হয়ে আছে, ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটা হাত লম্বা করে দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রেখেছে।

সম্ভবত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই লোকটাকে সাবধান করে দিয়েছে। তবে প্রস্তুতিও ছিল তার।

আচমকা মুখের উপর আলো জ্বেলে প্রথমেই রানাকে প্রায় অন্ধ করে দিল সে।

রানা শুধু বুঝতে পারল তীব্র আলোর উৎস একটা টর্চ, আর দেখতে পেল লোকটার অপর হাতে ধরা লম্বা ছুরিতে আলো লাগায় ঝিকিয়ে উঠল ধারাল

ফলা।

শক্তভাবে স্থির থাকবার জন্য পজিশন নিয়ে আছে রানা, এই অবস্থায় ক্ষিপ্রবেগে কিছু করা সম্ভবই নয়। ছুরির কোপ সরাসরি ওর চোখে মারতে যাচ্ছে লোকটা, বুঝতে পেরে ঝপ করে বসে পড়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না ওর।

অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য তার রিফ্লেক্স! টার্গেট মিস করা সত্ত্বেও ভারসাম্য হারায়নি, রানার পতনকে অনুসরণ করল তার লম্বা একটা পা।

ইতিমধ্যে নিভে গেছে টর্চ। কাঁধে বুটের প্রচণ্ড লাথি খেয়ে বরফের উপর রানার শরীরটা পিছলাচ্ছে, লাফ দিয়ে সেটাকে টপকে গেল প্রতিপক্ষ।

আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় নিল রানা। ইতিমধ্যে লোকটার ছুটন্ত পদশব্দ মিলিয়ে গেছে দূরে।

তারপর রানা বুঝতে পারল সর্বনাশটা কী, আর কোথায় সেটা ঘটেছে।

হঠাৎ করেই আবার আলো জ্বলে উঠল, তবে এবার ওটা কাঁপা কাঁপা আগুনের লালচে আলো, বেরিয়ে আসছে ডিজেল ট্রেঞ্চ থেকে!

মুহূর্তের জন্য ভাবল রানা, ঘুরে লোকটার পিছু নেয়। কিন্তু কোন লাভ নেই, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তার বদলে ট্রেঞ্চটার লালচে মুখ লক্ষ্য করে ছুটল ও, বাঁক নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

ঢুকেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। হাটের পুরো একটা পাশ দাউ দাউ করে জ্বলছে।

সংবিৎ ফিরে পেয়েই ট্রেঞ্চের দেয়াল থেকে ছোঁ দিয়ে ফায়ার অ্যাক্স আর এক্সটিংগুইশার টেনে নিল রানা, তারপর হাটের দরজা লক্ষ্য করে ছুটল।

ওর ছুটন্ত পা থেকে চারদিকে পানি ছলকাচ্ছে। তারমানে কী আগুনের আঁচে এরইমধ্যে প্রচুর বরফ গলে গেছে? রানার কাছে ব্যাপারটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

দশ

কাঠের দরজা দড়াম করে খুলে ফেলতেই আগুনের আঁচ ধাক্কা মারল রানাকে। এরইমধ্যে এত বেশি ছড়িয়ে পড়েছে শিখাগুলো যে ডিজেল শেডকে রক্ষা করার কোন উপায় নেই।

কাঠ পোড়া ধোঁয়ায় দ্রুত ঢাকা পড়ে যাচ্ছে জায়গাটা, চোখে পানি আর জ্বালা নিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করছে রানা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়া এত ঘন হয়ে উঠবে যে কোথায় কী আছে তার কিছুই দেখা যাবে না। বড় আকৃতির জেনারেটর তিনটে ইস্পাতের পাত দিয়ে মোড়া মেঝের সঙ্গে বোল্ট দিয়ে আটকানো, অর্থাৎ সরানো যাবে না।

পোর্টেবল জেনারেটর লক্ষ্য করে ছুটল রানা, বড়ে মিয়ায় তুলে বঙ্গবন্ধু

ক্যাম্প থেকে যেটা নিয়ে এসেছিল ও। কাছে এসে প্রথমেই চোখ বুলাল কন্ট্রোল প্যানেলে। অফ করা রয়েছে, কানেকশন বিচ্ছিন্ন। চাকা লাগানো আছে, তাই টো হ্যান্ডেলটা ধরে টানতে শুরু করল রানা।

কিন্তু জিনিসটার ওজন দু'হাজার পাউন্ড, রানা ওটাকে নড়াতেই পারছে না। দেখা যাক অ্যাক্স-এর হাতলটাকে লিভার হিসাবে ব্যবহার করলে কাজ হয় কি না।

মাউন্টিং-এর নীচে ওক কাঠের হাতলটা ঢুকিয়ে উপর দিকে চাড় দিচ্ছে রানা, ঘাড় ফিরিয়ে চট করে একবার তাকাতে দেখল আগুন এরইমধ্যে শেষপ্রান্তের দেয়াল খেয়ে ফেলতে শুরু করেছে। পারকা পরে থাকা সত্ত্বেও আঁচ লাগছে গায়ে। তবে ভাগ্য বলতে হবে যে জেনারেটরটা ইঞ্চি কয়েক নড়ল।

আরেকটা চাড় দিল রানা, এবারও নড়ল। কিন্তু আগুনের আঁচ দ্রুত বাড়ছে, আর চোখ থেকে হরদম পানি বেরুতে থাকায় প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে ও।

আবার চাড়।

প্রতিবার মাত্র ছ'ইঞ্চি গড়াচ্ছে জেনারেটর।

তারপর আর সময়ও পাওয়া গেল না, কারণ রানার পিঠে অসহ্য হয়ে উঠল আঁচটা।

হাত বাড়িয়ে খপ করে এক্সটিংগুইশারটা ধরতে এক সেকেন্ড লাগল রানার। এক ঝটকায় প্লাঞ্জারটা খসিয়ে ফেলে এমন জায়গায় দাঁড় করাল ওটাকে, এখন ওটা থেকে উথলে বেরিয়ে আসা ফোম ওর পিঠটাকে কিছুটা হলেও আড়াল দেবে।

নতুন করে শুরু হলো কাজটা—পোর্টেবল জেনারেটরের একজোড়া চাকার মাঝখানে কুড়ালের ফলা ঢুকিয়ে উপর দিকে টানা।

ক্ষিপ্ত বললে কিছুই বলা হয় না, এই মুহূর্তে রানা উন্মত্ত।

নড়াচড়ায় এতটুকু বিরতি নেই, একের পর এক চাড় দিয়ে খুনি বোঝাটাকে মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

কাজের ফাঁকে চট করে একবার পিছনটা দেখে নিল রানা। শেডের এখন তিনটে দেয়ালই জ্বলছে। শুধু তাই নয়, আগুন ইতিমধ্যে ছাদেরও নাগাল পেয়ে গেছে। তবে ইস্পাতের পাত দিয়ে মোড়া বলে হাটের মেঝে এখনও ঠিক আছে।

রানা ক্লান্ত। দু'হাজার পাউন্ড জেনারেটরের নীচে কুড়াল বাধিয়ে বারবার টান দেওয়ায় ওর হাত, কাঁধ, পিঠ আর পায়ের পেশি ব্যথায় টনটন করছে, মনে হচ্ছে শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

অথচ এখনও দশ-এগারো ফুট ঠেলতে হবে ওটাকে।

অ্যাক্স অর্থাৎ লিভার ধরে আবার টানছে রানা। অল্প একটু এগোল জেনারেটর। আবার। তারপর আবার। প্রতিটি মরিয়া টানে আতঙ্ক বাড়ছে আর শক্তি কমছে।

রানার মাথার উপর মুড়মুড় আওয়াজ তুলে কড়িকাঠ পুড়ছে, ওর গায়ে খসে পড়ছে ঝাঁক-ঝাঁক আগুনের ফুলকি। আগুন এখন অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ছড়াচ্ছে।

তবে ইতিমধ্যে জেনারেটরকে দরজার কাছাকাছি এনে ফেলেছে রানা। আর মাত্র দুই কী তিন ফুট বাকি। প্রচণ্ড কাশির আকস্মিক বেগ কাজটায় বাধা হয়ে দাঁড়াল, ফুসফুসে ধোঁয়া ঢোকায় ঝোঁকটাকে রানা কোনভাবেই দমন করতে পারছে না।

কাশতে কাশতেই কুড়ালের হাতলটা জায়গামত বসাল ও, তারপর ধীরে ধীরে উপর দিকে টান দিতে শুরু করল। এই সময় কমলা শিখায় মোড়া কাঠের দেয়াল টলে উঠল। ঝট করে ঘাড় ফেরাতে রানা দেখল, দেয়ালটার দুই তৃতীয়াংশ বাইরের দিকে কাত হচ্ছে।

দেয়াল পড়ে যেতেই ঝাঁকি খেল ছাদ।

আরও দু'বার লিভার টেনে উঁকি দিল রানা। জেনারেটরের পিছনদিকটা দোরগোড়া স্পর্শ করেছে। আরও তিনবার। এবার চাকাগুলো দোরগোড়া পার হয়ে গেল...তবে বিচ্ছিরি একটা ঝামেলাও বাধল। দরজার কাঠের চৌকাঠে ইস্পাতের মাউন্টিং জ্যাম হয়ে গেছে।

কী সর্বনাশ, এমন আটকানোই আটকেছে যে কোনমতে নড়ানো যাচ্ছে না!

ঘামছে রানা, ওর পারকার হুড ধিকিধিকি জ্বলছে। হাল ছাড়েনি, বলা চলে মৃত্যুর হাঁ করা মুখের ভিতর দাঁড়িয়ে এখনও প্রাণপণ চেষ্টা করছে যান্ত্রিক দৈত্যটাকে আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি সরাতে; জানে তা হলেই ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটবে, সেই সঙ্গে ট্রেঞ্চের বরফ ঢাকা নিরাপদ মেঝেতে পৌঁছে যাবে জেনারেটর।

কিন্তু চেষ্টা করে লাভ হচ্ছে না কোন। ব্যাপারটা সম্ভবত রানার সাধ্যের বাইরে এখন।

কার উদ্দেশে নিজেও বলতে পারবে না, দাঁতে দাঁত চাপল, হিসহিস করে অভিশাপ দিল; কারণ জানে, পোর্টেবল এই জেনারেটর বাঁচলে নেতাজি ক্যাম্প বাঁচবে; একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

একটানা শোঁ-শোঁ আওয়াজ করে কাছে চলে আসছে আগুনের শিখাগুলো। মেশিনটাকে মাত্র শেষ কয়েক ইঞ্চি সরাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে রানা। কিন্তু ভারী ইস্পাত কাঠের ভিতর সেঁধিয়ে গেছে, কার সাধ্য নড়ায়।

রানা বুঝতে পারল, জেনারেটর ফেলে এখনই সরে যেতে হবে ওকে, তা না হলে ধোঁয়ায় দম আটকে বা জ্যান্ত পুড়ে মরার হাত থেকে কেউ ওকে বাঁচাতে পারবে না।

টলতে টলতে দরজার দিকে এগোল রানা, হঠাৎ বুঝতে পারল ফাঁকটায় জেনারেটর আটকে যাওয়ায় ওর নিজের বেরুবার পথও বন্ধ হয়ে গেছে। তবে না, চেষ্টা করলে হেঁচড়ে-ঘষটে কোন রকমে গলে যাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

তাই যাচ্ছে রানা, এই সময় আলোড়িত ধোঁয়ার ভিতর আবছাভাবে একটা

মাথা দেখা গেল। ঝট করে পিছনে তাকিয়ে হাটের অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করল ও।

শিখাগুলো বাতাস পাওয়া পতাকার মত মাতলামি করছে। পিছাল রানা, তারপর হাতছানি দিয়ে ডাকল ধোঁয়ায় ঢাকা ছায়ামূর্তিটাকে।

লোকটাকে ইতস্তত করতে দেখল রানা। তারপর জেনারেটরকে পাশ কাটিয়ে হাটের ভিতরে ঢুকতে নিজেকে যেন বাধ্য করল সে।

কিছু ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। কুড়ালের হাতলটা জায়গামত বসাল রানা, তারপর দু'জনে মিলে টানতে শুরু করল উপর দিকে।

জেনারেটর উঠল, কিন্তু আবার আগের জায়গাতেই বসে পড়ল।

চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'আবার!'

এবার ধীরে ধীরে তোলা হলো। রানার হাত, পা, উরু, কাঁধ আর পিঠের সমস্ত পেশি থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। তারপর ওর গলার ভিতর থেকে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল, শরীরের সবটুকু শক্তি এক করে যতটা পারা যায় উঁচু করছে ভারী মেশিনটাকে।

একটু একটু করে কাত হতে শুরু করল ওটা, সামনের দিকে ঝুঁকছে, সেই সঙ্গে বদলে যাচ্ছে ভারসাম্য। তারপর হঠাৎ করেই ওজন হারিয়ে বাধাহীন উঁচু হলো কুড়ালের হাতল, সেই সঙ্গে হুড়মুড় করে টানেলে নেমে পড়ল জেনারেটর।

হোঁচট খেতে খেতে রানাও যখন ওটার পিছু নিয়েছে, ঠিক তখনই বিস্ফোরিত হতে শুরু করল হাটের শেষ প্রান্তটা। পিঠে সরাসরি আগুনের তাপ অনুভব করে রানা বুঝতে পারল, ওর পারকায় আগুন ধরে গেছে।

ডাইভ দিয়ে ট্রেঞ্চের মেঝেতে পড়ল ও, শরীরটাকে বারবার গড়িয়ে দিয়ে শিখাগুলো নিভাচ্ছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগল তাতে, কারণ ট্রেঞ্চের মেঝে পানিতে ডুবে আছে। ব্যস্ততা আর আতঙ্কের মধ্যে ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল ও।

এই মুহূর্তে, এক পলকেই, ঠাণ্ডা হিম পানিতে ভিজে ঠকঠক করে কাঁপছে রানা, পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে দু'সারি দাঁত।

'মিস্টার জয়, অসুস্থ লাগছে?' গলা চড়িয়ে জানতে চাইল ডক্টর হারুন, হাঁপাচ্ছে সে-ও।

মাথা নাড়ল রানা, ধোঁয়ার ভিতর কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে খক খক করে কাশছে।

এই সময় টানেল ধরে হনহন করে হেঁটে আসতে দেখা গেল দু'জন লোককে।

'দেখুন না কাণ্ড,' রাগ চেপে, চাপা গলায় বলল ডক্টর হারুন, 'আগুনে সব পুড়ে শেষ হয়ে যাবার পর এতক্ষণে ওঁনারা আসছেন! জিজ্ঞেস করুন তো, মিস্টার জয়, শেড ছেড়ে কোথায় গিয়েছিল ওরা?'

কাশির দমক কমে আসতে এবার তার গলার আওয়াজ চিনতে পারল রানা। 'ধন্যবাদ, ডক্টর,' বলল রানা।

কাছে চলে এল লোক দু'জন। তাদের অন্তত একজনকে চিনতে পারল রানা, জেনারেটর শেডের টেকনিশিয়ান। কিছু জিজ্ঞেস করতে হলো না, নিজেরাই জানাল কী ঘটেছে।

ফুড-পয়জনিঙের কারণে শেডে ডিউটি দেওয়ার মত লোক এমনিতেই কম, তারপর হঠাৎ কমান্ড হাট থেকে নতুন কমান্ডার ক্যাপটেন তিওয়ারি টেলিফোন করে জানাল, ওদের হাটে কীভাবে যেন আগুন লেগে গেছে, নিজেদের জিনিস-পত্র রক্ষা করতে হলে এখনই যেন দৌড় দেয়।

শুধু জিনিস-পত্র নয়, নিজেদের হাটে প্রচুর নগদ টাকাও ছিল ওদের। কিন্তু উর্ধ্বশ্বাসে সেখানে পৌঁছে ওরা তো হতভম্ব। কোথায় আগুন? আশ্চর্য, এরকম একটা মিথ্যে খবর কেন দিল ক্যাপটেন তিওয়ারি? ওখান থেকে তার খোঁজে কমান্ড হাটে চলে যায় ওরা। কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না। অনেকটা সময় নষ্ট করার পর অবশেষে কর্নেল যাদবের হাটে পাওয়া যায় তাকে। সব শুনে ক্যাপটেনই উল্টে ওদের উপর রেগে গেল, অন্য লোকের গলার আওয়াজকে তার বলে মনে করায়। প্রশ্নই ওঠে না, সে কাউকে টেলিফোন করেনি!

ক্যাপটেনের বক্তব্য শোনার পর ওরা বুঝতে পারে, জেনারেটর শেডে স্যাবটাজ চালানো হতে পারে। তাই তারা ছুটে আসছে। একটু পর ক্যাপটেন তিওয়ারিও আসছে।

সব শুনে কাঁধ ঝাঁকাল ডক্টর হারুন। 'তা হলে তো দেখছি ওদের কোন দোষ নেই!'

উটকো ঝামেলায় পড়ার কোন ইচ্ছে নেই রানার, বদমাশ তিওয়ারিটা এখনই চলে আসবে শুনে অকুস্থল ত্যাগ করার একটা তাগিদ অনুভব করল। কী করতে হবে দ্রুত টেকনিশিয়ান দু'জনকে বুঝিয়ে দিল ও। 'মোবাইল জেনারেটর রক্ষা পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু এটাকে তোমরা এখানে রেখে স্টার্ট দিতে পারবে না। আরও লোক যোগাড় করো, তারপর অন্য কোন হাটে নিয়ে গিয়ে চেষ্টা করে দেখো স্টার্ট নেয় কিনা।'

'জী, সার।'

ডক্টর হারুনের দিকে তাকাল রানা, সে বলল, 'আমি বরং আরও কিছুক্ষণ থাকি এখানে, অন্তত ক্যাপটেন তিওয়ারি না আসা পর্যন্ত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ধোঁয়া ভর্তি টানেলের ভিতর দিয়ে অন্ধকার মেইন স্ট্রিটের দিকে হাঁটা ধরল রানা, এখনও খক খক করছে।

মেইন স্ট্রিটের ঠাণ্ডা বাতাস পেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করল ও, বাঁক ঘুরে রওনা হলো রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চের দিকে।

ধীরে ধীরে ফুসফুস পরিষ্কার হয়ে আসায় কাশিটা কমে এল, তবে পরনে ভিজে কাপড় থাকায় এখনও কাঁপছে।

দু'মিনিট পর কী ঘটেছে হাশমিকে বলছে রানা। তাঁর ডেস্কে একটা ইমার্জেন্সি ল্যাম্প জ্বলছে।

খুঁজে-পেতে কিছু কাপড় যোগাড় করলেন হাশমি, কথা বলতে বলতে

সেগুলো পরছে রানা।

পানির কথা শুনে ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'হ্যাঁ, আপনার ধারণাই ঠিক, পানির লাইন কেটে দিয়েছে সে। তারমানে, ওই বেরিয়ে আসা পানিই এবার লাইনগুলোকে ডুবিয়ে দেবে। আমরা খুব খারাপ অবস্থায় পড়েছি, মিস্টার জয়।'

রানা অপেক্ষা করছে।

'পাওয়ার ব্যবহার করার আগে,' আবার বললেন হাশমি, 'ওয়াটার লাইন মেরামত করতে হবে। তা ছাড়া, নতুন একটা ইলেকট্রিকাল কানেকশনও বানিয়ে নিতে হবে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দেয়াটা ভারি কঠিন হবে।'

'প্রথমবার আলো নিভে গেলে কর্নেল আমাকে বলেছিলেন বিদ্যুৎ চলে যাবার চার-পাঁচ মিনিট পর থেকে বিপর্যয় শুরু হয়,' বলল রানা।

'এখন আরও কম সময় লাগবে,' বললেন হাশমি। 'কারণ সবই তো লো-পাওয়ারে চলছিল। যেটুকু উত্তাপ আছে, খুব তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যাবে।'

'কোথাও বসে নিশ্চয় আরেকটা হামলা চালাবার প্ল্যান করছে লোকটা। গোটা ক্যাম্প অন্ধকার।' বুটের শুকনো ফিতে লাগাবার জন্য ঝুঁকল রানা।

'হ্যাঁ। তবে আশার কথা যে শেষ পর্যন্ত আমি বোধহয় কিছু পেয়েছি।'

ঝট করে তাঁর দিকে ফিরল রানা। 'কী?'

'ব্যাপারটাকে ঝড়ে বকই বলতে পারেন। আল্লাহই বলতে পারবেন প্রতি মিলিয়নে হারটা কত!'

'খুলে বলুন, বুঝতে পারছি না।'

'এখানে ফিরে এসে আবার আমি পানির নমুনা নিয়ে কাজ শুরু করি। দূষণের ব্যাপারটা আমাকে খুব বিরক্ত করছিল।'

'বলে যান।'

'শুরুতে কিছু পাইনি। তারপর স্পেকট্রোমিটারে সত্যিকার ফ্ল্যাশ দেখতে পেলাম। প্রথমে বুঝতে পারিনি জিনিসটা কী। এখনও যে একশো ভাগ নিশ্চিত, তা নয়। তবে একটা স্লাইডে যখন ওটাকে আলাদা করে মাইক্রোস্কোপের নীচে ধরলাম, চিনতে কোন অসুবিধে হয়নি।'

'কী ওটা?'

'টিস্যু।'

চোখ মিটমিট করল রানা। 'হিউম্যান টিস্যু?'

'গড, আমি প্যাথলজিস্ট নই।' তাকিয়ে আছেন হাশমি, অপেক্ষা করছেন রানাও কতক্ষণে তাঁর মত একই উপসংহারে পৌঁছাবে।

সেটা কঠিন নয়। 'ডাক্তার হাসান,' বলল রানা।

হাশমির মুখের চামড়া টান টান হলো। 'হয়তো তৌফিক আজিজও।'

মাথা নাড়ল রানা। 'মিস্টার আজিজ নিখোঁজ হবার আগে থেকেই কুয়াটা ব্যবহার করা হচ্ছে না।'

'জানি,' বললেন হাশমি। 'তবে লাশ লুকাবার জন্যে একটা বাতিল কুয়ার চেয়ে আদর্শ জায়গা আর হয় না।'

'এ-সব থেকে কিন্তু অপরাধীকে চেনা যাচ্ছে না,' তিক্তকণ্ঠে বলল রানা। 'ডিজেল শেডে আগুন লাগিয়ে পালাবার সময় তাকে আমি পেলাম ঠিকই, কিন্তু নিজের ভুলে ধরতে পারলাম না।'

'অন্ধকারে আপনার কিছু করারও ছিল না।'

ভেজা জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরতে আঙুলে কাগজের স্পর্শ পেল রানা। মনে পড়ল ডাক্তার হাসানের নোটবুক থেকে ছেঁড়া কয়েকটা পাতা ওখানে রেখেছিল ও। পকেট থেকে বের করে হাশমির দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'পড়ে দেখুন। আমার ধারণা, একেই আমরা ধরতে চেষ্টা করছি।'

সাবধানে ভেজা কাগজগুলোর ভাঁজ খুললেন হাশমি। নোটটা লেখা হয়েছে বল-পেন দিয়ে, ফলে পানি লেগে মুছে যায়নি। ধীরে ধীরে পড়লেন তিনি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কোত্থেকে এল এটা?'

জানাল রানা। তারপর বলল, 'ডাক্তার হাসান তাকে চিনে ফেলেছিলেন। নিশ্চয়ই তাই। তা না হলে তিনি খুন হতেন না।'

'সবচেয়ে ভাল হোত ডাক্তার নিজে যদি বলতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে আমরা পাচ্ছি কোথায়?' হতাশায় ঠাসা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন হাশমি, হঠাৎ সেটা তাঁর গলায় যেন আটকে গেল। 'এক সেকেন্ড,' ধীরে ধীরে বললেন তিনি। 'হয়তো তিনি বলতে পারবেন।'

'প্লানশেট? ডাক্তারের আত্মাকে ডাকবেন?' হাসছে রানা।

'ও-সব কিছু না,' বললেন হাশমি। 'ডাক্তার হাসান ডায়েরি লিখতেন।'

'আদৌ যদি কোন ডায়েরির অস্তিত্ব থেকে থাকে, সেটা তাঁর কোয়ার্টারে আছে। তবে কালপ্রিট চুরি করে থাকলে আলাদা কথা।'

মাথা নাড়লেন হাশমি। 'ডায়েরিটা তিনি সব সময় নিজের সঙ্গে রাখতেন।'

'আপনি জানলেন কীভাবে?'

'আমিও তাই করি, ডায়েরি রাখি সেই ছোটবেলা থেকে। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার একবার আলাপ হয়েছিল।'

'ডায়েরি মানে কাগজ,' বলল রানা। 'কুয়ার লাশটা যদি ডাক্তারের হয়, এতদিনে আর তা পড়ার উপযুক্ত নেই। তিনি ওখানে আছেন...'

রানার দেওয়া নোটবুকের পাতাগুলো ফিরিয়ে দিলেন হাশমি। 'এগুলো দেখুন। ভিজে ঠিকই, কিন্তু পড়তে পারবেন। ডায়েরিটা একটা পকেটে আছে, বন্ধ অবস্থায়, পাতাগুলো এক করা। ভেজাই পাব, তবে পড়া যাবে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'পড়া যাবেই, এমন নিশ্চয়তা আপনি দিতে পারেন না।'

রানার হাত থেকে কাগজগুলো আবার নিলেন হাশমি। 'এখানে কী বলা হয়েছে? শুনুন—"এই ব্যাপারটার পর টুকে রাখলাম—"। এই যে বলা হয়েছে টুকে রাখলাম, এটা কোথায় তিনি টুকে রেখেছেন জানেন? ডায়েরিতে।'

'এতটা জোর দিয়ে কী করে বলছেন?'

'বিশ্বাস করুন, আমি জানি! আমার সমস্ত ডাক্তার বন্ধু ডায়েরি রাখেন।'

'কিন্তু পরিত্যক্ত ওই কুয়ায় আপনি নামবেন কীভাবে?' মাথা নাড়ছে রানা। 'দেখছেন না, পাওয়ার নেই।'

চারদিকে চোখ বুলালেন হাশমি। 'আপনিও অনুভব করছেন। এরইমধ্যে একটু একটু ঠাণ্ডা লাগছে। খানিক পর লাফ দিয়ে কমবে হাটের তাপমাত্রা। ছোটখাট আরেকটা কিছু ঘটুক, নেতাজি ক্যাম্পকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'হয়তো এরইমধ্যে এটা ধ্বংস হয়ে গেছে, আমরা উপলব্ধি করব আরও পরে। কিন্তু অপরাধী লোকটাকে আমরা যদি নিশ্চিতভাবে চিনতে পারি, আর অন্তত কোন স্যাবটাজ হবে না।'

'কিন্তু মোটর চালাবার পাওয়ার পাবেন কোথায়?'

'কী বলেন পাওয়ার নেই!' হাতের পেশি ফুলাবার ভঙ্গি করে দেখালেন হাশমি। 'ওয়াইন্ডিং হ্যান্ডেলে মাস্‌ল পাওয়ার ব্যবহার করা হবে।'

রানা চিন্তা করছে।

হাশমি গম্ভীর সুরে আবার বললেন, 'আমাদের আরও একজন লোক দরকার। সে ব্যবস্থা আমি করতে পারব। এখন শুধু প্রশ্নঃ কে নামবে। আপনি, না আমি?'

হাসি পেলেও হাসল না রানা। হাশমি এত মোটা, রানার চেয়ে কম করেও বিশ পাউন্ড বেশি হবেন ওজনে, কল্পনাই করা যায় না যে তিনি কোন কুয়ায় নামছেন।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে হাশমি বললেন, 'টস হোক।' পকেট থেকে একটা পাকিস্তানি আধুলি বের করলেন।

'হোক। আমি নামতে চাই।'

'কল।'

টসে যে-ই জিতুক, হাশমিকে রানা কুয়ায় নামতে দেবে না। টস করার দরকার নেই, তারপরও বলল, 'হেড।'

এবারই প্রথম নয়, ভাগ্যের জোর স্বীকৃতি দিল যুক্তির জোরকে।

হাশমি তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে পরম স্বস্তি চেপে রাখতে পারলেন না। 'হেড!'

হঠাৎ করে রানার মনে হলো, তাপমাত্রা যেন ঝপ করে অনেকটা নেমে গেল। নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল শরীরটা।

এগারো

রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চ থেকে বেরুতে যাবে ওরা, আবার লাউডস্পিকারটা ঘ্যার ঘ্যার করে উঠল। আবার সেই ক্যাপটেন তিওয়ারির কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তবে এবার সে জানাল কর্নেল যাদব সরাসরি গোটা ক্যাম্পের উদ্দেশে একটা ঘোষণা প্রচার করবেন। তার কথা শেষ হবার কয়েক সেকেন্ড পর শুরু করলেন কর্নেল।

'আমি নেতাজি ক্যাম্পের কমান্ডার কর্নেল ভীম সিং যাদব বলছি।' এ-টুকু বলতেই হাঁপিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। 'আপনারা সবাই জানেন, আমরা ভয়ানক এক বিপদের মধ্যে আছি। কিছু দুর্ঘটনা, কিছু স্যাবটাজ, কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের সবার অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলেছে। এই অবস্থায় সকলের স্বার্থের কথা চিন্তা করে গোটা ক্যাম্পে ইমার্জেন্সি ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।

'আমার এই ঘোষণা অবিলম্বে কার্যকর হবে। ফলে এখন থেকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া নিজের হাট বা ডিউটি ছেড়ে কেউ কোথাও যেতে পারবেন না। একই সঙ্গে আমি এ-ও ঘোষণা করছি যে স্বাস্থ্যগত কারণে আমার এবং অন্যান্য অফিসারদের পক্ষে দায়িত্ব পালন অসম্ভব হয়ে পড়ায় ক্যাপটেন ঘনশ্যাম তিওয়ারিকে অস্থায়ী কমান্ডার হিসেবে নিয়োগদান করা হয়েছে। আশা করি আপনারা সবাই তার সঙ্গে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন। আপনাদের সবার কুশল কামনা করছি।'

ঘোষণা শেষ হলেও, কর্নেল যাদব পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের সুইচটা অফ করতে ভুলে গেছেন, ফলে এরপর ব্যক্তিগতভাবে ক্যাপটেন তিওয়ারিকে তিনি যে কথাটি বললেন, ক্যাম্পের সবাই তা শুনতে পেল। 'যাও, তিওয়ারি, আচ্ছামত টাইট দাও গিয়ে। তুমি তো জানোই কার কথা বলছি!'

সন্দেহ নেই এখন থেকে আরও কড়াকড়ি শুরু হবে, তবে কুয়ার ট্রেঞ্চে পৌঁছাতে ওদের কোন সমস্যা হলো না। দলে এখন ওরা তিনজন।

নিঃশব্দ পায়ে মেইন স্ট্রিটে বেরিয়ে এসে কাউকে কোথাও দেখল না ওরা। তবে ডিজেল টানেলে বসানো ইমার্জেন্সি লাইটের আভা বেশ খানিকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

এত কম আলোয় দূর থেকে কেউ অবশ্য ওদেরকে চিনতে পারবে না। আর পিছু নিয়ে না এলে জানতেও পারবে না কোথায় ওরা যাচ্ছে।

কুয়ার ট্রেঞ্চে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল রানা। ঘুরল ও, ওর হেডল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল করোগেটেড স্টিলের তৈরি চারফুট উঁচু একটা বৃত্ত, কুয়াটাকে ঘিরে রেখেছে।

ওটার মাথার উপর ধাতব একটা হোয়েস্টিং ফ্রেমওঅর্ক দেখা যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি তাতে হ্যান্ডেলটা ফিট করলেন হাশমি।

দুরু দুরু বুকে কুয়ার দিকে এগোল রানা। বৃত্তের পাশে দাঁড়িয়ে হেডল্যাম্পের আলোটা তাক করল নীচে। অবিশ্বাস্য গভীরতায় আলো বা দৃষ্টি, কিছুই পৌঁছায় না। আরেকবার কেঁপে উঠল ও।

খুব একটা নীচে নয়, প্রকাণ্ড আকারের তুষারিকা বা বরফের ঝুরি দেখা যাচ্ছে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের হিংস্র কোন দানবের অপেক্ষারত সারি সারি দাঁত যেন; ওগুলোর ডগা তাক করা আঙুলের মত দেখিয়ে দিচ্ছে যমের বাড়ি কোন্ দিকে—কুয়াটার কালো আর সরু গলা।

ওই গলা হয়েই যেতে হবে দ্বিতীয় চেম্বারে। ওখানে আরও ঝুরি আছে, জানে রানা, তবে উপর থেকে দেখতে পাচ্ছে না।

'এখনও কিন্তু সিদ্ধান্তটা বদলাতে পারেন আপনি, মিস্টার জয়,' বললেন হাশমি। 'এখানে আসার পথে চৌহান বলছিল, কুয়ায় নামতে রাজি আছে সে।'

সার্জেন্ট মাথুর চৌহান হলো হাশমির 'আরও একজন লোক', রিয়্যাক্টর ট্রেঞ্চের স্টাফ।

উত্তরে রানা কিছু বলার আগে সার্জেন্ট চৌহান বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'সাহাব, হাপনারা আফিসার আচেন, কুয়ায়-টুয়ায় কখনও নামেননি, পড়ে গেলে চোট পাবেন। তারচেয়ে হামি নামি...'

খুশি হয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিল রানা, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'আমাকেই নামতে হবে, সার্জেন্ট চৌহান। কারণ ওখানে নামার পর কী কী কাজ করতে হবে তা শুধু আমি জানি। তবে তোমার সাহস দেখে আমি মুগ্ধ।'

লোকটার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'জী, সাহাব।' রানার যুক্তি আর ব্যাখ্যা মেনে নিল সে।

হোয়েস্টিং মেশিনের সঙ্গে ঝুলন্ত চেয়ারটা টেনে তুলল রানা, তারপর সরিয়ে এনে উঠে বসল, ওটার সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধছে নিজেকে।

দু'মিনিট পর খোলা কুয়ার উপর ঝুলন্ত চেয়ারে বসে আছে রানা, সামান্য দোল খাচ্ছে, হৃৎপিণ্ড উঠে এসেছে টাকরার কাছে। কাঁধের উপর দিয়ে ওদের দু'জনের দিকে তাকাল, হাতলের কাছে রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা হাত বাড়ালেন হাশমি, চেয়ারের দোলাটা থামালেন। 'আপনি রেডি, মিস্টার জয়?'

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা ঢোক গিলল রানা। 'শুরু করুন।'

'গুড লাক।'

কয়েক সেকেন্ড পর উপরে তাকাতে ওদেরকে রানা দেখতেই পেল না, হোয়েস্টিং মেকানিজমে ফিট করা খুদে হুইলের ধাতব ক্লিক-ক্লিক আওয়াজও ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

চোখ নামিয়ে নিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করল শুধু উপরে তাকানোর কারণে সামান্য হলেও দোল খাচ্ছে কেবল্।

সতর্ক হয়ে গেল ও।

বসে থাকতে হবে পাথুরে মূর্তির মত, একচুল না নড়ে। ভীতিকর ঝুরিগুলোর সঙ্গে ঘষা খাওয়ার আশঙ্কা কমিয়ে আনার জন্য প্রতিটি ইকুইপমেন্ট রাখতে হবে শরীরের কাছাকাছি। এই মুহূর্তে ধীরগতিতে পাশ কাটাচ্ছে ওকে ঝুরিগুলো।

কুয়ার ট্রেঞ্চে পৌঁছানোর আগেই ঝুরিগুলোকে খসিয়ে নীচে ফেলে দেওয়ার ভাল-মন্দ দিক নিয়ে আলাপ করেছে ওরা। ফেলে দিতে পারলে নামাটা অনেক নিরাপদ হত, কিন্তু খসে পড়ার সময় তিন-তিনটে চেম্বারের আরও বহু ঝুরি ভাঙত ওগুলো, ফলে কুয়ার তলায় কী আছে তা দেখতে পাওয়ার কোন উপায়ই থাকত না আর।

রানার বাঁ পা আড়ষ্ট হয়ে আছে। ওটা নাড়তে গিয়ে নিশ্চয়ই সিটের নীচে

ঝুলন্ত চেইন শ স্পর্শ করে ফেলেছে, কারণ হঠাৎ দেখল আবার দুলতে শুরু করেছে ও।

পরমুহূর্তেই ওর বুকের সঙ্গে ঝুলে থাকা ব্যাটারিচালিত খুদে ওয়াকি-টকি থেকে হাশমির কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল। 'আল্লাহর দোহাই লাগে, মিস্টার জয়, স্থির থাকুন!'

একটনী বা তারও বেশি চোখা একটা ঝুরি একেবারে কাছে চলে আসছে, ধাক্কাটা মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্য লাগল না দেখে হিস্‌স্‌স্‌ করে আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা; দোল খেয়ে আবার দূরে সরে এল ও। আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীরটা, ভয়ে প্যারালাইজড। পেন্ডুলাম, অর্থাৎ কেবল্‌ সহ চেয়ারটা, ধীরে ধীরে শান্ত হচ্ছে।

'মিস্টার জয়, সব ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।' আড়ষ্ট পেশি আড়ষ্ট হয়েই থাক, নাড়াচাড়া করা যাবে না। মাথার উপরে কেবল্‌-এর দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে, দোলও হবে তত লম্বা, ফলে দানবগুলোর একটাকে গুঁতো মারবার ঝুঁকিও বাড়বে। সেই সঙ্গে বিপদও।

ছুরির মত চোখা বা ধারাল বরফের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে আক্ষরিক অর্থেই টুকরো হয়ে যেতে পারে রানা, কিংবা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়। ভাগ্যক্রমে তা যদি না-ও হয়, ঝুলে থাকা দানবটাই হয়তো খসে পড়বে নীচে। সেটাও কম ভয়ের কথা নয়।

খুদে হুইলের ধাতব ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ এতক্ষণ সামান্য হলেও কান পাতলে শোনা যাচ্ছিল, প্রথম চেম্বারের আরও গভীরে নেমে আসতে তা-ও মিলিয়ে গেল। ল্যাম্পের আলো বরফের গায়ে লেগে অসংখ্য প্রতিফলন তৈরি করছে রানার চারপাশে, যেন অলৌকিক কোন রশ্মি বিশাল এই পিঁয়াজ আকৃতির গহ্বর আলোকিত করে রেখেছে।

বলা কঠিন রানা আদৌ নড়ছে কিনা। পতনটা এত ধীর, দূরত্ব এত বেশি আর সময়টা এমন দীর্ঘ যে ওর মনে হলো বিরাট ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে নিশ্চল ঝুলছে ও। তবে ধীরে ধীরে ঢালু তল উঠে আসতে দেখল রানা।

খানিক পরপরই হাশমি নরম সুরে জানতে চাইছেন, সব ঠিক আছে কিনা। কোন কারণে তিনি চুপ করে থাকলে অস্থির হয়ে উঠছে রানার মন। ওকে আশ্বস্ত করা হচ্ছে না বলে অসহায় লাগছে নিজেকে।'

এরকম হওয়ার কথা নয়, ওর চরিত্র আর সাহসের সঙ্গে ব্যাপারটা একেবারেই বেমানান, সেটা রানা বুঝতেও পারছে, কিন্তু তারপরও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

একবার ভাবল, আইসক্যাপ শুধু অর্ধেক বুদ্ধি নয়, তার সঙ্গে সম্ভবত নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও বেশ খানিকটা কেড়ে নেয়।

তারপর হাশমি যখন কথা বললেন, রানার মনে সন্দেহ জাগল বোধহয় ভুল শুনেছে। সাড়া না পেয়ে আবার ডাকলেন হাশমি, আর তখন ওর ভয় হলো আওয়াজটার প্রতিধ্বনি অনেক উপরের একটা বরফ বল্লমকে খসিয়ে দেবে, তারপর সেটা সরাসরি নেমে এসে গেঁথে ফেলবে ওকে। আইসক্যাপের

এই গভীরতায় চিরকালের জন্য ঘুমাবে ও।

ওর নীচে, খুব ধীরে, গাঢ় গর্তটা বড় হচ্ছে; নিঃশব্দে সেটার দিকে নামছে ও। ওয়াকি-টকিতে ফিসফিস করল, 'গলাটা কাছে চলে আসছে। একটু পরেই ঢুকব।'

'কত দূরে?'

'চার ফুট।'

'পার হয়েই যোগাযোগ করবেন।'

'ঠিক আছে।' রানার পতন থেমে নেই, একটু পর দেখা গেল ও আর বিশাল ফাঁকা কোন জায়গায় ঝুলছে না, তার বদলে আঁটসাঁট সাদা বোতলের গলায় নেমে এসেছে।

আচমকা আতঙ্ক আর ক্লসট্রোফোবিয়া গ্রাস করল ওকে। এর আগে যদি কোন ঝুরির পতন ঘটত, কোনভাবে হয়তো নেমে যাওয়ার পথ করে নিতে পারত সেটা, পাশ কাটানোর সময় সামান্য ঘষা খেত ওর সঙ্গে; কিন্তু এখানে গোটা কাঠামো ঝুরিটাকে গাইড করে নামিয়ে আনবে সরাসরি ওর উপর।

ধীরে ধীরে সাদা গলা চওড়া হলো, দ্বিতীয় চেম্বারের দেয়াল ঢালু হয়ে রানা যেখানে ঝুলছে সেখান থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। 'এই মাত্র গলা থেকে নেমে এসেছি,' বিড়বিড় করল ও।

'আপনি ভাল আছেন তো?'

'হ্যাঁ। নামাতে থাকুন।'

কল্পনার চোখে ওদের দু'জনকে দেখার চেষ্টা করল রানা, পালা করে হাতল ঘুরিয়ে কেবল্ নামাচ্ছে। এটা ওদের কাজের সহজ অংশ, কারণ খুদে হুইল আর পুলিই সমস্ত চাপ সহ্য করছে।

কিন্তু ওকে উপরে তোলাটা হবে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। একটানা অনেকক্ষণ ভারী বোঝা টানার কষ্ট ষোলো আনা ভোগ করতে হবে।

চারপাশে এখন আবার বিশাল আকারের ঝুরি ঝুলে থাকতে দেখা গেল, যেন ফসিলে পরিণত হওয়া ঘেরা একটা বাগানের মাঝখানে রয়েছে ও।

উপরের চেম্বারে দেখা ঝুরির তুলনায় এগুলোকে আরও বেশি বিপজ্জনক বলে মনে হলো ওর। আকারে তো অনেক বড়ই; কোন-কোনটা মোচড়ানো সাপের মত, নীচের অংশ ঠিক যেন ছোবল মারার ভঙ্গিতে ফণা তুলে রেখেছে; তা ছাড়াও আছে কোদাল আকৃতির দাঁত বের করা কুমির, পনেরো ফুট লেজ নিয়ে ডায়নোসর আর হাঁ করা হাঙর থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র পর্যন্ত।

চেয়ার পাশ কাটাচ্ছে ওগুলোকে, দম বন্ধ করে বসে আছে রানা, মনে রাখছে নড়াচড়া করা যাবে না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় উপলব্ধি করল সারি সারি ঝুরি ওকে শুধু সম্মোহিত করছে না, ওর মনের পরতে পরতে ছড়িয়ে দিচ্ছে সূক্ষ্ম আতঙ্কের কম্পন।

চোখ সরিয়ে নেওয়াটা জরুরি, বুঝতে পারল রানা। কিন্তু এখন শুধু উপরে বা নীচে তাকাতে গেলেও যেন বোধহয় পেণ্ডুলাম দুলিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি নিতে

হবে। ঝুরিগুলো নিরেট কিছুর সঙ্গে আটকানো থাকলে বিপদটাকে ছোট বলে অবহেলা করা যেত। কিন্তু ওগুলো স্রেফ জমাট বাঁধা তুষারের সঙ্গে ঝুলছে।

কয়েক মিনিট পার হলো।

ঝুরির চোখা ডগাগুলোকে পিছনে ফেলে এসেছে রানা। ধীরে ধীরে নেমে এল পিঁয়াজ আকৃতির বালবের মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এল সেই অনভূতিটা–শূন্যে স্থির হয়ে আছে শরীর, থেমে গেছে গোটা দুনিয়া, আইসক্যাপের বিশালত্বের মাঝখানে ছোট্ট একটা বুদ্‌বুদের ভিতর খুদে সিটের সঙ্গে স্ট্র্যাপ বাঁধা অবস্থায় চিরকাল থেকে যাবে ও।

'সব ঠিক আছে, মিস্টার জয়?'

'হ্যাঁ।'

'কতটা নামলেন?'

সাবধানে দৃষ্টি নামিয়ে তাকাল রানা। ওর নীচে দেয়ালগুলো তৃতীয় চেম্বারের নিঃসঙ্গ কালো চোখের দিকে সরে যেতে শুরু করেছে। 'চল্লিশ ফুট।'

আবার মন আর মাথার উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে রানা।

প্রথমে নিজের উপর খুব রাগ হলো, বোকার মত এই পাতালে নামতে রাজি হওয়ায়; তারপর ঠাণ্ডা মাথার কালপ্রিটের উপর, নিজে কালো হয়ে সাদাদের পা চাটা কুকুর হয়ে যাওয়ায়; সবশেষে কর্নেল যাদবের উপর, অনেক আগেই এই মৃত্যুফাঁদ বন্ধ করে না দেওয়ায়।

রাগ হতেই পারে, হওয়াটাই স্বাভাবিক, উৎস হলো বিপদ আর ভয়। কিন্তু রানাকে ভয় পাইয়ে দিল রাগের তীব্রতা আর মাত্রা।

গলা বুজে এল ওর, আগুনের মত গরম হয়ে উঠল শরীর; চাঁদিতে একটা পালস পেল, মাথার ভিতরে যেন ড্রাম পেটাচ্ছে।

চোখের পাতা খুব জোরে বন্ধ করে নিজের ভিতর থেকে সমস্ত রাগ বের করে দেওয়ার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু কোন লাভ হলো না। রক্তে ভর্তি মাথাটায় অসম্ভব ভারী আর আঁটো লাগছে হার্ড হ্যাট। চাপ কমার জন্য ওটার দিকে একটা হাত তুলল রানা, অসতর্ক থাকায় একটু বেশি হিম বাতাস নিয়ে ফেলল নাকে, ফলে কাশল।

কাত হলো হার্ড হ্যাট। রানার খুলির উপর দিয়ে পিছলে নেমে এল, তারপর খসে পড়ল। খপ করে ধরতে চেষ্টা করল রানা, একটুর জন্য পারল না। শুরু হলো ওটার অবাধ পতন। সেই সঙ্গে একটু দুলে উঠল ও।

আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে রানা, অপেক্ষা করছে সর্বনাশটা কখন শুরু হবে।

এখনও নেমে যাচ্ছে হ্যাটটা, গর্তে পড়ার আগে ঢালু বরফের চারধারে বারবার বাড়ি খাচ্ছে।

তারপর একটা নীরবতা নেমে এল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পর তৃতীয় বালবের তলায় বাড়ি খেল হ্যাট। রানা আশা করেছিল পানি ছলকাবে, তার বদলে বারবার ড্রপ খেতে লাগল ওটা।

তারমানে কুয়ার তলার পানি আবার জমে গেছে! হ্যাটটার বাড়ি খাওয়ার ঝন ঝন আওয়াজ কয়েক সেকেন্ডের বেশি হওয়ার কথা নয়, কিন্তু কী কারণে

কে জানে থামছে না সেটা।

স্টিলের হ্যাট বরফের এক সারফেস থেকে আরেক সারফেসে আছড়ে পড়ছে, আর রানার নীচে আইস-বালব শব্দটাকে বহুগুণ বাড়িয়ে সরু গলার ভিতর দিয়ে তুলে দিচ্ছে উপর দিকে।

অবিশ্বাস্য ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘামছে রানা, অপেক্ষা করছে কখন থামবে হ্যাটটা।

অবশেষে স্থির হলো ওটা। কিন্তু আওয়াজ বন্ধ হওয়ার পর দেখা গেল অন্য একটা শব্দ রয়ে গেছে। তীব্র এক ধরনের গুঞ্জন, অথচ যেন কোন উৎস নেই। সেই সঙ্গে আশ্চর্য একটা কম্পন সৃষ্টি করছে।

তারপর রানার চারপাশে হিম নিঃশ্বাস ঘূর্ণির মত পাক খেতে শুরু করল, সেই সঙ্গে রানা দেখল ওর আশঙ্কাটাই ফলছে—হুউউউশ্‌শ্‌শ্‌ করে পাশ কাটাচ্ছে প্রকাণ্ড একটা ঝুরি।

মন্থরগতিতে নেমে যাচ্ছে চকচকে ঝুরি, সামান্য একটু হাত নাড়লেই ওটাকে ছুঁতে পারে রানা। চল্লিশ ফুট লম্বা সাদা মিসাইল যেন স্লো মোশনে পাশ কাটাচ্ছে ওকে, অনন্তকাল ধরে নামছে তো নামছেই।

মিরাকল ছাড়া অন্য কী বলা যায়, ঝুরিটা রানাকে স্পর্শ করল না।

তবে ওটার অলসগতির পতন চাক্ষুষ করছে রানা—গলায় ঢুকল, ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে যেন একটা তীর, এমনকী গায়ে একটু ঘষা পর্যন্ত খেল না; তারপর হারিয়ে গেল গাঢ় অন্ধকারে, বেশ কয়েক সেকেন্ড পর প্রচণ্ড সংঘর্ষের আওয়াজ উঠে এল বালবের গোড়া থেকে, অবশেষে যেখানে ওটা ল্যান্ড করেছে।

আবার শুরু হলো প্রতিধ্বনি আর সেই আশ্চর্য কম্পন। জানে এতে কোন লাভ হবে না, তবু অরক্ষিত মাথার চারপাশ হাত দিয়ে ঢাকল রানা।

এখন অপেক্ষা, মৃত্যু এসে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে যাক। কারণ দ্বিতীয় ঝুরিটা নিশ্চয়ই ওকে ছাড়বে না। তা ছাড়া, হ্যাটটার পতন ওগুলোর একটাকে যদি খসাতে পারে, তা হলে দানব আকৃতির বিস্ফোরিত মিসাইল বাকিগুলোকে আলগা করে না রাখার কোন কারণ নেই।

গুঞ্জনটা এতক্ষণ টিকে থাকছে, যেন অ্যাটমসফিয়ারের অংশ হয়ে উঠল; তারপর এক সময়, ধীরে ধীরে, মিলিয়ে গেল। অথচ কিছুই ঘটল না! রানার মাথার উপর বরফের জঙ্গল মৃত্যুর গান গাইলেও, কী এক কাকতালীয় কারণে স্থির হয়ে গেছে!

ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে, আড়ষ্ট হাত দুটো মাথা থেকে নামাল রানা।

বিশাল আকারের চকচকে দেয়ালে লেগে ল্যাম্পের প্রতিফলিত আলো ফিরে আসছে রানার দিকে। নীরবতা এখন পরিপূর্ণ। বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল ও, সেটার আওয়াজ শুনে কুঁকড়ে গেল ভয়ে।

'মিস্টার জয়! মিস্টার জয়!' রানার বুকে ঝোলা ওয়াকি-টকি থেকে রিয়্যাক্টর ইঞ্জিনিয়ার জাভেদ হাশমির যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল।

রানা জানাল, 'আমি ভাল আছি।'

'কী ঘটেছিল?'
'ঝুরি,' ফিসফিস করল রানা।
'আমরা আপনাকে তুলে আনছি।'
হাশমির সিদ্ধান্ত পরম স্বস্তি এনে দিল রানার মনে। এখন এটাই ওর জীবনের সবচেয়ে বড় চাওয়া–এই অভিশপ্ত পাতাল থেকে বেরুনো, আরেকবার শক্ত কিছুর উপর দাঁড়ানো, মাথার উপর ঝুলে থাকা সুচাল বরফ মিসাইলগুলোকে টার্গেট প্র্যাকটিসের সুযোগ না দেওয়া।
ওগুলো পড়েনি ঠিকই, কিন্তু রানা জানে একটানা কম্পনের ফলে নিশ্চয়ই আলগা হয়ে আছে সব, অর্থাৎ পতনের আশঙ্কা আগের চেয়ে অনেক গুণে বেড়েছে। চেয়ারে বসে কাঁপছে ও; মনটা একাধারে ভয়ে কাহিল, আবার রাগে অস্থির।
রাগ সে-ই লোকটার উপর, ওর এই দুর্দশা আর মানসিক বিপর্যয়ের জন্য যে দায়ী। সে-ই তো ওর দেশের বিরল এক প্রতিভা, ডক্টর ওসমান ফারুকের সারাজীবনের সাধনার ফসল চুরি করেছে। চুরি করার পর, সেটাকে গোপন রাখার চেষ্টায় আরও অপরাধ করতে হয়েছে তাকে, আর সম্ভবত এ-সব করতে গিয়েই মারাত্মক কোন ভুল করে ফেলেছে। কাজেই, ধরা তাকে পড়তেই হবে!
তবে আবহাওয়া ভাল হওয়ার আগেই ধরতে হবে তাকে। চুরি করা রেডিও যাতে কাজে লাগাতে না পারে। সে চাইছে ক্যাম্প নেতাজি ত্যাগ করে চলে যাক সবাই, এটাকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হোক, তা হলেই তার আশা পূরণ হয়।
দাঁড়া শালা!
দাঁতে দাঁত চাপল রানা। 'কন্টিনিউ লোয়ারিং।'

বারো

'মিস্টার জয়!'
'বললাম তো, নামাতে থাকুন!'
সামান্য একটা ঝাঁকি, সঙ্গে সঙ্গে আবার রওনা হলো রানা–অসম্ভব লম্বা কেবলের শেষ মাথায় ঝুলে থাকা ক্রোধ আর প্রতিশোধের ছোট্ট একটা বান্ডিল, শূন্যতা আর ঠাণ্ডার মাঝখানে অসহায়, তবু হঠাৎ করে নিজেকে শিকারী ভেবে উল্লসিত। গহ্বরের নীচে পৌঁছাবে ও, আর সেখানে যদি জবাবটা থাকে, ঠিকই খুঁজে বের করবে।
রানা তোমার জান কবচ করবে!
'মিস্টার হাশমি?'
'বলুন?' হাশমির কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট শোনাল। 'এখনও সব ঠিক আছে তো?'
'আমি এখন বটম চেম্বারে। নামাতে থাকুন।'

হোস থেকে উঠে আসা বাষ্প এখানেই সবচেয়ে বেশি ঘন। তার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে ঝুলন্ত আঙুলগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে চেয়ারটা।

আঙুল বা ঝুরির সংখ্যা এখানে বরং আরও বেশি, তুলনায় অনেক লম্বা আর মোটা-তাজাও, চেম্বারের পুরো দৈর্ঘ্যের শতকরা ষাট ভাগেরই নাগাল পেয়ে গেছে। প্রকাণ্ড জায়গা জুড়ে ওগুলোর উপস্থিতি স্নায়ুতে চাপ সৃষ্টি করছে। দুশো পর্যন্ত গোণার জন্য চোখ বুজল রানা।

চোখ খুলে হাঁফ ছাড়ল। পাশ কাটিয়ে নীচে চলে এসেছে চেয়ারটা, বিশাল গহ্বরের গোড়া লক্ষ্য করে সাবলীল গতিতে নামছে।

ওয়াকি-টকির স্পিকার ঘ্যারঘ্যার করে উঠল। 'রিপিট!' ভলিউম ম্যাক্সিমামে তুলল রানা।

'কত দূর?' শব্দগুলো প্রায় দুর্বোধ্য।

'ত্রিশ ফুট,' বলল রানা, তারপর আইস চেম্বারের গোড়াটা ভাল করে দেখার জন্য নীচের দিকে তাক করল ল্যাম্পের আলো।

কুয়ার জমাট তলায় আলোটা পড়তেই, যেন দশ হাজার হীরের সারফেসে লেগে ঝলমলিয়ে ফিরে এল প্রতিফলনগুলো।

প্রকাণ্ড ঝুরিটার পতনে নীচের অনেক কিছু বদলে গেছে। প্রথম আঘাতেই বরফের পুরু স্তর এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেছে, গোটা মসৃণ পাতটা দেখতে হয়েছে মাকড়সার জাল। সংঘর্ষের জায়গা থেকে অনেকগুলো নতুন ফাটল তৈরি হয়েছে, সেগুলোর গন্তব্য কুয়ার চারপাশের কিনারা।

বিস্ফোরিত ঝুরিটাও হাজার হাজার খুদে টুকরোয় পরিণত হয়েছে, মূল্যবান রত্নের মত ছড়িয়ে আছে সারফেসের পুরোটা জুড়ে।

'হোল্ড ইট!' জরুরি তাগাদার সুরে বলল রানা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল চেয়ার।

কুয়ার মাথা থেকে বিড়বিড় করে হাশমি কিছু বললেন, রানা বুঝতে পারল না, গুরুত্বও দিল না।

ওর সম্পূর্ণ মনোযোগ এখন কুয়ার সারফেসে। প্রতিটি গজ আলাদাভাবে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। ঝুলন্ত অবস্থায়, উঁচু একটা জায়গা থেকে, খুব সামান্যই দেখতে পাচ্ছে ও। কিন্তু আরও নীচে থেকে তাকালে বরফ ভেদ করে কিছু দেখতে পাওয়া অসম্ভব।

আকৃতি খুঁজছে রানা, কিন্তু আলোর সঙ্গে বরফের খেলা আর চালাকি শুরু হয়ে যাওয়ায় শুধু ছায়া দেখতে পাচ্ছে। তবে হার্ড হ্যাটটা দেখতে পেল–উজ্জ্বল কমলা রঙের খুদে একটা গম্বুজ, পড়ে আছে প্রায় বৃত্তাকার বরফ স্তর বা পাতের মাঝখানে।

কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বরফের প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করছে রানা। গাঢ় একটা আকৃতি খুঁজছে ও, মানুষের লাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। না, কোথায় কী! আবার নতুন করে শুরু করতে হচ্ছে।

এবার রানা ফাটলগুলোর ব্যাপারে সচেতন। বরফের পাতে সাদা ঝলক বা দাগের মত ওগুলো, পানির বড় কোন অংশ দেখার পথে বাধা হয়ে

দাঁড়াচ্ছে। তা ছাড়া, যে কোণ থেকে ওর দৃষ্টিটা পড়ছে, তাতে অনেক কিছুই আড়ালে থেকে যাওয়ার ভয় আছে। এখন যেটা প্রয়োজন সেটা করতে হলে দুঃসাহসী হতে হয়, নিতে হয় মারাত্মক ঝুঁকি।

চেয়ারটাকে পেণ্ডুলামের মত দোল খাওয়াল রানা, ফলে অন্যান্য জায়গার সরাসরি উপরে চলে এল ও।

কিছু না।

চোখ নামিয়ে নীচে তাকিয়ে আছে রানা, হতাশ আর ক্লান্ত। ওর সরাসরি নীচে ফুট দশেক জায়গা জুড়ে সেই মাকড়সার জাল, যেখানে মিসাইলটা আঘাত করেছিল। বরফ এখানে যথেষ্ট পুরু, তা সত্ত্বেও ভেঙে গেছে।

যুক্তি দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করছে ও—চেম্বারের গলা থেকে যা-ই নীচে পড়ুক, সেটা এসে পড়বে ঠিক যেখানে ঝুরিটা নেমেছিল; চেম্বারের গলা থেকে যে ভঙ্গিতেই খসুক ওটা, মাধ্যাকর্ষণ সেটা নিশ্চিত করবে।

'আরও নীচে নামান আমাকে,' হ্যান্ডসেটে বলল রানা। 'যখন বলব, থামবেন। শুনতে পাচ্ছেন তো?'

জবাবে যে আওয়াজ ফিরে এল তা এত দুর্বল আর ঘর্ঘরে, কিছুই বোঝা গেল না, তবে ধাঁচ বা প্যাটার্নটা ইঙ্গিত দিল রানার প্রশ্নটাই যেন পুনরাবৃত্তি করা হলো।

চেয়ার সহ নীচে নামছে রানা, জালটার ঠিক মাঝখানে। টার্গেটের মধ্যবিন্দু ওটা, ভেঙে পড়া যে-কোন বরফ সরাসরি ওখানে, অর্থাৎ ওর উপর পড়বে।

কথাটা ভুলে থাকার চেষ্টা করছে ও।

'স্টপ!' গলা চড়িয়ে, স্পষ্ট উচ্চারণে বলল রানা; তারপরও নামার গতি থামাতে নির্দেশটা পুনরাবৃত্তি করতে হলো।

এই ব্যাপারটা সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে। এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'এভাবে একটা টোকা দিলে—' মাইক্রোফোনে আঙুল ঠুকল, '—ধরে নেবেন নীচে নামাতে হবে। আর দুটো টোকা মানে—থামুন। তিনটে টোকা—আমাকে ওপরে তুলুন। বুঝতে পেরেছেন?'

ঘর্ঘর শব্দের সঙ্গে দুর্বোধ্য কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'বুঝে থাকলে টোকা দিন।'

ঠক্ করে একটা টোকা পড়ল।

দু'বার টোকা দিয়ে অপেক্ষা, তারপর পুনরাবৃত্তি করল রানা; এক মুহূর্ত পর নামতে শুরু করল চেয়ার।

সারফেস থেকে বুট যখন তিন ফুট উপরে, জোরে একজোড়া টোকা মারল—প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল চেয়ার। পদ্ধতিটা কাজ করছে দেখে ভাল লাগল।

বরফ ছুঁলো প্রথমে চেইন শ। ওটার কথা ভুলে গিয়েছিল রানা; তবে এখানে ওটার আদৌ কোন কাজ নেই। বরং একটা পেট্রল ইঞ্জিনের আওয়াজ ঝুলন্ত বরফগুলোকে নামিয়ে আনার বিরাট ঝুঁকি তৈরি করবে।

রানার বুট বরফ ছুঁতে যাচ্ছে, আবার একজোড়া টোকা দিতে থেমে গেল চেয়ার। অত্যন্ত সাবধানে চাপ দিল সারফেসে। মনে হচ্ছে ওর ভার সইতে পারবে, তবে দেখতে পেল প্রথমে যেমন ধারণা করেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে বরফের।

টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে ওটা, পরিণত হয়েছে ভাসমান বোল্ডারে। ফাঁকে ফাঁকে পানির অসংখ্য রেখা জ্বলজ্বল করছে, ফলে আকারে বড় হওয়া সত্ত্বেও ওগুলোয় দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

মুখ তুলে উপর দিকে তাকাল রানা, ল্যাম্পের আলো ধরল টান টান কেবল্ বরাবর। দেখা গেল ঝাঁক বাঁধা ঝুরিগুলো অনিষ্ট করার ভঙ্গিতে ওর দিকে তাক করা রয়েছে, তবে কেবলটা ওগুলোর কাছ থেকে চার ফুটেরও বেশি দূরে।

এক টোকা। দুই টোকা।

আরও এক ফুট নেমে স্থির হলো রানা। বেশি নড়াচড়া না করে বেল্ট থেকে আইস-অ্যাক্সটা খুলল।

ওর পা এখন ভাঁজ হয়ে আছে, বুট বরফের বড় একটা টুকরোর উপর নামানো। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে, খেয়াল আছে ভারসাম্য যেন ঠিক থাকে, আলোটা নীচের দিকে ফেলল।

ভাঙাচোরা, অমসৃণ সারফেস সাদা আর নীল হলেও ল্যাম্পের আলোয় হলদেটে দেখাচ্ছে; কোথাও নিষ্প্রভ, আবার কোথাও উজ্জ্বল।

ওগুলোর ভিতরে সবুজ বা খয়েরি কিছু খুঁজছে রানা, যা দেখে আভাস পাওয়া যাবে ডাক্তার হাসানের লাশ এখানে আছে। আইস-অ্যাক্সের হাতল দিয়ে বরফের টুকরোগুলোকে ঠেলছে ও, দূরে সরিয়ে দেওয়ার আগে প্রত্যেকটা উল্টেপাল্টে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে।

কিন্তু কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না।

তা হলে এখন ওকে উপরে ফিরে যেতে হয়। এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারলে আর কিছু চায় না রানা। কিন্তু ফিরে যাওয়ার কথা মনে জাগতেই সেই রাগটা আবার ফিরে এল। কোনও তথ্য নয়, প্রমাণ নয়, আলামত নয়–স্রেফ খালি হাতে ফিরে যেতে হবে?

না!

জানে আর কিছু দেখার নেই, তারপরও অদ্ভুত একটা জিদ নিয়ে বসে থাকল রানা; অলস ভঙ্গিতে টুকরোগুলো ওল্টাচ্ছে, ফাটলগুলো সার্চ করছে।

তারপর হঠাৎ, একটা বরফ একটু কাত হতেই, রঙটা চোখে পড়ল।

লাল। হয়তো রক্তই।

বেশি নয়। চ্যাপ্টা এক টুকরো বরফে বিবর্ণ একটা ছোপ মাত্র। সংঘর্ষের আগে টুকরোটা নিশ্চয় সারফেসের অংশ ছিল।

দেখা যাক আসলে কী ওটা। বা আর কী পাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ ধরে খোঁচাখুঁচি করল রানা, কিন্তু কোন লাভ হলো না। উদ্বেগে আর হতাশায় মরিয়া হয়ে, উচিত হচ্ছে না বুঝেও ঝুঁকি নিচ্ছে–নাগালের

বাইরের টুকরোগুলোকে আইস-অ্যাক্স দিয়ে ছোঁওয়ার জন্য চেয়ারের কিনারায় সরে এসে সামনের দিকে ঝুঁকছে।

তারপর হঠাৎ ভাগ্যটা বদলে গেল। বরফের একটা টুকরো ওল্টাতেই বেরিয়ে পড়ল হাতটা।

মড়ার সাদা হাত, যেন মোম দিয়ে তৈরি; গাঢ় সবুজ আস্তিন পানিতে কালচে দেখাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি আইস-অ্যাক্সটা সিধে করে ধরল রানা, তারপর ধাতব মাথা দিয়ে হাতটার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করল।

প্রথমবার একটু ধাক্কা লাগতেই আরেক দিকে ভেসে গেল ওটা। দ্বিতীয়বার বাঁকা ফলা বাধিয়ে টান দিতে দু'এক সেকেন্ডের জন্য একটা কাঁধ আর মাথা ধীরে ধীরে উঁচু হলো একজোড়া বড় আকারের বরফ টুকরোর মাঝখানে। গোছা গোছা গাঢ় কালো চুল পানিতে যেন সাঁতরাচ্ছে।

উপুড় হয়ে থাকায় চেনা যাচ্ছে না এটা আসলে কার লাশ। ডাক্তার আরিফ হাসান, নাকি ইঞ্জিনিয়ার তৌফিক আজিজ।

অবশেষে আইস-অ্যাক্সের ইস্পাতের মাথা পারকার ঘাড়ে আটকাতে পারল রানা। ধীরে ধীরে পানির উপর চিৎ করছে লাশটাকে।

ডাক্তার আরিফ হাসান। অসম্ভব ফ্যাকাসে, ফুলে ঢোল, তবু চিনতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

পানিতে ভাসছে বলে লাশটাকে নাড়াচাড়া করতে কোনও সমস্যা হয়নি, কিন্তু পানি থেকে তুলতে গিয়ে দেখা গেল ওটার ওজন এত বেশি যে কোনভাবেই রানা সুবিধে করতে পারছে না। ক্লান্ত হয়ে পড়ল ও, ঠাণ্ডায় হি-হি করছে। তারপর স্থির হয়ে বসল, ব্যাপারটাকে একটা কারিগরি সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করছে।

বুদ্ধি একটা পাওয়া গেল, আর পাওয়ার পর সেটাকে সহজ বলেও মনে হলো। লাশের কাঁধের চারপাশে রশির একটা লুপ পরাল রানা, অপর প্রান্ত বাঁধল চেয়ারের নীচে গাঁথা হুকের সঙ্গে। তার আগে চেইন শ ফেলে দিয়ে হুকটাকে মুক্ত করতে হয়েছে। যাক গে, ওটা ওর কোন কাজে লাগত না।

আইস-অ্যাক্সের মাথা পানিতে ডোবাল রানা, তারপর অনেক কায়দা-কসরৎ করে লাশের পা দুটোকে সারফেসে তুলে আনল। নীচের দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে হাত বাড়াতে হলো, তা না হলে পারকার চেইনটা নাগালের মধ্যে আসছিল না।

চেইন নামাবার পর শার্টের পকেটগুলো সার্চ করছে।

রানা জানে, মাথার উপর ঝুলন্ত বিপদ নিয়ে এখানে বসে থাকা একদম উচিত হচ্ছে না। ভাল হোত লাশটা ক্যাম্প সারফেসে উঠাবার পর ধীরেসুস্থে সার্চ করতে পারলে। সন্দেহ নেই, তিনটে টোকা দিলেই লাশ সহ ওকে উপরে তুলতে চেষ্টা করবেন হাশমি। চেষ্টা করবেন, কিন্তু রানার ধারণা দু'জনকে টেনে চারশো ফুট উপরে তোলা হাশমি আর চৌহানের পক্ষে সম্ভব নয়।

বুক পকেটে চৌকো মত চামড়ার তৈরি কিছু একটা পেল রানা। না,

ডায়েরি নয়; ছোট্ট একটা মানিব্যাগ। নিজের পারকায় ভরে রাখল ওটা।

গ্লাভ না থাকায় ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে আসছে আঙুলগুলো, কিন্তু কাজ তো আর ফেলে রাখা যাবে না–শার্ট আর ট্রাউজারের পকেটগুলো এক এক করে হাতড়াচ্ছে ও। ডায়েরিটা রয়েছে বোতাম লাগানো হিপ পকেটে, স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল জিনিসটা কী–আঙুলে সাড় থাক বা না থাক।

ভেজা ডায়েরিটার পাতাগুলোকে পানিই এক করে রেখেছে। খুলল রানা, যেখান থেকে খুশি কয়েকটা পাতাকে সাবধানে ছাড়াল। পাতলা হলেও, কাগজটা বেশ টেকসই বলতে হবে, খুলার সময় ছিঁড়ে যাচ্ছে না।

জাভেদ হাশমি একটা কথা ঠিকই বলেছেন, ডাক্তার হাসান ছিলেন একনিষ্ঠ ডায়েরি লিখিয়ে; মনে হচ্ছে প্রতি পৃষ্ঠাতেই কিছু না কিছু লেখা আছে। কোথাও হয়তো দু'এক লাইন, আবার কোথাও একটানা কয়েক পাতা। সুন্দর, স্পষ্ট হস্তাক্ষর; যত্ন করে লেখা।

লেদার মোড়া ডায়েরিটার শেষদিকের পাতা খুলল রানা, ওগুলো যেখানে ফাঁকা। পাতা উল্টে শেষ এন্ট্রির দিকে আসছে।

শেষ এন্ট্রিতে লেখা হয়েছে, 'কাল রাতে নেতাজি ক্যাম্পে একটা শ্বেতভালুক ঢুকেছিল। পরিষ্কার বোঝা গেল কোন পথ দিয়ে ঢুকেছে, তা হলে বেরিয়ে যাওয়ার ছাপ গেল কোথায়? এমন কি হতে পারে, ট্র্যাক্টর শেড হয়ে বেরিয়ে গেছে?

'জীবন বিভ্রান্তিকর, একঘেয়েমিতে ঠাসা, বৈচিত্র্যহীনতায় মলিন আর হতাশায় ম্লান। কাল রাতে বিসমিল্লাহ খানের সানাই বাজানো উচিত হয়নি। মানসিক প্রশান্তির জন্য প্রেসক্রাইব করেছিলাম ওটা। কিন্তু আনন্দ নয়, প্যাথোস, পুরোপুরি প্যাথোস রয়েছে ওই বাজনায়। আশ্চর্য না? বিয়ের আসরে বাজানো হয় এত করুণ সুর!'

আরও বেশি ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায় আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করতে খুব কষ্ট হচ্ছে রানার। প্রতিটি পাতা ধীরে ধীরে, একটা একটা করে ছাড়াতে সময়ও লাগছে প্রচুর, আলো পাচ্ছে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বগলে গুঁজে রাখা ল্যাম্পটা থেকে।

ডাক্তার হাসান সাহিত্যিক বা দার্শনিক ছিলেন না, সাদামাঠা ভাষায় দৈনন্দিন ঘটনার কথাই শুধু লিখে গেছেন–কী মিউজিক শুনলেন, সদ্য শেষ করা বইটা কেমন লাগল ইত্যাদি। রানাকে তিনি বলেছিলেন, নেতাজি ক্যাম্প তাঁর একঘেয়ে লাগে, ডায়েরির মূল সুর থেকে সেটাই বেরিয়ে আসছে।

পাতার পর পাতা উল্টাচ্ছে রানা, সেই সঙ্গে হতাশায় ছেয়ে যাচ্ছে মনটা। গান আর বই ছাড়া নতুন বিষয় খুবই কম। দেখা যাচ্ছে এত কষ্ট করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে নেমে কোন লাভই হয়নি।

কিন্তু তারপরই কয়েকটা লাইন যেন লাফ দিয়ে উঠে এল ওর চোখে। ডাক্তার হাসান লিখেছেন–

'বহুরূপী ধুরন্ধরের হাবভাব আর চোখের দৃষ্টিতে হঠাৎ করে যেন দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী কী যেন একটা চলে এসেছে। জানি না এটা কীসের আলামত।

'রিপোর্ট করা দরকার? কিন্তু কাকে? কী লাভই বা? শুধু সন্দেহ কোন

কাজের কথা নয়, হাতে প্রমাণ থাকতে হয়। তা ছাড়া, কী করে বুঝব কে কার বন্ধু? রিপোর্ট করতে গেলে যদি…' বাক্যটা শেষ করা হয়নি।

পরের পৃষ্ঠায় লেখা, 'তরুণ জি খুব রহস্যময় আচরণ করছে। যেন খুব ভয় পাচ্ছে সে। একবার মনে হলো, আমাকে কিছু বলতে চায়, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। আবার পরে দেখলাম, তার চেহারায় কেমন একটা অপরাধী অপরাধী ভাব। আমাকে বোধহয় এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছে। আমার ভুলও হতে পারে। ক্যাম্পটা তো ভয় পাওয়ারই জায়গা।'

রানার খুলির পিছন দিকের চুল সড়সড় করছে। জি কে? ওই শালা বহুরূপী ধুরন্ধরই বা কে?

ডায়েরিতে আর কিছু নেই। প্রথমে ডাক্তারের যে নোটবুকটা পাওয়া গিয়েছিল তার এক জায়গায় লেখা আছে–'এই ব্যাপারটার পর টুকে রাখলাম, তাঁর ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে হবে।' কিন্তু ডায়েরিতে এ-প্রসঙ্গে কিছুই বলা হয়নি। এমন হতে পারে যে কথাটা তিনি ঠিকই টুকে রেখেছিলেন, তবে তা মনের খাতায়।

পারকার পকেটে ডায়েরিটা রেখে দিয়ে শেষবারের মত চেম্বারের গোড়া বরাবর চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে রানা, দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল হার্ড হ্যাটের উপর। সত্যি যদি কোন ঝুরি খসে পড়ে, মাথায় ওটা থাকা না থাকা সমান কথা; কিন্তু তারপরও ওটার নাগাল পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাল ও। মাথায় হার্ড হ্যাট না পরেই ফিরে যেতে হবে, এই ভাবনাটা শিরশিরে একটা ভয়ের স্রোত বইয়ে দিল ওর ঘাড়ে।

'তুলুন আমাকে,' ওয়াকি-টকিতে বলল রানা। কোন সাড়া নেই উপর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতর হাতুড়ির মত বাড়ি মারতে শুরু করল হৃৎপিণ্ড। সেটাকে সামলাবার চেষ্টা করে মাইক্রোফোনে তিনবার টোকা দিল রানা।

ধারাবাহিক নীরবতা মনে হলো অনন্তকাল ধরে চলছে, আসলে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর স্পিকার থেকে অস্পষ্টভাবে বেরিয়ে এল পাল্টা টোকা–একবার, দু'বার, তিনবার। এক মুহূর্ত পর বরফ থেকে শূন্যে উঠল ওর পা। অবশেষে ক্যাম্পের সারফেসে উঠার দীর্ঘ যাত্রা শুরু হলো।

বিশ ফুট উঠার পর রানা টের পেল চেয়ার এক জায়গায় ঝুলে আছে, উপরে উঠছে না। টোকা দিল ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার গতি ফিরে পেল চেয়ার। কিন্তু আর মাত্র কয়েক ফুট উঠার পর আবার থেমে গেল ওটা।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্থির হয়ে চেয়ারে বসে নিজেকে প্রশ্ন করছে রানা। আমি কি অতিরিক্ত ভারী? আমাকে চারশো ফুট টেনে তোলা ওদের জন্য কি অত্যন্ত কঠিন কাজ?

তারপর ছোট্ট একটা ঝাঁকি জানিয়ে দিল আবার তোলা হচ্ছে ওকে।

প্যাটার্নটা ধরতে পারল রানা। কিছুক্ষণ পর পর বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল ও। তারপর উপর দিকে একবার তাকাল। বড় আকৃতির ঝুরিগুলো মনে হলো সরাসরি ওর দিকে মুখ করে রয়েছে। শিরদাঁড়া বরাবর

শিরশিরে একটা অনুভূতি হওয়ায় তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে সিদ্ধান্ত নিল, ওদিকে আর তাকাবেই না।

শান্ত হয়ে বসে আছে রানা, ডাক্তার হাসানের সঙ্গে আটকানো মোটা নাইলন রশি ধৈর্য ধরে একটু একটু করে ছাড়ছে। মাথাটাকে খালি করে মনে রাখছে শুধু একটা কথা–বেশি নড়াচড়া করা যাবে না।

এই যাত্রা বা অভিযান কোন না কোনভাবে নির্দিষ্ট একটা সময়সীমার ভিতরই শেষ হবে। হয় একটা তুষারিকার পতনে মারা যাবে রানা, নয়তো কুয়ার উপরে পৌঁছাবে; এবং সম্ভাব্য ফলাফলকে প্রভাবিত করার একটিই উপায়–একদম কিছু না করে নিজেকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া।

খানিক পরপরই অনুভব করছে রানা, গহীন গহ্বরের মাঝখানে স্থির হয়ে ঝুলে আছে ও, একচুল নড়ছে না চেয়ারটা। তারপর হাশমি আর চৌহানের বিশ্রাম শেষ হলে ছোট্ট একটা ঝাঁকি খাচ্ছে ওটা।

পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল রানা। কল্পনার চোখে দেখতে পেল এরকম ঠাণ্ডার মধ্যেও অনবরত হাতল ঘোরাতে হওয়ায় ঘামছে ওরা। সম্ভব নয়, হলে ওদের সঙ্গে জায়গা বদল করত ও; কারণ এতক্ষণে পথ করে নিয়ে ওর ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে আর্কটিক শীত। হাত আর পা বলা যায় বরফই হয়ে গেছে–কারণ পানি, ডায়েরি আর লাশের সংস্পর্শে এসেছে ওগুলো। পায়ে বুট আছে, হাতে এখন গ্লাভও আছে, কাজেই ফ্রস্টবাইটের আশঙ্কা খুবই কম, কিন্তু ব্যথাটা ক্রমশ বাড়ছেই।

বালবের গলায় পৌঁছাচ্ছে রানা, প্রথম ঝুরিটা এখন ওর নীচে; আবার বিরতি শুরু হতে ভাবল, ওয়াকি-টকিতে হাশমির সঙ্গে একবার কথা বলা যেতে পারে। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শুনে স্বস্তি বোধ করল ও।

'কিছু পেলেন?'

'এমন কিছু নয় যাকে তথ্য-প্রমাণ বলা যাবে। তবে ডায়েরিটা পেয়েছি।'

'অপেক্ষা করুন। আমরা আপনাকে তুলে আনছি।' কথা বলার সময় ঘন ঘন হাঁপাচ্ছেন হাশমি, তাই রানা আর আলাপটা দীর্ঘ করল না।

কয়েক মিনিট পার হলো। বালবের গলা থেকে বেরিয়ে আসছে রানা, এই সময় আবার থেমে গেল চেয়ার। ওর পা বালবের গোড়ার সঙ্গে পুরোপুরি একই লেভেলে রয়েছে। হঠাৎ একটা টোকা শুনতে পেল ও, মাত্র একবার। এক মুহূর্ত পর আরেকটা। কোনটাই হ্যান্ডসেট থেকে বেরিয়েছে বলে মনে হলো না। কিন্তু তা হলে আর কোথা থেকে আসবে? কে জানে, হয়তো বরফের কোন বিচিত্র আচরণ!

তবু মাইকে কথা বলল রানা। 'মিস্টার হাশমি?'

সাড়া নেই।

'মিস্টার হাশমি!' কয়েক সেকেন্ড পর তীক্ষ্ণকণ্ঠে আবার ডাকল রানা, উদ্বেগ উথলে উঠছে।

তারপরও কোন সাড়া নেই। টোকা মারল রানা, আবার ডাকল, ফের টোকা দিল; অনুভব করল, একটা ভয় ডালপালা মেলছে ওর ভিতরে।

স্পিকার বোবা হয়ে থাকল। আশা-নিরাশার দোলায় দুলছে মন, নিজেকে রানা অভয় দেওয়ার জন্য বোঝাতে চেষ্টা করল, কিছু না, এ নিশ্চয়ই ওয়াকি-টকির যান্ত্রিক গোলযোগ; দু'বার টোকা দেওয়ার আওয়াজ হয়েছে হাশমির হাত থেকে হ্যান্ডসেটটা পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ায়। একটু পরই আবার হাতল ঘোরাতে শুরু করবে ওরা।

কিন্তু ওরা শুরু করেনি, যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে রানা। ইতিমধ্যে কয়েক সেকেন্ড পরপর হাতঘড়িতে চোখ বুলাতে শুরু করেছে ও, সেই সঙ্গে অনুভব করছে ঠাণ্ডা আর ভারী একটা পাথর তৈরি হচ্ছে বুকের ভিতর।

দশ মিনিট পার হলো দশ ঘণ্টার দৈর্ঘ্য আর ভার নিয়ে, ফলে এটা বোঝার সময় পেয়েছে রানা যে হাতলটা আর ঘুরবে না। উপরে খারাপ কিছু একটা ঘটেছে, কিছু একটা থামিয়ে দিয়েছে ওদেরকে। পরিণতি: অনন্তকাল ধরে ওকে ঝুলে থাকতে হবে, আইসক্যাপের তিনশো ফুট গভীরে!

তেরো

কী কারণে জানে না রানা, মনে হলো দুটো বালবের মাঝখান দিয়ে বাতাস বইছে, আর পাশ কাটার সময় শুষে নিচ্ছে ওর সমস্ত উষ্ণতা। ইতিমধ্যে ওর গোটা শরীর হিম হয়ে গেছে, আর মনটা হিম হচ্ছে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এখানে এভাবেই ঝুলে থাকতে হবে ভেবে।

সেটা প্রায় এক রকম নিশ্চিতই বলা যায়।

হাতঘড়িতে আরেকবার চোখ বুলাতে জানা গেল নড়াচড়া বন্ধ হওয়ার পর পনেরো মিনিট পার হয়ে গেছে। পনেরো মিনিট ধরে কোন যোগাযোগ নেই, আশা নেই, কারও সঙ্গ নেই, আছে শুধু গা শিরশির করা আশঙ্কা যে ওর জন্য এটাই সমাপ্তি।

বিরতি সহ সেই টোকা-দুটো এখনও বিরক্ত করছে রানাকে। একটা টোকার মানে–'নামান'। দুটোর মানে–'থামুন'। এমন কি হতে পারে, হাশমি ওকে বোঝাতে চেয়েছেন যে তাঁদেরকে থামতে হবে?

তাই যদি হয়, কেন? এর একটাই অর্থবহ জবাব হতে পারে, আর সেটা রানাকে ভয়ানক আতঙ্কিত করে তুলছে।

সাদাদের পা চাটা কুকুরটা জানতে পেরেছে পরিত্যক্ত কুয়ার হোয়েস্ট মেশিনে দু'জন লোক কাজ করছে!

কিন্তু তাই যদি হয়, হাশমি আর চৌহানের উপর হামলাই যদি করে থাকে, তারপর তো তার প্রথম কাজ হওয়া উচিত ছিল কেবল্ কেটে দেওয়া, তা হলে নিশ্চিত হতে পারত যে-লোকটা নীচে নেমেছে সে নীচেই থাকবে।

না, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। এটা ইস্পাতের তৈরি কেবল্। তা ছাড়া, কেবল্ কাটার তো আসলে কোন দরকারও নেই, এখানে এভাবে ঝুলে থাকতে

দিলে এমনিতেই মারা যাবে রানা।

স্বভাবতই মাথায় প্রশ্ন জাগল, আহত ঘোড়ার কষ্ট দূর করতে গুলি করে মারা গেলে, নিজেকে নয় কেন? পুরোপুরি না হলেও, এ-ব্যাপারে হাফ-সিরিয়াস রানা।

ঝুলন্ত অবস্থায় ধীরে ধীরে ঠাণ্ডায় কষ্ট পেয়ে মরার চেয়ে স্ট্র্যাপ খুলে তাড়াতাড়ি মরা অনেক ভাল।

প্রাণ বাঁচানোর অন্য কোন উপায় নেই। কোন মানুষের পক্ষে বালবের দেয়াল বা সরু স্টিল কেবল্ বেয়ে কয়েকশো ফুট উপরের আইস ট্রেঞ্চে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

ব্যাটারির শক্তি কমতে থাকায় ল্যাম্পের আলো ম্লান হয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে হিম শীতল অন্ধকারে বসে মৃত্যুর জন্য প্রহর গুণছে রানা।

রক্ত চলাচল মন্থর হয়ে আসায় গ্লাভের ভিতর আঙুল নাড়াচাড়াও ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ হলো রানার, ভাবল–এভাবে চলে যাওয়ার চেয়ে দুঃখজনক প্রহসন আর কিছু হতে পারে না: এভাবে হেরে যাওয়াটাও দুর্বিষহ লজ্জা ছাড়া কী; হায়, জানা হলো না কে সেই বহুরূপী ধুরন্ধর; আর কেই-বা সে-ই জি। 'তরুণ জি।' যে কি না–

চোখ মিটমিট করল রানা। ওর চেয়ার নড়ছে! চেম্বারের গলা লক্ষ্য করে ল্যাম্পের আলো তাক করল ও। কিন্তু ঘাড়ের উপরটা ওখানে নেই! ওটা নীচে, বোধহয় দশ ফুট বা আরও বেশি নীচে··· এখন পনেরো ফুট হবে।

দ্রুত উপরে তোলা হচ্ছে রানাকে। ইঞ্জিনিয়ার হাশমি আর সার্জেন্ট চৌহানের চেয়ে অনেক বেশি জোরে ঘোরানো হচ্ছে হ্যান্ডেলটা।

এর একমাত্র অর্থ, নিশ্চয়ই বিদ্যুৎচালিত উইঞ্চ মেশিনটা চালু করা হয়েছে!

নাইলন লাইন হাতের মুঠোর ভিতর ঝাঁকি খাচ্ছে দেখে ওটা আরও তাড়াতাড়ি ছাড়তে শুরু করল রানা। চেয়ারটা দ্রুত, সমান গতিতে উপরে উঠে যাচ্ছে। বলতে গেলে চোখের পলকে দেখা গেল ঝুরিগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে রানা, গলায় ঢুকল, উঠে এল সবচেয়ে উপরের চেম্বারটায়।

খানিক পরপরই ওয়াকি-টকি থেকে হাশমির সাড়া পাওয়ার চেষ্টা করছে রানা, কিন্তু বৃথা। হয়তো ওর ধারণাই ঠিক, সেটটা পড়ে ভেঙে গেছে। কারণ উইঞ্চে লোক যখন আছে, সেট ভেঙে না গেলে নিশ্চয়ই কথা বলত।

উইঞ্চে লোক আছে! যে লোক সাড়া দিচ্ছে না! যে লোক–নিজের ঢোক গেলার আওয়াজটা রানার মাথার ভিতরে যেন কামানের তোপ দাগল–হয়তো অপেক্ষা করছে কুয়ার উপর কখন উঠবে রানা। তার জানা আছে চেয়ারের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা থাকবে ও–অসহায়!

মাথাটা পিছনদিকে ঝুলিয়ে দিয়ে উপরে তাকাল রানা, দেখতে পাচ্ছে গাঢ় রঙের কেবল্ কুয়ার মাথার দিকে উঠে গেছে। শেষ মাথায় ম্লান, হলদেটে আলোর একটা বৃত্ত, ট্রেঞ্চ থেকে আসছে; সম্পূর্ণ একটা বৃত্ত, কোথাও বিঘ্নিত

নয়; কোন মাথা ঝুঁকে তাকিয়ে নেই ওর দিকে।

হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে বাকি নাইলন রশি ঝপ করে ফেলে দিল রানা। ঢিলেভাবে ঝুলে থাকতে দিল ওটাকে, শেষপ্রান্ত দ্রুত বেঁধে ফেলল চেয়ারের সঙ্গে। এরপর আইস-অ্যাক্সটা বেল্ট থেকে ছাড়িয়ে হাতে নিল।

কুয়ার মাথায় পৌঁছাতে আর বেশি উঠতে হবে না রানাকে, মাত্র ত্রিশ ফুট। অসাড় আঙুল দিয়ে স্ট্র্যাপ খুলার চেষ্টা করছে ও, ওগুলোই ওকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। চেয়ারটা সামান্য দুলতে শুরু করেছে, প্রতিটি দোল প্রকাণ্ড আকারের ঝুরিগুলোর কয়েক ইঞ্চির মধ্যে পৌঁছে দিচ্ছে ওকে। ফেরার সময় ভয়ে সিঁটকে কাঠ হয়ে থাকছে, কারণ আরেক দিকের ঝুরি কাছে চলে আসছে দ্রুত। এবার কি ধাক্কা লাগবে? চেয়ার থামল, ফিরতি পথ ধরছে–যাক, অন্তত ঝুরির হাত থেকে বিপদের কোন ভয় নেই ওর।

স্ট্র্যাপ খুলে গেল; এক হাতে চেয়ারটা ধরে থাকল রানা, আরেক হাতের শক্ত মুঠোয় আইস-অ্যাক্স; হলদেটে বৃত্তটাকে ওর দিকে নেমে আসতে দেখছে, হিসাব রাখছে দ্রুত কমে আসা দূরত্বের।

ঠিক এই সময়, ঠিক যে-মুহূর্তে কুয়ার মাথা সংলগ্ন সরু টিউবে চেয়ারটা ঢুকল, ক্লিক করে উঠল মগজ, সেই সঙ্গে উত্তরটা জানিয়ে দিল মনকে। দিনের পর দিন বিষয়টা নিয়ে ভাবছে রানা, সমস্ত ঘটনা আর তথ্য বিশ্লেষণ করে একটা উপসংহারে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। এখন, ওর সমস্ত মনোযোগ যখন অন্য কিছুতে, মনের প্রিন্টার খটখট শুরু করেছে।

কিন্তু এখন এ নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই, এমনকী সময় নেই পলকের জন্য সন্তুষ্ট বোধ করারও। পুলির উপর দিয়ে সুষ্ঠ-সাবলীল ভঙ্গিতে উঠে যাচ্ছে কেবল, ইলেকট্রিক মোটরের একটানা গুঞ্জন আর খুদে হুইলের ধাতব ক্লিক-ক্লিকও এখন শুনতে পাচ্ছে রানা।

হাতে বাগিয়ে ধরা কুড়ালটা উঁচু করল ও–অপেক্ষা করছে কখন সুইচ বন্ধ করা হবে, কখন দেখতে পাবে উঁকি মেরে তাকিয়ে থাকা মুখটা। সেকেন্ডের সামান্য একটা অংশ লাগবে তাকে চিনতে, তারপর অবশ্যই তাকে আঘাত করতে হবে রানার–দেরি করা চলবে না, ঠিকমত লাগাতেও হবে।

দশ ফুট। হাশমির নাম ধরে এক, দুই, তিনবার ডাকল রানা; কেউ সাড়া দিল না।

উত্তেজনায় টান-টান হয়ে চেয়ারটা থামার অপেক্ষায় রয়েছে রানা। ফ্রেমের ঝুলন্ত মাথাটা আরও কাছে চলে আসছে; রানার চোখ করোগেটেড স্টিল রিঙটার তলার সঙ্গে একই লেভেলে চলে এল, অর্থাৎ টেঞ্চের মেঝের সঙ্গেও! হঠাৎ রানা বুঝতে পারল চেয়ারটা থামবে না, ওটাকে সোজা ফ্রেম পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর মোটরের শক্তি চেয়ার আর রানাকে ঠেলে দেবে পুলির গায়ে।

বাঁচার জন্য রানা এখন মরিয়া, হাতের কুড়াল ফেলে দিয়ে করোগেটেড আয়রনটা ধরার জন্য চেয়ার ছেড়ে লাফ দিল একপাশে। কিন্তু দুলতে থাকা চেয়ারটায় ঘষা খেল শরীর, ফলে টার্গেট মিস করল ও। ধাতব ফ্রেমটার নাগাল

গেল শুধু বাঁ হাতটা। কুয়ার ঠিক মাঝখানে ঝুলে পড়ল শরীর, ডান হাত শূন্যে বাতাস খামচাচ্ছে; খালি চেয়ারটা দ্রুত বেগে উপরে উঠে ইস্পাতের তৈরি উইঞ্চ মেকানিজমের ভিতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে, পরমুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ওটা।

চোদ্দ

উন্মত্ত ভঙ্গিতে ডান হাত বাড়িয়ে দু'বার চেষ্টা করল রানা ধাতব ফ্রেমটা ধরতে, কিন্তু পারল না। অনুভব করল বাঁ হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে ওটা। ঠাণ্ডায় অসাড় আঙুল ওকে ঝুলিয়ে রাখবার শক্তি পাচ্ছে না। নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল ও, আর এক কী দু'সেকেন্ড পর খুলে আসবে হাত, তারপরই কুয়ার ভিতর খসে পড়বে শরীরটা।

আরেকবার চেষ্টা···এটাই শেষ। এবারও যদি ধরতে ব্যর্থ হয়, আর কোন আশা নেই ওর।

ডান হাতটা টেনে নিচ্ছে রানা, উল্টোপিঠের গ্লাভে কী যেন ঠেকল। নাইলন লাইন! খপ করে ধরল সেটা, কবজিতে এক পাক জড়াল। ধাতব কিনারা থেকে পিছলে বেরিয়ে এল বাঁ হাত। শেষ মুহূর্তে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল রানা, ভাবল, নাইলন লাইনটা ওর ভার সইবে তো?

ওজন জায়গা বদল শুরু করতে কবজির মাংসে কামড় বসাল লাইনটা, দীর্ঘ পতনের জন্য মানসিক ভাবে তৈরি হলো রানা। তারপর কবজির তীব্র ব্যথা জানিয়ে দিল, লাইনটা ওর ভার সহ্য করতে পারছে।

আবার মরিয়া হয়ে ধাতব ফ্রেমটা ধরতে চেষ্টা করল রানা, বাঁ হাত দিয়ে। শরীরটা লাইনের সঙ্গে পাক খাচ্ছে, তবু প্রথমবারই নাগাল পেয়ে গেল। এদিক-ওদিক আরও দু'বার দুলে ডান হাতটা বাড়াল। এবারও ধরতে পারল ফ্রেমটা।

এক মিনিট পর, বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে, করোগেটেড স্টিলের চার ফুট উঁচু বৃত্তটা টপকে ট্রেঞ্চের মেঝেতে পা রাখল রানা, একই সঙ্গে স্বস্তি আর অজানা ভয় অনুভব করছে।

সে যদি এখানে থেকে থাকে, হাতে বাড়ি মেরে কুয়ার মাথা থেকে নীচে ফেলে দেয়নি কেন ওকে?

উন্মাদের মত চারদিকে তাকাল রানা। ট্রেঞ্চটা মনে হচ্ছে খালি। কিন্তু না–খালি নয়! কুয়ার মাথার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছেন জাভেদ হাশমি, আর সার্জেন্ট মাথুর চৌহান পড়ে রয়েছে দেয়াল ঘেঁষে–উইঞ্চ কন্ট্রোল বক্সের নীচে।

ইলেকট্রিক মোটর এখনও নরম গুঞ্জন তুলছে। ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোককে পরীক্ষা করার জন্য তাড়াতাড়ি তাঁর পাশে হাঁটু গাড়ল রানা। উপুড় হয়ে পড়ে

আছেন, দু'হাত দিয়ে ধরে তাঁকে চিৎ করল ও।

ভদ্রলোকের হাত-পা মরা সাপের মত। তারপর তাঁর পারকায় বুলেটের গর্তটা দেখতে পেল, হার্টের উপর। জাভেদ হাশমি মারা গেছেন!

মারা গেছে সার্জেন্টও।

এরইমধ্যে জমাট বাঁধতে শুরু করা নিজের রক্তে শুয়ে আছে মাথুর চৌহান। মেঝেতে রক্তের লালচে দাগ দেখে বোঝা গেল, আহত অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে কুয়ার কিনারা থেকে মোটরের কাছে চলে আসে সে। রক্ত দেখা যাচ্ছে দেয়ালেও, সম্ভবত দেয়াল ধরে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল সার্জেন্ট।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কী ঘটেছে।

সার্জেন্টকে নিয়ে হ্যান্ডেলের কাছে ছিলেন হাশমি, ট্রেঞ্চের দরজা খুলল আর বন্ধ হলো, তারপরই দুটো গুলি; হাশমি সঙ্গে সঙ্গে মারা যান; মারাত্মক জখম নিয়ে মোটরের কাছে পৌঁছায় সার্জেন্ট চৌহান, নিজের জীবনের শেষ কয়েকটা মুহূর্ত ব্যয় করে সুইচটার নাগাল পাওয়ার জন্য, রানাকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা হিসেবে।

সে জানত আবার বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হওয়া মাত্র উইঞ্চ মেশিন আপনাআপনি চালু হয়ে যাবে, আইসক্যাপের গভীর পাতাল থেকে তুলে আনবে রানাকে।

এখন রানা জানে খানিক বিরতি সহ টোকা দুটো ছিল বুলেটের আওয়াজ। অস্পষ্ট আর ভোঁতা শোনাবার কারণ, গুলি দুটো সম্ভবত দূর থেকে করা হয়েছে, দরজার কাছাকাছি কোথাও থেকে।

রানার হাতঘড়ির হিসাবে, গুলি হওয়ার পর আঠারো মিনিট পেরিয়েছে। এই সময়টা কীভাবে ব্যয় করা হলো? কে ব্যয় করল?

তারপর, একেবারে হঠাৎ, সব পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে! মনের প্রিন্টার কিছুক্ষণ আগে থেকেই খটখট করছিল, এখন সুযোগ হলো প্রিন্ট-আউটে চোখ বুলাবার।

রানা এখন জানে 'তরুণ জি' কে, জানে সাদাদের পা চাটা কুকুরটার নাম কী, আন্দাজ করতে পারছে এখান থেকে কোথায় যেতে পারে সে।

হাশমির লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে চাবির খোঁজে পকেটগুলো দ্রুত সার্চ করল রানা। সিধে হলো, ছুটে এসে ট্রেঞ্চের তালা খুলে বেরিয়ে এল মেইন স্ট্রিটে। কেউ কোথাও নেই।

হনহন করে হেঁটে ট্র্যাক্টর শেডে চলে এল ও। দরজা খুলে ভিতরে পা রাখতেই গায়ে আছড়ে পড়ল ঠাণ্ডা বাতাস। বড় আউটার ডোর দেখা যাচ্ছে ভিতর দিকে খোলা!

অফিস কামরায় আলো জ্বলছে দেখে সেদিকে ছুটল রানা। দড়াম করে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। ডিউটি মেকানিক ডেস্কের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, তার মাথার নীচে একটা খোলা পেপারব্যাক।

লোকটার কাঁধ ধরে ঝাঁকাল রানা। কিন্তু সে ঘুমাচ্ছে না, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে। অফিস থেকে বেরিয়ে আউটার ডোরের সামনে চলে এল রানা।

তুমুল তুষারপাত হচ্ছে। তাজা তুষারের উপর বুলডোজারের ছাপগুলো দেখল ও, এরইমধ্যে ভরাট হয়ে গেছে, ভোঁতা হয়ে আসছে তীক্ষ্ণ কিনারাগুলো। তুষার এখন খাড়াভাবে পড়ছে, কারণ গতি হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে বাতাস। তারমানে আবহাওয়া এখন ভালো। আর আবহাওয়া ভালো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাজে বেরিয়ে পড়েছে শয়তানটা। এবং সন্দেহ নেই, চুরি করা খুদে রেডিওটা সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছে সে। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই তার জানা হয়ে গেছে যে আগে থেকে ফ্রিকোয়েন্সি সেট করা না থাকলে এই রেডিওর মাধ্যমে কোথাও কোন মেসেজ পাঠাতে হলে ভালো আবহাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

রানার ধারণা যদি সত্যি হয়, কোন একটা কাজে ভুল করে ফেলে নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনে কালপ্রিট।

অনেক সার্চ করেও জির লাশ পাওয়া যায়নি, এ তো রানা নেতাজি ক্যাম্পে এসেই শুনেছে। লুকিয়ে রাখার পর খুনি নিজেও বোধহয় লাশটা পরে আর খুঁজে পায়নি; হতে পারে এটাই ছিল তার ভুল।

কিংবা এটা নয়, অন্য একটা ভুল করেছে সে। সেটাকে ভুল না বলে দুর্ভাগ্যও বলা যায়–নিজের রেডিও নষ্ট করে ফেলা বা হারিয়ে ফেলা। তার নিজের একটা রেডিও থাকবে, এটা তো জানা কথা, তাই না? তা থাকা সত্ত্বেও রানার রেডিও চুরি করতে হলো কেন? সহজ উত্তর, হয় ভেঙে ফেলেছে, নয়তো হারিয়ে ফেলেছে।

দুই থেকে পাঁচশো মাইলের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপিয়ান বা আমেরিকানদের বেশ অনেকগুলো ওয়েদার স্টেশন আছে; বেশিরভাগই আসলে স্পাই স্টেশন, মিলিটারি পুলিশ চালায়। নিশ্চয়ই এরকম একটা স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে শয়তানটার। তাদের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিও জানে, প্রয়োজন হলে যাতে মেসেজ পাঠাতে পারে।

কিন্তু তার কাছে রেডিও না থাকায় মেসেজ পাঠিয়ে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদেরকে বলতে পারেনি, তাড়াতাড়ি আসুন, হুজুর! ডক্টর ফারুকের ফর্মুলা আর তার আবিষ্কারের নমুনা নিয়ে যান, উদ্ধার করুন আমাকে!

অর্থাৎ মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না হওয়াতেই ধরা পড়ার ভয়ে উন্মাদ হয়ে ওঠে সে, হয়ে ওঠে নৃশংস খুনি। এ-সব ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয় আর কী–একটা অপরাধ ঢাকার জন্য একের পর এক আরও অপরাধ করে যাওয়া–তাকেও তাই করতে হয়েছে।

একের পর এক হত্যাকাণ্ড আর স্যাবটাজ ঘটাবার পিছনে তার উদ্দেশ্য ছিল, ভয় পেয়ে সবাই যেন পালায়, ক্যাম্প নেতাজিকে যেন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। তাতে করে লাশ, আবিষ্কারের নমুনা আর ফর্মুলা ধীরেসুস্থে খুঁজে বের করবার সুযোগ আর সময় পাওয়া যাবে।

রানার আরও বিশ্বাস, ডক্টর ওসমান ফারুকের যুগান্তকারী আবিষ্কার, অর্থাৎ তাঁর উদ্ভাবিত উপকরণ আর ফর্মুলা কে চুরি করেছে তা জেনে ফেলেছিল তরুণ জি। তার খুন হওয়ার সেটাই কারণ।

তবে এটাই একমাত্র কারণ কিনা নিশ্চিত নয় রানা। এরমধ্যে চোরের উপর বাটপারি হয়ে থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

ডাক্তার হাসানের ডায়েরির লেখা বরং সেটাই সমর্থন করে। এমন হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি যে কে কি চুরি করেছে জেনেও কাউকে কিছু জানায়নি জি। কেন? লোভ ছাড়া এখানে আর কিছুর ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। কে জানে, হয়তো সেজন্যই শেষদিকে ডাক্তার হাসানকে দেখে ভয় পেত সে, এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করত।

এখন যেহেতু প্রকৃতি মুখ তুলে তাকিয়েছে, নিজের অনেক অপরাধের একটা চাপা দেওয়ার জন্য হাশমি আর চৌহানকে খুন করে ট্র্যাক্টর শেডের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেছে সে-জির লাশ খুঁজে বের করতে হবে ওকে, তার সঙ্গে পেতে হবে তিন ইঞ্চি লম্বা পাঁচটা টেস্টটিউব আর সাংকেতিক ভাষায় লেখা যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফর্মুলা।

প্রকাণ্ড শেডের এক প্রান্তে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে চকচকে বড়ে মিয়া, হোভারক্রাফটটা। ওটার দিকে এগোল রানা, পরমুহূর্তে থমকে দাঁড়াল।

ওর একটা অস্ত্র দরকার। কাঠের প্যাকিং কেসের উপর মুখ খোলা পেট্রলের একটা ড্রাম দেখা যাচ্ছে। একটা বোতল খুঁজে নিয়ে ড্রাম থেকে পেট্রল ভরল তাতে, ওটার গলার ভিতর খানিকটা তুলো গুঁজে দিল।

ঠাণ্ডার মধ্যে দিনের পর দিন অচল ফেলে রাখা হয়েছে, প্রথমবারের চেষ্টায় স্টার্ট নিল না বড়ে মিয়া। তবে দ্বিতীয়বার গর্জে উঠল ইঞ্জিন, সেই সঙ্গে রাবার স্কার্ট বেলুনের মত ফুলে গোটা কাঠামোটাকে উঁচু করে তুলল।

খোলা দরজা দিয়ে বড়ে মিয়াকে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। চোখ দুটোকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য একটু থামল এখানে। আলো জ্বালবার কোন ইচ্ছে নেই ওর।

তুষার খুব ঘন হয়ে পড়ায় বেশি দূর দৃষ্টি চলে না। চাঁদটা মেঘে ঢাকা পড়ে আছে। তবে অপেক্ষা করা উচিত হবে না রানার। বুলডোজার খুব ভারী আর মন্থর হলেও, দূরত্ব তো বেশি নয়। এরইমধ্যে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় পৌঁছে তল্লাশি চালাতে শুরু করেছে সে।

হোভারক্রাফট পুবদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে স্নোফিল্ডের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোল রানা, ক্যাম্প লেআউট-এর সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ মনে গেঁথে রাখার চেষ্টা করছে।

রানা জানে একটা চিহ্নিত পেরিমিটার চারশো গজ দূর থেকে ক্যাম্পটাকে ঘিরে রেখেছে। চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে পাঁচ গজ পর পর উঁচু ফ্লেক্সিবল স্টিল পোলের মাথায় তেকোনা পতাকা, পোলগুলো বেরিয়ে আছে তুষারে আধ ডোবা ব্যারেল থেকে। ওগুলোই অনুসরণ করবে সে, তা না হলে পথ হারানোর সমূহ আশঙ্কা, কাজেই রানাকেও তাই করতে হবে।

প্রবল তুষারপাতের মধ্যে দৃষ্টিসীমা বিশ গজেরও কম, অস্থিরতার লাগাম টেনে ধরে স্পিড কমিয়ে রাখছে রানা।

হঠাৎ নিজের নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করে দাঁতে দাঁত চাপল রানা। ছাপ!

ওকে শুধু লোকটার ছাপ অনুসরণ করতে হবে! এ হলো সেই হলুদ পদার্থের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কাজ না করার প্রমাণ!

বড়ে মিয়াকে ঘুরিয়ে নিয়ে ট্র্যাক্টর শেডের ম্লান হলদেটে আর চৌকো আলোর কাছে ফিরে এল রানা, তারপর পাশের জানালা খুলে বাইরের দিকে ঝুঁকল, সমতল মসৃণ সাদা সারফেসে প্রকাণ্ড ডিজেল ট্র্যাক্টরের ট্র্যাক-ট্রেইল খুঁজছে।

ওই তো! সামনে ছুটল বড়ে মিয়া, খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে রানার মুখে হিম কামড় বসাল বাতাস। হুডের ড্র-স্ট্রিং টেনে আরও আঁটো করল ও।

স্নোফিল্ড ধরে কিছু দূর যাওয়ার পরই একটা সমস্যা দেখা দিল। এদিকের তুষার মিহি পাউডারের মত, ফলে রাবার স্কার্টের নীচ থেকে প্রবাহিত বাতাসে ঘন কুয়াশার মত রানার চারদিকে উড়ছে সেগুলো, প্রায় অন্ধ করে দিচ্ছে ওকে।

স্পিড বাড়ালে সমস্যাটা হালকা হয়ে আসছে। কিন্তু রানাকে এগোতে হবে ধীরগতিতে। আলো না জ্বেলে ট্র্যাক্টর ট্র্যাক অনুসরণ করতে হচ্ছে ওকে, ইচ্ছে করলেও স্পিড বাড়াবার উপায় নেই ওর। অস্বস্তিকর আরও একটি ব্যাপারে সচেতন রানা, বড়ে মিয়া খুদে যে তুষারঝড় তৈরি করছে, সেগুলো ওর পিছনের সমস্ত ছাপ মুছে ফেলছে।

স্পিড একটু বাড়াল রানা। দৃষ্টিসীমা এত কম, হঠাৎ ট্র্যাক্টরটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ট্র্যাক্টরটাকে ধরতেই চায় ও, তবে এভাবে নয়।

তারপর হঠাৎ সামনে ঝুলতে দেখা গেল হাটটাকে, মাত্র কয়েক গজ দূরে। তাড়াতাড়ি ব্রেক কষে বড়ে মিয়াকে দাঁড় করাল রানা। নতুন একটা সমস্যা দেখতে পাচ্ছে ও।

বুলডোজারটাকে আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ওটাকে খুঁজতে হলে একটা স্টার্টিং পয়েন্ট থাকা দরকার। হাটটা সেই স্টার্টিং পয়েন্ট হতে পারে।

কিন্তু এখন ওটাকে পাশ কাটিয়ে রওনা হলে পরে আবার খুঁজে বের করতে সমস্যা বা দেরি হবে। তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বড়ে মিয়াকে বারো-তেরো গজ পিছিয়ে আনল রানা, তারপর নীচে নেমে পায়ে হেঁটে ওটার দিকে এগোল, আইসক্যাপের শুকনো তুষারে কয়েক ইঞ্চি পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে ওর পা।

হাটটার পাশে পৌঁছে ঘুরে বড়ে মিয়ার দিকে তাকাল রানা। ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে, তবে তুষারপাতের ভিতর এত ঝাপসা যে চারপাশের কিনারা ছাড়া আর কিছু পরিষ্কার নয়।

প্রথমে রানা ভাবল লাইনটা গায়েব হয়ে গেছে, গত কয়েকদিনের ঝড়ো বাতাসে উড়ে গেছে কোন দিকে। তারপর উপলব্ধি করল, হাটের গায়ে যে তুষার জমেছে তা মাপলে তিন কি সাড়ে তিন ফুট হতে পারে, তার বেশি নয়, কাজেই যে লাইনটা কোমর সমান উপরে থাকার কথা তা এখন গোড়ালির

কাছাকাছি থাকবে।

লাইনটা খুঁজছে রানা, কয়েক সেকেন্ড পরপর কাঁধের উপর দিয়ে পিছনটা দেখে নিচ্ছে–বুলডোজারের অনুপস্থিতিতে বিস্মিত, সেই সঙ্গে আশঙ্কা করছে যে-কোন মুহূর্তে হামলা হবে। তবে দৃষ্টিসীমার সীমিত পরিসরে কিছুই নড়ছে না। নিজেকে রানা এই বলে অভয় দিল, বুলডোজারের প্রকাণ্ড ইঞ্জিন নিশ্চয়ই ওকে আগাম সতর্ক করে দেবে।

তারপর ওর পায়ের সঙ্গে কিছু একটা ঘষা খেতে ঝুঁকে তুষারের উপরটা হাতড়াল রানা। লাইনটা মুঠোয় নিয়ে সিধে হলো, পারকা বেল্টের ডগ'স লিড ক্লিপে আটকাল সেটা। আরেকবার সতর্ক চোখে তাকাল চারদিকে–শয়তান বা তার বাহন, একটারও দেখা নেই।

লাইনটা দু'হাতে ধরে টানছে রানা, তুষারের নীচে থেকে তুলে আনছে, তারপর ওটাকে পাশে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। দশ গজ এগোবার পর প্রথম পোল-এর কাছে থামল ও, মাথায় তেকোনা পতাকা। রওনা হওয়ার আগে ক্লিপ খুলে আবার লাগাতে হলো।

এগোবার সময় সারফেসের প্রতিটি ইঞ্চি সাবধানে পরীক্ষা করছে রানা। নেতাজি ক্যাম্পের লোকজন এদিকটায় নিশ্চয়ই সার্চ করেনি। বিরূপ আবহাওয়ার কারণে নয়, আসলে এ-জায়গাটা সাইযমলজি হাট আর নেতাজি ক্যাম্পের মাঝখানে পড়ে না বলে।

এটা তো সাধারণ বুদ্ধি যে যেখানে কারও তল্লাশি চালাবার সম্ভাবনা নেই, কিছু লুকিয়ে রাখার জন্য সেই জায়গাটাই সবচেয়ে নিরাপদ।

লুকিয়ে রাখার পর অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেছে, তারমানে সেগুলোর উপর ইতিমধ্যে প্রচুর তুষার জমেছে। রানাকে অনেক গভীরে তল্লাশি চালাতে হবে।

তিন নম্বর পোলে পৌঁছাল রানা, ক্লিপ খুলে আবার লাগাল। হাটটাকে পিছনে ফেলে আসার পর মাত্র দু'মিনিট দশ সেকেন্ড পার হয়েছে, কাজেই এত তাড়াতাড়ি ওগুলো খুঁজে পাওয়ার আশা করাটা বোকামি। নিরাপত্তার কথা ভেবে নিশ্চয়ই ক্যাম্প থেকে যতটা পারা যায় দূরেই জিনিসগুলো লুকাবে সে। পরে জায়গাটা হারিয়ে ফেলার সেটাও একটা কারণ হতে পারে।

তারপর রানা ভাবল, যে লুকিয়েছে সে পায়নি, আমি তা হলে পাব কীভাবে?

এ প্রশ্নের জবাব দু'ভাবে দেয়া যায়।

জিনিসগুলো কোথায় লুকিয়েছে তা ভুলে গেছে লোকটা, এটা তো আসলে রানার ধারণামাত্র–সত্যি না-ও হতে পারে। বা আংশিক সত্যি হতে পারে। হয়তো এলাকাটা মনে আছে তার, মনে নেই শুধু নির্দিষ্ট পয়েন্টটা।

আবার এ-ও হতে পারে যে কিছুই ভোলেনি সে, পরিষ্কার মনে আছে কোথায় কীভাবে রেখেছে, কিন্তু খারাপ আবহাওয়া সহ অন্যান্য কারণে এতদিন সেখানে যেতে পারেনি।

ধীরে ধীরে এগোচ্ছে রানা। সারফেসের মসৃণ তুষারে বাতাসের অত্যাচার

ছাড়া আর কোন দাগ নেই। কোথাও বুট বা মেকানিক্যাল ট্র্যাক-এর ছাপ পড়েনি।

এভাবে দশ নম্বর পোলে পৌঁছাল ও। তারপর এগারোয়। আর চারটে পার হতে পারলে পেরিমিটারের অর্ধেকটা কাভার করা হবে।

ক্লিপ নতুন করে লাগিয়ে টান দিল রানা। তুষারের নীচে থেকে আড়াই গজের মত বিচ্ছিন্ন লাইন হড়হড় করে উঠে এল। স্থির হয়ে গেল রানা, হতভম্ব। ছেঁড়া লাইনের প্রান্তটা চোখের সামনে তুলে পরীক্ষা করল। মসৃণ ভাবটাই বলে দেয়, ধারাল ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে বারো নম্বর পোলের কাছে চলে এল রানা। একটু খুঁজতেই তুষারের সামান্য নীচে থেকে বারো আর এগারোর মাঝখানের লাইনটা খুঁজে বের করা গেল।

ওটা ধরে ধীরে ধীরে টানছে রানা। দেখা গেল এদিকের লাইনটাও বিচ্ছিন্ন, লম্বায় ওই আড়াই গজই, তুষারের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে ঝুলছে। এটার প্রান্ত পরীক্ষা করেও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল রানা, ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে।

হিসাব করছে ও। প্রতি পাঁচ গজ পরপর একটা করে পোল বা পতাকা। এগারো নম্বর পোলের বিচ্ছিন্ন লাইন আড়াই গজ পাওয়া যাচ্ছে, বারোটারও তাই। দুটো মিলিয়ে পাঁচ গজ। হিসাব মেলে, কাজেই এখানে কারও কিছু সন্দেহ করবার মত কিছু নেই। লাইন কাটা, এটাই যা একটা রহস্য। কে কাটবে? কেন কাটবে?

তবে এরচেয়ে আরও অনেক জটিল রহস্য সৃষ্টি হয়েছে ক্যাম্পের ভিতর, কোনটারই সমাধান পাওয়া যায়নি। কাজেই কেউ যদি দেখে যে ক্যাম্প পেরিমিটারের একটা লাইন কাটা, তার উত্তেজিত হয়ে উঠবার কোন কারণ নেই, তুষার সরিয়ে নীচে কিছু আছে কিনা দেখতে চাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

তবে মাসুদ রানার কথা আলাদা। ওর কি তুষার সরিয়ে দেখা উচিত নয় ওই জায়গার নীচে কিছু আছে কিনা?

তা আর বলতে!

হাঁটু গেড়ে বসে গ্লাভ পরা হাত দিয়েই তুষার সরাতে শুরু করেছে রানা। এক ফুট গভীরে কিছু নেই। নেই দু'ফুট গভীরেও।

হাঁপাচ্ছে ও, তবে শুধু পরিশ্রমে নয়। গর্তটা এখন তিন ফুট।

তুষারের ভিতর কি যেন ঠেকল হাতে। জিনিসটার উপর থেকে মিহি পাউডারের মত তুষার কণা সরাল রানা, আশপাশের ধবধবে সাদার মাঝখানে গাঢ় দেখাল ওটাকে। এক মুহূর্তের জন্য ঝুঁকল ও, নিজের ধারণা সত্যি প্রমাণিত হতে দেখে গম্ভীর হয়ে উঠল।

এখানে এই লাশটা পাওয়া যাবে জানত, তারপরেও আরেকটা মৃত্যু কাতর করে তুলল রানাকে। তবে হাতের কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাইছে ও। ওর ধারণা, লাশের সঙ্গে আবিষ্কারের নমুনা আর ফর্মুলাও পাওয়া

যাবে।

তুষারের তলায় থাকায় স্বভাবতই পচন ধরেনি লাশে। তবে চকলেট রঙের জমাট বাধা রক্ত দেখা যাচ্ছে বুকে।

বুকের কাছে পারকা সহ গরম কাপড়ের সবগুলো স্তর ধারাল কিছু দিয়ে কাটা হয়েছে। আচমকা ধারাল ফলার পোঁচ দিয়ে ঘ্যাচ্ করে ওগুলো কাটার ফলে জি হয়তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল, সেই সুযোগে ছুরির ডগাটা সবেগে তার হৃৎপিণ্ডে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

লাশের চারপাশে অগভীর নালার মত করে গর্ত খুঁড়ছে রানা, প্লাস্টিকের কৌটা আর ফোল্ডার পাবে বলে আশা করছে; কৌটায় থাকবে তিন ইঞ্চি লম্বা পাঁচটা টেস্টটিউব, আর ফোল্ডারটায় থাকবে কাগজের একটা বান্ডিল–অর্থাৎ ফর্মুলাটা।

কিন্তু হতাশ হতে হলো রানাকে। লাশের চারপাশে কিছু নেই। আচ্ছা, লাশ আর চুরি করা জিনিস আলাদা জায়গায় রাখেনি তো? তা হলে তো খুঁজে বের করা অসম্ভব। কে বলবে তুষার ঢাকা ধু-ধু প্রান্তরের কোথায় লুকিয়ে রেখেছে!

না, লাশের আশপাশটাই আরও ভালো করে দেখতে হবে। যদি কিছু না পাওয়া যায় তা হলে মনে করতে হবে ওর কপাল খারাপ।

লাশটাকে কাত করল রানা, পিঠের নীচেটা দেখবে।

আরে, এখানে এটা কী পড়ে রয়েছে!

দ্রুত হাত চালিয়ে তুষারের ভিতর থেকে জিনিসটা বের করে হাতে নিল রানা। হ্যাঁ, এত খাটনি আর মাথা ঘামানো সার্থক হতে চলেছে ওর।

তবে যা খুঁজছিল, আবিষ্কারের নমুনা বা ফর্মুলা, সে-সব কিছু নয়; এটা অত্যন্ত শক্তিশালী একটা রেডিও। নেড়েচেড়ে, অন-অফ করে দেখল রানা। অক্ষত। কাজ করে কিনা এখনই রানা পরীক্ষা করে বলে দিতে পারে।

রেডিওটা আবার অন করে নির্দিষ্ট একটা ফ্রিকোয়েন্সি সেট করল রানা। তারপর নব ঘোরাতেই রানা এজেন্সির কুইবেক শাখার প্রধান শহীদুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে গেল।

'জী, বলুন, মাসুদ ভাই,' সাড়া দিল শহীদ।

'তুমি এখন কোথায়, শহীদ? থিউলে?'

'জী, মাসুদ ভাই।'

'থিউলের কোথায়?'

'গ্রিনল্যান্ড সরকারের কমিউনিকেশন সেন্টারে, মাসুদ ভাই।'

'ভালোই হলো তা হলে। ওখান থেকে ইন্টারপোলের স্যাটেলাইট মনিটরিং সেন্টারটা কাছেই। শোনো, তোমাকে কী করতে হবে বলছি।'

'জী, মাসুদ ভাই।'

শুরু করবার আগে হাঁটুর উপর সিধে হলো রানা, উঁচু করা মাথা ঘুরিয়ে চারদিকটা আরেকবার দেখে নিল। 'ওই স্যাটেলাইট মনিটরিং সেন্টারের চিফ হলো মাইকেল বব। নিগ্রো, আমার বন্ধু। এখনই ওর কাছে চলে যাও তুমি।'

'জী। তারপর, মাসুদ ভাই?'

'মাইকেলকে আমার কথা বলবে, তারপর অনুরোধ করবে, নেতাজি ক্যাম্পের দু'পাঁচশো মাইলের মধ্যে ইউরোপ বা আমেরিকানদের কোন বিশেষ তৎপরতা দেখা গেলে তোমাকে যেন জানায়। আর সে জানালেই সেটা তুমি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে।'

'জী, মাসুদ ভাই।'

'সেই সঙ্গে আরও একটা কাজ করতে হবে তোমাকে,' বলল রানা। 'থিউল গ্রিনপিস-এর অফিসকে বলে রাখো, কোন একটা দেশ নেতাজি ক্যাম্পের আশপাশে পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর রাসায়নিক বর্জ্য ফেলবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তারা যেন ক্যামেরা আর কপ্টার নিয়ে তৈরি থাকে; ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করলে তাদেরকে জানানো হবে।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই,' বলল শহীদ। 'আমি এখনই কাজ শুরু করছি।'

শহীদকে আরও দু'একটা জরুরি পরামর্শ দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

কোথাও পরিবেশ দূষিত হচ্ছে শুনলে হই-হই করে ছুটে আসে গ্রিনপিস। যদি দেখে ওর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা আছে, মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে হলেও ওদেরকে ডেকে নেবে রানা। লোকজন, অর্থাৎ সাক্ষীদের সামনে শ্বেতাঙ্গ ষড়যন্ত্রকারীরা ওর কোন ক্ষতি করার সাহস পাবে বলে মনে হয় না।

এখন এটা পরিষ্কার যে রেডিওটা নষ্ট বলে এখানে ফেলে রেখে যাওয়া হয়নি। তা হলে?

কালপ্রিট সম্ভবত এখানে এটাকে ভুলে ফেলে রেখে গেছে।

কিন্তু আবিষ্কারের নমুনা আর ফর্মুলা কোথায় রেখেছে সে?

হঠাৎ অন্য একটা কথা ভাবল রানা। কেউ যদি লাশ খুঁজে পায় তা হলে চুরি যাওয়া জিনিসগুলোও পেয়ে যাবে, বোকার মত এরকম একটা আয়োজন কেন করবে অপরাধী?

চারদিকে সাবধানে আবার চোখ বুলাল রানা। দৃষ্টিসীমা বদলায়নি, আগের মতই বিশ গজ; তার ভিতর কিছুই নড়ছে না। কান পাতল। যান্ত্রিক শব্দ বা অন্য কোন আওয়াজ, কিছুই নেই।

কুকুরটা কোথায় আছে, কী করছে আন্দাজ করতে পারছে রানা। ভালো আবহাওয়ায় বেরিয়ে এসে প্রথমেই সে যোগাযোগ করছে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের সঙ্গে। কিন্তু আবহাওয়া এখানে ভালো হওয়ার মানে এই নয় যে আইসক্যাপের অন্যান্য জায়গাতেও ভালো। নতুন ফ্রিকোয়েন্সি সেট করে কানেকশন পেতে তার হয়তো সমস্যা হচ্ছে। কিংবা এখানকার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে অনেক বেশি সময় নিচ্ছে সে। লাগতেই পারে বেশি সময়, যে লেজেগোবরে অবস্থা করে রেখেছে!

গর্ত থেকে লাশটা তুলে এক পাশে সরিয়ে রাখল রানা। তারপর তুষার খুঁড়ে কবরটাকেই আরও গভীর করতে শুরু করল। প্রথমে খুঁড়ছে লাশের

যেখানে মাথা ছিল, ঠিক তার সরাসরি নীচে।

যে লোক মনে করে ছেঁড়া লাইনের নীচের তুষার সরিয়ে কেউ সার্চ করবে না, তার-পক্ষে এ-ও ভাবা স্বাভাবিক যে লাশের নীচে আর কেউ খুঁড়বে না।

সে তো আর জানত না কার সঙ্গে তার পাঞ্জা ধরতে হবে!

তবে আরও ফুটখানেক তুষার সরাবার পর কিছু দেখতে না পেয়ে মনটা দমে গেল রানার। তারপরও, কাজটায় কোন খুঁত রাখতে চায় না বলে, আবার তুষার সরাতে শুরু করল ও। এবার লাশটার যেখানে পা ছিল, সরাসরি সেই জায়গার নীচে।

তার আগে মাথা তুলে চাকদিকটা ভালো করে আরেকবার দেখে নিল রানা। দৃষ্টিসীমা একই আছে। না কোথাও কিছু নড়ছে, না কোনও যান্ত্রিক গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

এখানেও ফুটখানেক তুষার সরাল রানা। আর শিকেটা এখানেই ছিঁড়ল বিড়ালের ভাগ্যে! তবে রানা যেমন ভেবেছিল, প্লাস্টিকের কৌটা আর ফোল্ডার নয়। লম্বা করে শোয়ানো, এটা একটা বড়সড় ফ্লাস্ক।

চারপাশ থেকে আরও কিছু তুষার সরিয়ে ওটাকে খাড়া করল রানা, প্যাঁচ ঘুরিয়ে মুখ খুলে ভিতরে তাকাল। মোটা পলিথিনে মোড়া একটা প্যাকেট দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে, ফ্লাস্ক থেকে টেনে সেটাকে বের করল ও। ভিতরে তাকাতে দেখল নীচে আরও কী যেন একটা রয়েছে।

আরও কী মানে একটা স্টিলের কৌটা; ইঞ্চি পাঁচেক লম্বা, ডায়ামিটারে ইঞ্চি তিনেক হবে। ফ্লাস্ক থেকে বের করে ওটাই প্রথমে খুলল রানা।

ভিতরে সরু আর গোল আকৃতির পাঁচটা ঘর রয়েছে, ঘরের বৃত্তাকার দেয়াল তুলো দিয়ে মোড়া। প্রতিটি ঘরের মাথায় একটা করে টেস্টটিউবের ছিপি দেখা যাচ্ছে।

কৌটাটা কোলের উপরে রাখল রানা, তারপর অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নরম তুলোর মাঝখান থেকে একটা টেস্ট টিউব বের করল।

কাঁচের ভিতর টলটল করছে স্বচ্ছ তরল পদার্থ। অন্তত রানার মনে কোন সন্দেহ নেই যে এটাই ডক্টর ওসমান ফারুকের যুগান্তকারী আবিষ্কার, ভাইরাস ভি-টোয়েনটিনাইন।

এই ভি-টোয়েনটিনাইন একজন মানুষকে দু'ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ পচিয়ে দেবে। আর পচন শুধু একবার ধরলে হয়, মাংস খসে খসে পড়তে থাকবে। এটা ছড়াবে বাতাসের মাধ্যমে। বলাই বাহুল্য যে আক্রান্ত হবে শুধু শ্বেতাঙ্গরা।

ইতিমধ্যে টেস্টটিউবটা আবার যত্ন করে ইস্পাতের কৌটায় ভরে রেখেছে রানা। ঢাকনি বন্ধ করে কৌটাটা নিজের পারকার একটা পকেটে রেখে দিল।

এরপর পলিথিনের মোড়কটা খুলল রানা। মোড়কটা স্বচ্ছ নয়, তাই ভিতরে কী আছে বোঝা যায়নি। খোলার পর গোল পাকানো অনেকগুলো কাগজ দেখল ও, যেন একটা পাণ্ডুলিপি। কাগজগুলো সমান করার পর দেখা গেল তাতে জটিল অঙ্ক গিজগিজ করছে, আর সেই সব অঙ্কের ফাঁকে দুর্বোধ্য

সাংকেতিক ভাষায় রাশি রাশি কী সব লেখা হয়েছে।

এতে দাঁত বসানো ওর কর্ম নয়, তাড়াতাড়ি কাগজগুলোকে আবার গোল পাকিয়ে পলিথিনে মুড়ে রাখল রানা, প্যাকেটটা চালান হয়ে গেল পারকার আরেক পকেটে। তারপর মাথা তুলে চারদিকে চোখ বুলাল।

এখনও শত্রুর দেখা নেই।

ফ্লাস্কটাকে আগের জায়গায় নয়, তুষারের সামান্য নীচে শুইয়ে রাখল রানা, কারণ একটু পর সময় করে আরেকবার এখানে আসতে হবে ওকে।

তারপর কবরের কিনারা থেকে নীচে নামাল জির লাশ, দ্রুত হাতে তুষার দিয়ে ভরে ফেলল গর্ত। তালু দিয়ে চাপড়ে যতটা পারা যায় সমান করল জায়গাটা। একটু সরে এসে দূর থেকে হাতের কাজটা দেখল।

না, নিখুঁত করা যায়নি, চোখ পড়লেই বোঝা যাবে এখানকার তুষার খোঁড়া হয়েছিল। তবে মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরই দেখা গেল, প্রতি মুহূর্তে এত বেশি তুষার পড়ছে যে এরইমধ্যে মসৃণ ভাব অনেকটাই ফিরে এসেছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে চারপাশ থেকে এটাকে আলাদা করে চেনা যাবে না।

ঘুরে দাঁড়াল রানা, ফেলে আসা পথ ধরে ফিরছে; প্রতি জোড়া পতাকার মাঝখানের লাইনগুলো গাইড করছে ওকে; জানে, আশপাশেই কোথাও আছে সে।

রানা উপলব্ধি করল, সময়-সুযোগ থাকতে জিনিসগুলো লুকিয়ে ফেলা দরকার। কিন্তু বুঝতে পারছে না কোথায় রাখা যায়।

জায়গাটা শুধু নিরাপদ হলে চলবে না, প্রয়োজনের সময় তাড়াতাড়ি খুঁজেও পেতে হবে। বরফ আর তুষারে ঢাকা আইসক্যাপে সেরকম লুকানোর জায়গা কোথায় পাবে ও?

হাটটা মাত্র একশো গজ কী তার কিছু বেশি দূরে, কিন্তু বেল্টে বারবার ক্লিপ লাগাতে আর খুলতে হওয়ায় প্রচুর সময় বেরিয়ে যাচ্ছে।

পাঁচটা পতাকা পিছলে ফেলে আসার পর থামল রানা। দৃষ্টিসীমার মধ্যে কিছু নড়ছে না। কানে কোন শব্দও নেই। আধ ডোবা একটা ব্যারেলের সামনে হাঁটু গাড়ল ও, দ্রুত হাত চালিয়ে ওটার গোড়া থেকে তুষার সরাচ্ছে।

গর্তটা দু'ফুটের মত গভীর করল রানা। ইস্পাতের কৌটা আর পলিথিনের প্যাকেট তার ভিতর রেখে আবার ভাল করে তুষার চাপা দিল।

তার আগে আরেকটা কাজ করছে ও–ডাক্তার হাসানের ডায়েরি আর তাঁর নোটবুক থেকে ছেঁড়া পাতাটা পলিথিনের প্যাকেটে ভরে রেখেছে।

রানা নিশ্চিত, কাজগুলো করার সময় কেউ ওকে দেখেনি।

গর্তটা খুব ছোট ছিল, তাই খুব তাড়াতাড়ি সমান হয়ে আশপাশের সঙ্গে মিশে গেল। এখন দেখে কেউ বলতে পারবে না যে এখানে কোন গর্ত করা হয়েছিল। ফিরতি পথ ধরে আবার রওনা হলো রানা।

নয়টা পতাকা পিছিয়ে পড়ল, কিন্তু তারপরও হাটটার দেখা নেই। তবে রানার মনে হলো, বড়ে মিয়ার নিস্তেজ করা ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন যেন শুনতে পাচ্ছে ও।

ওটার দিকে ছুটে যাওয়ার ঝোঁকটা দমন করা কঠিন—কারণ জানা আছে, ভিতরে একবার ঢুকতে পারলে ওটার ধাতব কাঠামো যথেষ্ট নিরাপত্তা দেবে ওকে, হিটার থেকে পাওয়া যাবে উষ্ণতা, আর খোদ বাহনটা থেকে মিলবে গতি।

কিন্তু সে যে বাইরে রয়েছে, এ ব্যাপারে সতর্ক না হলে নিজের বিপদ ডেকে আনা হবে। ওর ধারণা, রাইফেলটা এখনও নিজের কাছেই রেখেছে সে। ইঞ্জিনিয়ার হাশমি আর সার্জেন্ট চৌহানকে গুলি করার পর ওটা সে নিশ্চয়ই কর্নেলের অফিসে রেখে আসতে যাবে না, কারণ তাতে তার ঝুঁকির মাত্রা অনেক বেড়ে যায়।

আরও একটু এগোবার পর হাটটা দেখতে পেল রানা। পরমুহূর্তে অলস ইঞ্জিনের গুঞ্জন গর্জনে পরিণত হলো, সেই সঙ্গে প্রকাণ্ড ডিজেল ট্র্যাক্টর যেন লাফ দিয়ে চলে এল দৃষ্টিপথে, উজ্জ্বল আলো পুরোপুরি অন্ধ করে দিয়েছে রানাকে।

পনেরো

ধেয়ে আসছে প্রকাণ্ড বুলডোজার।

অন্ধের মত শূন্য হাতড়ে ওটার পথ থেকে সরে যাবার চেষ্টা করল রানা। কীভাবে যেন খানিকটা ঘুরে গেছে ও। ইঞ্জিনের গর্জনটা ভেসে আসছে ওর ডান দিক থেকে, যদিও এক সেকেন্ড পর মনে হলো ওর চারপাশের সমস্ত শূন্যতা ওই কর্কশ আওয়াজে ভরাট হয়ে গেছে। আন্দাজ করল, ওর কাছ থেকে পঁচিশ কি ত্রিশ গজ দূরে রয়েছে বুলডোজার, খুব বেশি হলে ঘণ্টায় ছয় মাইল স্পিড।

এখনও চোখে কিছু দেখছে না রানা। বাঁ দিকে ঘুরে ছুটল, পরক্ষণে দড়াম করে আছাড় খেল তুষারের উপর, পায়ে লাইন জড়িয়ে গেছে।

তুষার খামচে সিধে হবার চেষ্টা করছে রানা, পায়ে এখনও বেধে আছে লাইনটা। দেরি করিয়ে দিচ্ছে হয়তো এক কি দু'সেকেন্ডই, কিন্তু সেটাই আজরাইলকে ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট হয়ে উঠল—মনে হলো ওর ঘাড়ে এসে পড়ছে বুলডোজার।

পা ছাড়িয়ে নিয়ে হাত তুলে চোখে ছায়া ফেলল রানা, তারপর যান্ত্রিক দানবটার দিকে তাকাল। তীব্র আলো এখন অনেকটাই সয়ে এসেছে, ওটার ঠিক উপরে গাঢ় আর চৌকো একটা আকৃতি দেখতে পেল ও।

পরমুহূর্তে ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুক। বুলডোজারের চওড়া, ভারী আর ধারাল ফলাটা নীচে নামানো হচ্ছে, সরাসরি ছুটে আসছে ওকে কেটে ছিন্নভিন্ন করার জন্য।

ঘুরেই ছুটল রানা। কিন্তু কী আশ্চর্য, ঠিক এই চরম সংকটের সময়

দুর্ভাগ্য ওর পিছু ছাড়ছে না! এবার আলগা তুষারে পা আটকে যাওয়ায় ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারল না। সেটা ফিরে পেয়ে আবার যখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে, ততক্ষণে ওর উপর প্রায় উঠে এসেছে বুলডোজার।

আতঙ্কিত হয়ে ওটার মুখোমুখি হলো রানা, জানে ওই আঠারো ফুট ফলাটাকে এড়াবার কোন পথ খোলা নেই আর, একপাশে সরে যাওয়ার আগেই ওর নাগাল পেয়ে যাবে ওটা।

এত কাছ থেকে ওটার দিকে তাকিয়ে তীব্র আলো ছাড়া আর মাত্র একটা জিনিসই দেখতে পেল রানা–গাঢ় আর চৌকো যে জিনিসটার উপরে চোখ ধাঁধানো আলোটা বসানো রয়েছে, ওর কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে। প্রাণ বাঁচানোর শেষ চেষ্টা হিসাবে ওটাকে লক্ষ্য করেই লাফ দিল রানা।

ওটার উপরের কিনারা ধরে ঝুলে পড়ল রানা, সারফেস থেকে শূন্যে তুলে ফেলায় পা দুটো ঝুলছে, ফলাটা আগের মতই ছুটে চলেছে সামনে।

রানাকে নিশ্চয় পরিষ্কারই দেখতে পেয়েছে সে, কারণ এক সেকেন্ড পরই হাইড্রলিকের সাহায্য নিয়ে ফলাটা উঁচু করতে শুরু করল। ওটা উঠছে, আর ঝুলন্ত অবস্থায় রানা ভাবছে এরপর কী ঘটবে।

রানাকে রীতিমত ভড়কে দিল কৌশলটা।

হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল হাইড্রলিক, অমনি বিকট শব্দে খসে পড়ল ফলা। প্রচণ্ড ঝাঁকি খাইয়ে ওকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে সে।

আবার উঁচু হচ্ছে আঠারো ফুটী ফলা। অসম্ভব, আরেকটা ঝাঁকি লাগলে আর ঝুলে থাকতে পারবে না রানা! মাত্র অর্ধেকটা উঠেছে ফলা, কিন্তু এরইমধ্যে কিনারা থেকে পিছলে নেমে আসছে ওর আঙুলগুলো।

রানা বলতে পারবে না এক বা দু'সেকেন্ড পর ঝাঁকি খেয়ে খসে পড়ার বদলে কী কারণে স্বেচ্ছায় হাত দুটো ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও। ঢালু ফলার গা বেয়ে পিছলে নেমে এসে তুষারে পড়ল, উন্মত্তবেগে ওটার তলা দিয়ে গড়িয়ে দিল শরীরটাকে, প্রার্থনা করছে ও পার হয়ে যাবার আগেই যেন নেমে না আসে ফলাটা।

ঝট করে শরীরটাকে আধ পাক ঘুরিয়ে নিল রানা, তারপর লম্বা হয়ে পড়ে থাকল। ফলাটার দ্বিতীয় পতন জোরে একটা ঝাঁকি দিয়ে গেল ওকে।

প্রকাণ্ড একজোড়া ট্র্যাক-এর মাঝখানে, দশ ফুট ফাঁকের ভিতরে, আটকা পড়ে আছে রানা; এখনও অন্ধই বলা যায়, তবে ক্রল করে পিছন দিকে এগোচ্ছে।

এখন যদি হঠাৎ থামে সে, তারপর বুলডোজারটাকে লাটিমের মত ঘোরায়–রানা শেষ!

তীব্র আর কঠিন আলোর অত্যাচার থেকে মুক্ত এখন রানা, ঘন ঘন চোখ মিটমিট করছে, সচল বুলডোজারের পিছনে চৌকো একটা আকৃতি বা ফ্রেমের ভিতর আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে সাদা বরফ; আলগা তুষারের উপর দিয়ে ও যেন সাঁতরাচ্ছে সেদিকে।

দৈত্যাকার ইস্পাতের মেশিনটা ওর মাথা থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি উপরে,

মাঝে মধ্যে ট্র্যাকগুলোর খুব কাছাকাছি চলে যাচ্ছে ওর হাত বা পা।

হঠাৎ ইঞ্জিনের আওয়াজটা সামান্য বদলে গেল। কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ধক করে উঠল রানার বুক। ট্র্যাকে অতিরিক্ত পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে শুরু করল বুলডোজার।

বুলডোজারের সঙ্গে তাল বজায় রেখে ক্রল করতে হওয়ায় নার্ভাস হয়ে পড়ল রানা। একটা হাত বা পা ট্র্যাকের তলায় একটু আটকালে হয়, চোখের পলকে গোটা শরীরটাকেই টেনে নেবে।

তারপরও যদি পারা যায় এগিয়ে থাকতে চেষ্টা করছে রানা, জানে বাঁচতে হলে বুলডোজারের পিছন দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে ওকে। হঠাৎ চৌকো ফাঁকটা একদম কাছে চলে এসেছে দেখে ক্রল করার গতি বাড়িয়ে দিল ও। যান্ত্রিক দানবটার নীচে থেকে বেরিয়ে আসার সময়, আটকাতে না পারলেও, একদিকের ট্র্যাক সত্যি সত্যি ঘষা খেল ওর বুটের সঙ্গে।

বেরিয়ে আসতে পেরে এখন রানা ট্র্যাক্টরের পিছনে পজিশন নিতে পারবে, ফলে ওকে দেখতে পাবে না সে।

কীসের পজিশন নেওয়া, ঘুরে দৌড় দিল ও! মনে পড়ে গেছে বড়ে মিয়ার ক্যাবে পেট্রল বোমা আছে।

রানা ছুটছে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দিক বদলে ওকে ধাওয়া করছে বুলডোজার। তাতে একটু হলেও সুবিধে হলো রানার–ওটার উজ্জ্বল আলোয় হাটের পিছনে দাঁড়ানো হোভারক্রাফটকে দেখতে পেল পরিষ্কার।

আলগা তুষারের উপর দিয়ে দৌড়ে স্পিড তোলা যাচ্ছে না, অথচ পরিশ্রম খুব বেশি হচ্ছে, ফলে হাঁপাচ্ছে রানা। পিছনের বুলডোজার এখনও বেশ কয়েক গজ দূরে হলেও, ব্যবধানটা কমে আসছে।

তারপর বড়ে মিয়ার কাছে পৌঁছে গেল রানা। হ্যান্ডরেইলটা শক্ত করে ধরল, পা রাখল ধাপে, এবার ঢুকে পড়বে ক্যাবে–পাখি ডাকার মত কিচিরমিচির শব্দ হলো একবার, সেই সঙ্গে কাঁচের স্ক্রিন মাকড়সার জাল হয়ে গেল। কাজেই এখন নিঃসন্দেহে জানা গেল, রাইফেলটা এখনও তার কাছে।

আরেকটা গুলি হলো, তবে কাছাকাছি এল না।

ক্যাবে উঠে আলো জ্বালেনি রানা, কন্ট্রোলের দিকে ঝুঁকে কোথায় কী আছে দেখে নিল প্রথমে। তারপর বড়ে মিয়াকে সামান্য একটু ঘোরাল। উইন্ডস্ক্রিনে চোখ পড়তে অবাক হয়ে দেখল সামনে তুষার ছাড়া আর কিছু দেখার নেই।

আলো নিভিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে সে। বুলডোজার যদি কোন শব্দ করেও, হোভারক্রাফটের ইঞ্জিন চালু থাকায় শুনতে পাচ্ছে না রানা।

রণকৌশল হিসাবে তার জন্য ঠিক আছে ব্যাপারটা। টন টন ইস্পাত আর লোহার তৈরি ওই বুলডোজার আদর্শ বর্ম হিসাবে নিরাপত্তা দিচ্ছে তাকে, ওটার ভিতর আরামে বসে রানার জন্য অপেক্ষা করছে সে। অপেক্ষা করছে, নাকি সরে গিয়ে অন্য কোন দিক থেকে হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে?

এখন আর তার বোধহয় তেমন তাড়া নেই। আবহাওয়া সহযোগিতা করায় জরুরি মেসেজটা পাঠাতে পেরেছে সে। প্রভুরা চলে আসছে, এখন শুধু ধৈর্য ধরে

কিছুক্ষণ অপেক্ষা।

তার প্রভুরা ঠিক কোথায় রয়েছে, সেটার উপর নির্ভর করবে কতক্ষণের মধ্যে এখানে এসে পৌঁছাবে তারা। পাঁচশো মাইল দূর থেকে রওনা হলে একটা সামরিক কপ্টারের পৌঁছাতে তিন ঘণ্টা তো লাগবেই। কে জানে, আসলে হয়তো রওনা হবে একশো মাইল বা তারও কাছাকাছি থেকে।

এদিক থেকে পা-চাটা কুকুরটা যোগাযোগ করতে দেরি করেছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে এ-কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে তার কন্ট্যাক্ট, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বর্ণবাদীদের প্রতিনিধি চুপ করে বসে থাকবে। সে বা তারা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, তারপরও এদিক থেকে যোগাযোগ করা না হলে কী ঘটেছে দেখার জন্য নিজেরাই চলে আসবে–অন্তত যুক্তি আর স্বাভাবিক বুদ্ধি তাই বলে–বিশেষ করে যুগান্তকারী আবিষ্কারটির গুরুত্বের কথা মনে রাখলে।

ঝুঁকে পায়ের কাছে রাখা হিটারটা চালু করল রানা। নব ঘুরিয়ে বাতাসের প্রবাহ অ্যাডজাস্ট করল, পা দুটোয় যাতে বেশি গরম লাগে। কম্পাসের উপর চোখ রেখে বড়ে মিয়াকে ছেড়ে দিল ও।

খানিক দূর এগোতেই তুষারের উপর বুলডোজারের ছাপ দেখতে পেল রানা, তবে অবিরত ঝরতে থাকা নতুন তুষার কণা দ্রুত সেগুলোকে গায়েব করে ফেলছে। সাবধানে হাটটাকে পাশ কাটিয়ে এল ও।

দূরত্ব মাপা, দিক নির্ণয়, নিজের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা–কিছুই নিখুঁতভাবে সম্ভব হচ্ছে না। ইতিমধ্যে আবার বাতাস বইতে শুরু করেছে, কাজেই স্পিডোমিটারের কাঁটা দেখে দূরত্ব মাপলে ভুল হতে বাধ্য।

বাতাসের গতি বেড়ে গেছে। বুলডোজারের ছাপ অস্পষ্ট হতে হতে এক সময় একেবারে মিলিয়ে গেল।

আরও মিনিট বিশেক এগোল রানা। দৃষ্টিসীমা এখন আর বিশ গজ নেই, কমে চোদ্দো-পনেরো হয়ে গেছে। বুলডোজার কোথায়, কোন দিকে আছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে কয়েকবার ইঞ্জিন বন্ধ করে কান পেতেছে ও। কিছু শুনতে পায়নি।

সিদ্ধান্ত পাল্টে বড়ে মিয়াকে ঘুরিয়ে নিল রানা। অন্ধের মত চারদিকে না হাতড়ে হাটটার পাশে পৌঁছে অপেক্ষা করবে। স্পিড বাড়িয়ে ফিরে যাচ্ছে।

ফেরার সময়ও সেই একই সমস্যা–দিক নির্ণয় সম্ভব হচ্ছে না, জানে না কোনদিকে যাচ্ছে বা কোথায় রয়েছে।

বুলডোজার নিয়ে এভাবে তার লুকিয়ে পড়ার কারণটা আন্দাজ করতে পারছে রানা। কুয়ার ট্রেঞ্চে রাইফেলের দুটো গুলি ব্যবহার করেছে সে, তা হলে মোট খরচ হয়েছে চারটে।

রাইফেল নিয়ে কর্নেল যাদবের সঙ্গে ওর একবার আলাপ হলেও, ম্যাগাজিনে ক'টা বুলেট আছে তা ওর জানা নেই।

রানা ধারণা করছে, বুলেট কম বলেই দূরে সরে আছে সে; হামলাটা করবে আচমকা, অপ্রত্যাশিত কোনও দিক থেকে, আর এক কি দুটো গুলি ব্যবহার করেই মিটিয়ে ফেলতে চাইবে ঝামেলা।

ওই এক কি দুটো বুলেটই আছে, তার বেশি নয়।

ফিরতি পথ ধরার পর আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, অথচ হাটটার দেখা নেই এখনও। চিন্তায় পড়ে গেল রানা। আগেই হয়তো দিক ভুল করেছে, এখন নতুন করে বাঁক ঘুরলে সমস্যা আরও বরং জটিল হবার আশঙ্কা।

বড়ে মিয়ার স্পিড একটু বাড়াল রানা। তবে আলোটা নিভিয়ে দিল। মন বলছে আরেকটু সামনে এগোলেই হাটটাকে দেখতে পাবে। আর বুলডোজার নিয়ে বোধহয় সেটার আশপাশেই কোথাও আছে সে।

পরস্পরকে দেখতে পাবার পর কী ঘটবে? তার কাছে রাইফেল আছে, কাজেই রানাকে গুলি করে ফেলে দিতে চেষ্টা করবে সে। আর রানা?

রানাও তৈরি।

কয়েকটা পকেট হাতড়েও দেশলাই খুঁজে না পেয়ে ঘাবড়ে গিয়েছিল ও। পরে অন্য একটা পকেট থেকে বেরুল সেটা, কাঠি মাত্র চারটে।

হোভারক্রাফটের স্পিড আরও একটু বাড়াল রানা। তারপর হঠাৎ দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে, এক জোড়া পতাকার মাঝখানে অস্পষ্ট একটা আকৃতি, দেখা যায় কি যায় না, অলস ভঙ্গিতে দূরে সরে যাচ্ছে বলে মনে হলো। গিয়ার বদলে স্পিড আরও বাড়াল ও, প্রায় লাফ দিয়ে বুলডোজারের পাশে চলে আসছে।

রানা দেখল ওটার পিছনের জানালায় তুষারের মোটা স্তর জমে আছে। তারমানে, ভাগ্য ভাল হলে, এখনই ওকে দেখতে পাবে না সে।

হোভারক্রাফটকে সাবধানে বুলডোজারের পাশে নিয়ে এল রানা, পিছিয়ে থাকল সামান্য একটু; উঁচু করা একটা হাঁটু আটকাল স্টিয়ারিঙে, তারপর একটু ঝুঁকে দেশলাইয়ের বাক্সটা খুলল।

দেশলাইয়ের প্রথম কাঠি দুটো ভাঙা। সামনেটা দেখার জন্য মাথা তুলল রানা। বুলডোজারের দরজা কাঁপতে কাঁপতে খুলে যাচ্ছে।

আবার ঝুঁকে তৃতীয় কাঠিটা বারুদের গায়ে ঘষল রানা। ভঙ্গুর কাঠির মাথাটা বারুদ সহ ভেঙে গেল।

ওহ্ গড! আর মাত্র একটা কাঠি আছে!

সেটার আবার কোমর বাঁকা। তবে জ্বলল ঠিকই। তারপর আড়ষ্ট আঙুল থেকে খসে রানার দু'পায়ের মাঝখানে মেঝেতে পড়ে গেল, খুদে আগুনের শিখা নিভু নিভু করছে।

খপ করে পেট্রল ভর্তি বোতলটা ধরল রানা, তারপর ওটার মুখ থেকে বেরুনো তুলোটা বাড়িয়ে দিল শিখার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তুলোর সরু সলতে জ্বলে উঠল, হু-হু করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

রানা জানে ওর হাতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় আছে, পেট্রল বোমা তাকে যদি না পায় তো ওকে পাবে। আর চার কি পাঁচ ফুট, বড়ে মিয়া বুলডোজারের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় পৌঁছে যাবে। দূর ছাই, আলো জ্বালতে দেরি করে ফেলল নাকি!

মেইন বিম-এর সুইচটা অন করল রানা, ওটার আলো এখন বুলডোজারকে ছাড়িয়ে সামনে চলে যাবে; তবে সেই আলোর আভা পড়বে ওটার গায়ে।

এখন আর রানা মাথা উঁচু করার ঝুঁকি নিচ্ছে না। মাত্র যদি একটা বুলেটই থাকে, শুধু ওকে দেখতে পেলে গুলি করবে সে।

কিন্তু ইতিমধ্যে পুরো সলতেটায় আগুন ধরে গেছে, কেবিনের ভিতরটা লালচে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। খোলা জানালার নীচে সেঁটে এল রানা, উঁকি দিয়ে দেখছে ওর দৃষ্টিপথে চলে আসছে বুলডোজার; প্রথমে পিছনের পিলার, তারপর প্রথম কাঁচ লাগানো কবাট।

আরেকটা পিলার। এরপর দেখা যাবে দরজাটা…আর রাইফেলটা। কাজেই এখনই সময়!

বোতলটা খোলা দরজার দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। আর যেই মাত্র ক্যাবের মেঝে লক্ষ্য করে ডাইভ দিয়েছে, অমনি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলের ভারী বুলেট ওর ডান কাঁধে যেন ছোঁ মারল।

ধাক্কাটা চরকির মত ঘুরিয়ে দিল রানাকে। তারপর দড়াম করে ক্যাবের মেঝেতে পড়ে গেল ও। মাথার ভিতর চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে–শেষ পর্যন্ত খুব নোংরা একজন লোকের কাছে হেরে গেল ও! গুলি খেয়ে আহত হয়েছে, সঙ্গে কোন অস্ত্রও নেই, সে এখন তার সময় মত ধীরেসুস্থে খতম করবে ওকে। যদিও এই মুহূর্তে কোন ব্যথা অনুভব করছে না, তবে জানে যে গুলি লাগলে ব্যথাটা অনেক সময় একটু দেরিতে শুরু হয়।

তারপর তার মুখ দেখতে পেল রানা। এমন আলোকিত মুখ জীবনে কখনও দেখেনি ও। আলোটা খুব কাছ থেকে পাচ্ছে সে। জ্বলন্ত পেট্রল তার পারকায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। শিখাগুলো উন্মুক্ত চামড়ার নাগাল পেতেই হাঁ করল সে।

যাকে দেখতে পাবে বলে জানত রানা, এই মুহূর্তে তাকেই দেখতে পাচ্ছে। ওর দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে রয়েছে ডক্টর হারুন হাবিব।

তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে, যেন বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুত বেগে, অনেক কথা মনে পড়ে গেল রানার। সংখ্যায় এত বেশি, সব ঘটনা হয়তো নিয়ম ধরে সাজানো নয়। সে-সব কে ঘটিয়েছে এখন তা পরিষ্কার, তবে কীভাবে কী করা হয়েছে তার বিশদ বিবরণ একমাত্র তাকে জেরা করেই জেনে নিতে হবে।

হারুনকে শুধু লাফ দিয়ে নীচের তুষারে পড়ে আগুন নেভানোর জন্য গড়াগড়ি খেতে হবে। রানা ঠিক বুঝতে পারছে না এত দেরি করছে কেন সে।

তারপর ব্যাপারটা খেয়াল করল ও। বুলডোজারের দোরগোড়ায়, একপাশের একটা বাঁকানো হুকে, তার বুটের ফিতেটা আটকে গেছে। আগুনের আঁচ লাগায় দিশে হারিয়ে ফেলে হাত দিয়ে খোলার চেষ্টা না করে, টানাটানি করছে সে।

বুলডোজারের স্পিড আরও কমে আসছে, তারমানে নিশ্চয় স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছে।

ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো, ফিতেটা হুক থেকে খুলতে পেরেছে সে, এবার লাফ দেবে।

এই সময় ডান কাঁধে ঠাণ্ডা লাগায় বাঁ হাত দিয়ে জায়গাটা ছুঁলো রানা। বুলেট ওর পারকা ছিঁড়ে ফেলেছে। ছেঁড়া পারকার ভিতর ধীরে ধীরে আঙুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করছে। কোথায় রক্ত? কোথায় জখম? বুলেটটা শুধু ধাক্কাই দিয়েছে ওকে,

খানিকটা পারকাও ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু ওর চামড়ায় একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।

মুখ তুলে তাকাল রানা, আর ঠিক তখনই লাফ দিতে দেখল জ্বলন্ত হারুনকে। দেরি করে ফেলায় আগুন ইতিমধ্যে তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। রানা ধারণা করল, বোধহয় সেজন্যেই লাফটা সে খুব আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দিল।

আসলে রানার ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। ফিতেটা এখনও খুলতে পারেনি সে। রানা দেখল, লাফ দেয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করল ওটা।

পারলও ছিঁড়তে। কিন্তু লাফ দেওয়াটা হয়ে গেল অসম্পূর্ণ।

যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, হারুনের পা ফস্কাতেই প্রকাণ্ড বুলডোজারের সচল ট্র্যাক সাদরে নিজের তলায় টেনে নিল তাকে।

লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, ইঞ্জিন বন্ধ করে বড়ে স্নিয়াকে দাঁড় করাল। বুলডোজারের চাকার তলা থেকে রক্ত-মাংস-হাড়ের একটা স্তূপ বেরিয়ে আসতে দেখল ও।

ওরা পৌঁছাল দু'ঘণ্টা পর।

সব মিলিয়ে আটটা হেলিকপ্টারের একটা ঝাঁক; তার মধ্যে চারটে ট্রুপস ক্যারিয়ার, দুটো গানশিপ, দুটো কার্গো শিপ। প্রতিটির গায়ে আমেরিকার পতাকা পেইন্ট করা।

ট্রুপস ক্যারিয়ার থেকে নেমে এসে মেশিন পিস্তলধারী একদল সৈন্য একজন মেজরের নেতৃত্বে পজিশন নিল নেতাজি ক্যাম্পের প্রবেশমুখে।

মেজরের হাতে ব্যাটারিচালিত লাউডহেইলার রয়েছে, সেটা মেইন স্ট্রিটের দিকে তাক করল সে, তারপর ঘোষণা করল, 'অ্যাটেনশন, প্লিজ! অ্যাটেনশন, প্লিজ! ডক্টর হারুন হাবিব, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, ক্যাম্পের বাইরে বেরিয়ে এসে মেজর জেনারেল ফিলিপ ফ্লাইওয়ে-র কাছে রিপোর্ট করুন, প্লিজ।'

একই ঘোষণা দু'মিনিট করে বিরতি দিয়ে তিনবার প্রচার করা হলো। কিন্তু ক্যাম্প থেকে কেউ বেরুচ্ছে না।

অগত্যা কমান্ড গানশিপ থেকে জেনারেল ফ্লাইওয়ে নতুন নির্দেশ দিলেন।

দুটো ট্রুপস ক্যারিয়ার থেকে এবার বেরিয়ে এল আরও দু'দল সৈন্য। দেখা গেল প্রথম দলটা প্রটেকটিভ সুট পরে রয়েছে। স্পেস-সুটের মত দেখতে এই ড্রেস ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাস থেকে রক্ষা করবে তাদের। হারুন হাবিবের রেডিও মেসেজ থেকে অনেক তথ্যই পেয়েছে তারা, তার মধ্যে এটাও ছিল যে নেতাজি ক্যাম্পে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে ফুড-পয়জনিং জনিত ডায়েরিয়া।

দ্বিতীয় দলটার সঙ্গে যোগ দিল কার্গো শিপ থেকে নামানো একজোড়া পোলক্যাট। ওরা খোলা আইসক্যাপে অভিযানে বেরুবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

প্রটেকটিভ সুট পরা সৈন্যরা মেইন টানেল ধরে ঢুকে পড়ল নেতাজি ক্যাম্পে. সঙ্গে করে ভারী কিছু ইকুইপমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে। সংখ্যায় বিশজন. প্রত্যেকের

হাতে বাগিয়ে ধরা মেশিন পিস্তল, কোমরের বেল্টে বাঁধা পাউচ থেকে উঁকি দিচ্ছে গ্রেনেড।

'কুইক মার্চ!' একজন মেজর হাঁক ছাড়ল, নাম ব্যারি মোরে। সে-ই তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মোরের হাতে একটা নকশা দেখা গেল, সেটার উপর মাঝে মধ্যে চোখ বুলাচ্ছে সে। 'আমরা সরসরি কমান্ড হাটে যাচ্ছি।'

কমান্ড হাটে আর কাউকে নয়, একা শুধু বাংলাদেশী ডিআইজি বিজয় হাসানকে পেল ওরা।

রানা আসলে ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিল।

'আপনার সম্পর্কে সবই জানি আমরা,' বলল মেজর মোরে। 'এই ক্যাম্পে মারাত্মক ক্ষতিকর ভাইরাস নিয়ে নিষিদ্ধ গবেষণা করছিলেন ডক্টর ওসমান ফারুক নামে একজন বিজ্ঞানী, আপনি তাঁর আবিষ্কার বাংলাদেশে নিয়ে যেতে এসেছেন।'

'মারব এক লাথ!' বলার পর খেয়াল হলো রানার, রাগের মাথায় মনেই ছিল না যে আমেরিকান মেজর বাংলা জানে না। 'বললেই হলো!' এবার ইংরেজিতে প্রতিবাদ করল ও। 'আমার জানামতে এখানে সে-ধরনের কোন গবেষণা হচ্ছিল না। আর আমি এসেছি হেলিকপ্টার অ্যাক্সিডেন্টে ডক্টর ফারুকের মারা যাবার ব্যাপারটা তদন্ত করতে।'

'এ-সব আপনার মুখস্থ বুলি!' গম্ভীর হলো মেজর মোরে।

এবার রানা তাকে প্রশ্ন করল, 'সবই যখন জানো, তা হলে এ-ও নিশ্চয়ই জানো যে আবিষ্কারটা কোথায় আছে?'

'জানি বৈকি!' জবাব দিল মেজর। 'সেখানে এরই মধ্যে একদল সৈন্যকে পাঠানো হয়েছে। আমরা আশা করছি ওদিকেই কোথাও আছেন ডক্টর হারুন হাবিব।'

'হারুন হাবিব? তার সঙ্গে কী?'

'তিনি একজন আমেরিকান, ইন্টেলিজেন্স অফিসার,' বলল মেজর মোরে। 'সন্দেহজনক চরিত্র ডক্টর ফারুকের ওপর বহু বছর ধরে নজর রাখছেন।'

'তা হলে এখানে মরতে এসেছ কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'যাও, তার কাছে গিয়ে খোশ-গল্প করো।'

'মরতে আসিনি,' বলল মেজর। 'এসেছি মারতে। ডক্টর ফারুক যে ভয়ানক ভাইরাস আবিষ্কার করেছেন, তার কিছু নমুনা ক্যাম্পের ল্যাবেও থেকে যেতে পারে। সভ্যতার স্বার্থে ওই ভাইরাস ধ্বংস করব আমরা। আপনি আমাদেরকে পথ দেখিয়ে ওই ল্যাবে নিয়ে যাবেন।'

তর্ক করা বৃথা বুঝতে পেরে সৈন্যদের পথ দেখিয়ে রেড জোনে নিয়ে এল রানা। ভারী ইকুইপমেন্টের বাক্স খুলে আগুন নেভাবার জন্য কয়েকটা ফোম মেশিন বের করল সৈনিকরা ।

তারপর ল্যাবে আগুন ধরানো হলো।

আগুনে সব পুড়ে ছাই হতে ঘণ্টাখানেকের মত সময় লাগল। তারপর, নেভানোর কাজ যখন শেষ হয়েছে, মেজর মোরের ওয়াকি-টকি জ্যান্ত হয়ে উঠল।

'ইয়েস, জেনারেল, সার!'

অপরপ্রান্ত থেকে জেনারেল ফিলিপ ফ্লাইওয়ে কথা বলছেন, মেজরের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা রানাও শুনতে পাচ্ছে পরিষ্কার।

'এদিকের কাজ আমরা শেষ করেছি, মেজর মোরে। তোমার খবর কী, রিপোর্ট করো।'

'ল্যাবটা এই মাত্র আমরা পুড়িয়ে ফেললাম, সার,' জবাব দিল মেজর, তারপর জানতে চাইল, 'ওদিকের কাজ শেষ মানে, সার—নমুনা, ফর্মুলা আর ডক্টর হারুনকে পাওয়া গেছে তা হলে?'

'ডক্টর হারুন বুলডোজার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন। তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ তাঁর দেয়া বর্ণনা ধরে খোঁজ করতে একটা লাশের নীচে থেকে সেই ফ্লাস্কটা পেয়ে গেছি আমরা।'

'কংগ্রাচুলেশন্স, সার!' ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠল মেজর মোরে। 'নিশ্চয়ই ফ্লাস্ক খুলে দেখা হয়েছে ভিতরে পাঁচটা টেস্টটিউব আর পলিথিনে মোড়া ফর্মুলাটা আছে কিনা?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই! সব ঠিক আছে, মেজর। সবাইকে নিয়ে ফিরে এসো, হে। তোমরা ফিরলেই আমরা রওনা হব।'

'জী, সার। সার, এখানে আমাদের সঙ্গে বাংলাদেশী ডিআইজি ভদ্রলোক রয়েছেন, বিজয় হাসান। তাঁর ব্যাপারে...'

'শোনো, মোরে, এদিকের পরিস্থিতি হঠাৎ করে বদলে যাচ্ছে।' হঠাৎ একটু উদ্বিগ্ন মনে হলো জেনারেল ফ্লাইওয়েকে। 'আগে যে প্ল্যান করা হয়েছিল, সেটা বাতিল করা হলো। আই রিপিট, আগের প্ল্যান বাতিল করা হয়েছে। কোন রকম রক্তপাত করা যাবে না।'

'কিন্তু, সার, কথা ছিল...কিন্তু কেন?'

'গ্রিনপিস, মোরে, গ্রিনপিস! এক ঝাঁক হেলিকপ্টার নিয়ে ক্যাম্পের বাইরে অপেক্ষা করছে ওরা। কাম ব্যাক, মোরে!'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

শুধু গ্রিনপিস নয়, থিউল থেকে ডাক্তারদের একটা দলও কপ্টার নিয়ে হাজির হলো নেতাজি ক্যাম্পে, তবে তার আগেই আমেরিকানরা ফ্লাস্কটা নিয়ে চলে গেছে।

রত্নে গোপালচন্দ্রের লাশের সঙ্গে ওই ফ্লাস্কে গুটিবসন্তের জীবাণু ভরা পাঁচটা খুদে টেস্টটিউব আর জাল ফর্মুলাটা রানাই রেখে এসেছিল—আমেরিকানরা এসে খোঁজাখুঁজি করলে ওগুলো যাতে পায়, সেই আশায়।

জাল ফর্মুলাটা হারুনই ওকে দিয়েছিল—নিজেকে সৎ আর সাধু প্রমাণ করার জন্য। সেটাই প্রিন্টারে ছেপে পলিথিনে মুড়ে দিয়েছে ও। ওর ধারণা, ওটার কোড ভাঙতে কম করেও দুশো বছর লাগবে আমেরিকানদের—অর্থাৎ দুশো বছর পর জানতে পারবে, ওটা আসলে কিছুই নয়।